



# କବିକାବ୍ୟେ ନେପଥ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟିଣୀ

ମୁଦ୍ରକ ବିମଳିନି ॥ ୨୭, ବେନିୟାଟୋଲା ଲେନ,  
କଲିକତା ୭୦୦ ୦୦୨

**প্রথম প্রকাশ :**

**নভেম্বর, ১৯৫৮**

**প্রকাশক :**

**জ্যোতিষরঞ্জন বড়ুয়া**

**১৬২/৬১, লেক গার্ডেনস্**

**কলিকাতা-৭০০০ ৪৫**

**প্রচ্ছদ :**

**শ্রীতপন কর**

**মুদ্রক :**

**কোলাজ**

**২, চৌরঙ্গী রোড,**

**কলিকাতা-৭০০ ০ ১৩**

ॐ পিতৃদেবকে





# কবিকাব্য নেপথ্যচারিণী

ক  
।  
ণি  
।  
কা

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ ও নীল যবনিকা,  
থুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কবিকা ।  
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,  
গোধূলি-বেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,  
লয়ে তার ভীকু দীপশিখা ।  
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার কবিকা ॥



## ● নিবেদন ●

মহামানব বিশ্বপ্রেমিক ও প্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে বহু মণীষী বিভিন্ন দিক থেকে নানা ভাবে নানা প্রকারে বুঝবার ও জানবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা আমার নমস্কার। আমি তাঁর কাব্যগ্রন্থেব মধ্যে শ্রামলী নারী ‘আনন্দের হারানো কণিকা’ কণিকাকে ও শ্রেষ্ঠ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছি। আমি যদি কবির ‘ভাষার অঞ্জলি’ থেকে ও ‘বিশ্বরূপ ধর্মী’ জীবনের মধ্যে কণিকাকে খুঁজে পেয়ে থাকি তবেই আমার এই লেখা সার্থক। এই অল্পসন্ধান আমি সঠিক ভাবে করতে পেরেছি কি না তাঁর বিচারের ভারও পাঠকবর্গের উপর রইল।

কবি জীবনস্মৃতিতে কড়ি ও কোমল পর্যন্ত উল্লেখ কবেছেন যা’ কবির জীবনের ছবিমাত্র (মংগুতে রবীন্দ্রনাথ)। তারপর বহুজনের অহরোধ সত্ত্বেও তিনি জীবনচরিত রচনা করেন নি কিন্তু কাব্যের মাধ্যমে (মানসী পর্ব থেকে) কবি জীবনী যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাই ‘আত্মপরিচয়’ রূপে লিখে গেছেন। অর্থাৎ কবি গল্পের মাধ্যমে লিখেছেন জীবনস্মৃতি আর গীতিকাব্যের মাধ্যমে লেখেন জীবনকাহিনী অথবা সত্যিকারের জীবন। এই কারণেই মানসী থেকে বলাকা পর্যন্ত তিনি ‘অজ্ঞানার ঘেরের মধ্যে’ই রয়ে গেছেন। এই অজ্ঞানার ঘেরই কবির জীবনের ও কাব্যের শ্রেষ্ঠ পর্ব, কবি রবীন্দ্রনাথ থেকে কর্মী ও মহামানব রবীন্দ্রনাথের উত্তরণের কাহিনী এবং পরবর্তীকালের বহু কবিতার উৎসমূল। রবীন্দ্রনাথের আদিরসাত্মক কবিতার উৎস, তাঁর নব যৌবনের লেখা কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে, ভালোবাসার ‘সংশয়ের আবেগ’ রয়েছে মানসী কাব্যগ্রন্থে, যুগ্মসত্তার দ্বন্দ্ব ও ‘দুঃসময়ের’ কবিতা পাওয়া যায় চিত্রা ও কল্পনাতে এবং অকাল বসন্তের প্রেমের কবিতার উৎস, শেষ যৌবনের লেখা কণিকা কাব্যগ্রন্থে, বা’ মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে ‘লীলা’ নামে অভিহিত এবং পরবর্তীকালে কবি শিলাইদহকে ‘লীলালোকের লীলাক্ষেত্র’ বলে পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে উল্লেখ করেছেন (৫৬৬ পৃষ্ঠা)। তারপরই রয়েছে আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থে, বা’ কল্যাণ ধর্মী রূপ নিয়ে ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশে’র মধ্যে নিহিত।

কবির বিশ্বরণধর্মী যৌবনের লেখা কড়ি ও কোমল থেকে স্বরণ পর্যন্ত এই বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন কবিতা স্তম্ভবদ্ধভাবে কবি-মনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়েও একটি অখণ্ড আত্মরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আবার এই কাব্যগ্রন্থগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে দুটি ডায়ারি ছিন্নপত্র চিঠিপত্রগুলি ও কবির ভৌগোলিক অবস্থান। মানসী কাব্যগ্রন্থের প্রথম দিকের বহু কবিতা লেখা হয়েছে কবি-কল্পনার রোম্যান্টিক সহর গাজীপুরে, আর শেষ ভাগে লেখা হয়েছে সমুদ্রের উপর যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারীতে। তাই সেই সময়ের (১৮৮৮-৯০) কবি মনের গতি প্রকৃতি নির্ণয়ে এটি ডায়ারিটি, চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডটি ও গাজীপুরের পরিবেশ অত্যন্ত মূল্যবান। আবার ছিন্নপত্রের (১৮৯১-৯৫) সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে ‘সোনার তরী’ ও ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থ দুটি এবং কুষ্টিয়ার ব্যবসা (ছিন্নপত্র ২৩১ নং), যা কবির ‘ভূঃসময়’ রূপে চিত্রা ও কল্পনাতে ‘হতভাগ্যের গানের’ মধ্যে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। কবির সবচেয়ে প্রিয় ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থখানি লেখা হয়েছে ‘কবির লীলা-লোকের লীলাক্ষেত্র শিলাইদহে’ (১৩০৭), যার বিশ্লেষণ রয়েছে পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে এবং পরিচয় দিয়েছেন পূর্ববীতে। অর্থাৎ ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের ‘চাবি’ রয়েছে পূর্ববীর ক্ষণিকা কবিতায়, পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে এবং চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ডে। এই কারণেই অজ্ঞানার ঘের যদি উন্মোচন করা না যায় এবং কবিতার উৎসের সন্ধান যদি পাওয়া না যায় তবে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা অর্থহীন হয়ে থাকবে এবং কবির জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ যৌবন অথবা development অঙ্ককারে ঢাকা থাকবে। এই ‘অজ্ঞানার ঘেরের মধ্যে’ই রয়েছে কবির অপরিণত ও অপ্রকাশিত জীবন এবং শিল্প কর্মের সৃষ্টি। অর্থাৎ শিল্পী ও ‘রোম্যান্টিক’ কবি (নবজাতক) সৃষ্টি করেছেন তাঁর যৌবনের মানসভূমি—ভাবকল্পনার অসম্পূর্ণ মানসীকে যা’ সম্পূর্ণ হল পূজারিণী (কল্যাণী) নারী ক্ষণিকাতে। তাই কবি শেষ সম্ভব নয় সংখ্যক কবিতায় তাঁর অপরিণত অপ্রকাশিত শিল্পী জীবনের কিছু কিছু আভাস দিয়েছেন—

অপ্রকাশের পদা টেনেই কাজ করেন গুণী,  
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুঠনে,  
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে,  
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,  
নিবেদ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।  
আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,

তাই আমাকে বেঠন করে এতখানি নিবিড় নিস্তরতা ।

তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা

অজ্ঞানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁর হাতে,

কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আপেনি,

সবাই রইলো দূরে,—

যারা বললে “জানি”, তারা জানল না ।

শ্রী ৩ শিল্পী কবি ‘অজ্ঞানার ঘেরের মধ্যে’ অপ্রকাশের পদ্য টেনে’ অল্প-  
 রাগের ধারা দিয়ে প্রথম যৌবনে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কবি কল্পনার রোম্যান্টিক সহর  
 গাজীপুরে ‘সংশয়ের আবেগের’ মধ্যে সৃষ্টি করলেন তাঁর ভাব কল্পনার অসম্পূর্ণ  
 মানসীকে (চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, আত্মপরিচয় ২১০ পৃষ্ঠা) । প্রথম যৌবনের কবি  
 কল্পনার এই অসম্পূর্ণ অর্ধ মানবী মানসীই বহু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সাংসারিক দুঃখের  
 মধ্যে দিয়ে (কুণ্ঠিত্যার ব্যবসা) কবির শেষ যৌবনে শিলাইদহে পরিপূর্ণ মানবী রূপে  
 পূজারিণী (কল্যাণী) নারী ক্ষণিকতে সম্পূর্ণ হল । এবং সেই সঙ্গে কবি ১৯০০  
 খ্রীষ্টাব্দে শিলাইদহে কল্যাণকর্মের ‘উদ্‌বাধন’ করলেন । এই অসম্পূর্ণ ‘মানসী’  
 থেকে সম্পূর্ণ ‘ক্ষণিকা’ পর্যন্ত কবির যৌবনের শিল্পকর্মের সৃষ্টিভূমি বা মানসভূমি  
 এবং সংসারের ‘লীলালোকের লীলাক্ষেত্র’ (পশ্চিম-যাত্রীর-ডায়েরি ৬৬৬ পৃষ্ঠা) ।  
 এটাকেই কবি ‘অজ্ঞানার ঘের’ অথবা ‘অপ্রকাশের পদ্য’ বলে উল্লেখ করেছেন ।  
 কবির যৌবনের মানসভূমির ধ্বংসের পর (জন্মদিন ১১ সংখ্যক) অথবা ক্ষণিকার  
 বিনাশের পর বিরহী কবি মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়, ‘কালের আলোতে’ (বলাকা  
 ১৯১৪) ব্যথার মধ্যে রামগড়ে যুদ্ধার রূপকে ভেঙে সৃষ্টি কবলেন ‘মুখ ঢাকা বধু’  
 রূপে ‘ধ্যানোন্তরা প্রিয়া’ অগোরবা অশরীরী নারী অধরাকে (বলাকা পাঁচ সংখ্যক,  
 শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক, জন্মদিন এগারো সংখ্যক, আরোগ্য সাতাশ সংখ্যক,  
 বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ১৫১ পৃষ্ঠা ক্ষতিমোহন সেন) । এই অধরাই কবির বৃদ্ধ  
 বয়সের মানসভূমি । এই শেষ বয়সের মানসভূমি অধরাকে ‘স্বরকার ও গীতকার  
 রবীন্দ্রনাথ’ (বাঁশিওয়ালা, শেষ সপ্তক ছয় সংখ্যক) শ্রামলী কাব্যগ্রন্থে নূতন নাম ও  
 পরিচয় দিয়ে প্রথম যৌবনের বাংলা দেশের মেয়ে রূপে পরিবর্তিত করে দিলেন—  
 “স্তনি আমার নূতন নাম”/—এই বলে তোমাকে চিঠি লিখেছি, মনে আছে তো ?/  
 ‘আমি তোমার বাংলা দেশের মেয়ে ।’ শ্রামলী নারী বাংলা দেশের মেয়ের প্রথম  
 সূচনা শেষ সপ্তক চুরাশি সংখ্যক কবিতায়, যা’ তিনি মাটির ঘর ‘শ্রামলী’র  
 গৃহপ্রবেশের পূর্বে লিখেছেন (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ ৭৫ তম জন্মদিবস) । কবির শেষ

বয়সের মানসভূমি-অধরা ও বাংলা দেশের মেয়ে এবং প্রথম যৌবনের মানসভূমি—মানসী ও ক্ষণিকা, কবি কল্পনার এই অশরীরী নারীমূর্তিগুলিকে সৃষ্টি করে কবি প্রেমের ধারা দিয়ে কাব্যে ব্যপ্ত করে দিয়েছেন। এই অশরীরী নারীমূর্তিগুলিই কবির কাব্যে ‘ছায়াসজ্জিনী’ (বিচিত্রিতা) রূপে বর্ণিত হয়েছে। তাই কবির কাব্যের অন্তরালে পাওয়া যায় কবি-কল্পনাব এই অশরীরী ছায়ারূপিনী শ্রামলী নারীমূর্তিকে, যা একটি নিজস্ব রূপ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমৃদ্ধ হল হয়ে কাব্যের মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করে ‘প্রচ্ছন্ন’ হয়ে রয়েছে। কল্পনা প্রবণ ‘রোমান্টিক’ প্রেমিক (নবজাতক) শিল্পী রবীন্দ্রনাথ (মানসী) নিজের এই সৃষ্টি কর্মের বিশ্লেষণ করে পশ্চিম-যাত্রীর ডাংগারিতে লিখেছেন— ‘মেয়েদের সৃষ্টিব আলো যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দিয়ে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। we are the dreamers of dreams এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানবের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরন্তর রূপ পরিগ্রহ করেছে। ..... পুরুষের এই সমগ্রতার পিপাসা তার প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো মেয়েকে ভালবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে ভাবের দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বার বার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলির এপিসিকীডিয়ন্ পড়ে দেখো’ (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) তাই রবীন্দ্রনাথ চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে ভাবের দৃষ্টি দিয়ে অল্পরাগের ধারা দিয়ে নব যৌবনের শরৎ-পর্যায়ের শরৎ-লক্ষ্মীর (গীতোচ্ছ্বাস—কড়ি ও কোমল), বন্দনা করেছেন অসম্পূর্ণ মানসী মূর্তিতে এবং ক্ষণিকার পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রামলী নারীর সৌন্দর্যকে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ দিয়ে বিশ্বলক্ষ্মীরূপে বন্দনা করেছেন তাঁর কাব্যে সাহিত্যে ও গানে। কবি কল্পনার এই শ্রামলী নারীর মানসমূর্তি, এবং কবির প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—

‘জগতের মধ্যে বাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে— জগতের মধ্যে বাহা অপূর্ণ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে সেই অপূর্ণ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে—বাহা চোখের সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যপ্ত করিয়া থাকে—বাহা অশরীরী ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া যিক্ তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে—

তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিতিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।’ অর্থাৎ কবির গীতিকাব্যের মধ্যে যে ছায়াক্রপিলি অশরীরী নারীমূর্তি সৃষ্টি করেছেন, সেই নারীমূর্তির পশ্চাতেই রয়েছে কবির বিশ্বরণধর্মী যৌবনের কাহিনী এবং এই যৌবন কাহিনীই কবির প্রকৃত জীবনী যা’ অজ্ঞানার ঘেবের মধ্যেই রয়ে গেছে।

এই অজ্ঞানার ঘেব অথবা ‘বিশ্বরণ ধর্মী’ জীবনকে উন্মোচন করবার জন্তই পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে কবির জীবনীকারের উদ্দেশ্যে সতর্ক করে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা প্রকাশ করে লিখেছেন—‘তা ছাড়া, আমার ব্যক্তিগত জীবনের সব সত্যকেই আমি একটিমাত্র সরকারি বাটখারা দিয়ে ওজন করতে চাইনে, কিন্তু বিশেষ ঘটনা বিশেষ তুলনাও তৈরি হয়ে উঠতে সময় লাগে। ঘটনা যখনই ঘটে তখনই সেটাকে পাওয়া যায় না। তখন সরকারি পরিমাপের আদর্শ যেটাকে দেখায় ভারী সেটাই হয়তো হালকা, যেটাকে বুঝি হালকা সেটাই হয়তো ভারী। দীর্ঘকালে আত্মবিশ্লিষ্ট অনেক বাজে জিনিস ভুলে যাওয়ার ভিতর দিয়েই বিশেষ জিনিসের বিশেষ ওজন পাওয়া যায়।

যারা জীবনচরিত লেখে তারা সমসাময়িক খাতাপত্র থেকে অতিবিশ্বাস-যোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে লেখে ; সেই অচল সংবাদগুলো নিজেকে না কমাতে না বাড়াতে পারে। অথচ, আমাদের প্রাণপুরুষ তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে কমিয়েই এগিয়ে চলেছে। অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করে তা দিয়ে স্বরণস্তম্ভ হতে পারে, কিন্তু জীবনচরিত হবে কি করে? জীবনচরিত থেকে যদি বিশ্বরণধর্মী জীবনটাই বাদ পড়ে তা হলে মৃত-চরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী? আমি যদি বোকামি করে প্রতিদিনের ডায়ারি লিখে যেতুম তা হলে তাতে করে হত আমার নিজের স্বাক্ষরে আমার নিজের প্রতিবাদ। তা হলে আমার দৈনিক জীবনের সাক্ষ্য আমার সমগ্র জীবনের সত্যকে মাটি করে দিত।’ আবার কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে কবি ছিন্নপত্রে লিখেছেন—‘জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচারণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যাকথা বলি নে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের আশ্রয় স্থান।’ কবি এই উক্তিগুলির মধ্যে এই কথাই দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন যে তাঁর জীবনের অতিবিশ্বাসযোগ্য তথ্য স্তূপাকার করেও কবির জীবনের আসল



সত্যকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবির জীবনের আসল সত্য রয়েছে কবির কবিতায়—কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এবং কবির বিশ্বরণধর্মী জীবনের মধ্যে। বিশেষভাবে কবির সবচেয়ে প্রিয় ক্ষণিক। কাব্যগ্রন্থখানি রয়েছে বিশ্বরণধর্মী জীবনের মধ্যে অথবা অজ্ঞানার ঘেরের মধ্যে। তাই কবি বিশ্বরণধর্মী জীবনকে উন্মোচন করার জন্যই পূর্ববর্তীতে ক্ষণিকার পরিচয় দিয়ে পশ্চিম-যাত্রীর-ভাষারিতে বিশ্লেষণ করেছেন। কবি চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডে লিখেছেন—‘প্রভাতের সঙ্গে সায়াহ্নের যেমন একটা মিল আছে। তেমনি একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে। প্রভাতের নবীন আলোয় মধ্যাহ্নের বাণী নেই, কিন্তু সায়াহ্নের পূর্ণতা গূঢ়ভাবে মধ্যাহ্নকে নিয়ে। খেলাঘর থেকে খেলাঘরেই ফিরতে হবে কিন্তু মাঝখানের যাত্রাটা মহামূল্য।’ (মাঝখানের যাত্রা—মানসী থেকে বলাকা পর্যন্ত, ১৮২০-১৯১৬, ৷

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ, ছিন্নপত্র, আত্মপরিচয়, চিঠিপত্র ও ভাষারি দুটির মাধ্যমে কবি-মনের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে অজ্ঞানার ঘেরকে উন্মোচন করে কবির সত্য পরিচয়কে খুঁজে নিয়ে জীবনচরিতের সঙ্গে সংযুক্ত করা ভিন্ন আর কোনো উপায় নেই। কবির বিশ্বরণধর্মী জীবন যদি উন্মোচন করা যায় তবেই কবির কবিতা, উপন্যাস নাটক, গান ও চিত্রকলার মর্মার্থের সন্ধান পাওয়া যায়, কারণ সবই একই রক্তস্রোতে গাঁথা। সবগুলি নিয়েই কবির জীবনের বৃত্ত রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনার গুরু কর্তব্য স্বয়ংক্বে আলোচনা প্রসঙ্গে জুবোয়ারের মত অহুবাদ করে লিখেছেন, ‘লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য।’ আবার আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—‘সাহিত্য রচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়, সেটাই অপেক্ষাকৃত বিষুদ্ধ।’ তাছাড়া রবীন্দ্রজীবনীর শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ নিজেই। তাঁর যৌবনের বিশ্বরণধর্মী জীবন ছড়িয়ে রেখেছেন তাঁর কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, গানে, চিঠিপত্রে, ছিন্নপত্রে, আত্মপরিচয়ে, ভাষারিতে, ও চিত্র কলায় এবং বহু কবি তাঁর মর্মার্থ ও শব্দগত অর্থ তিনি নিজেই প্রচ্ছন্নভাবে বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন তাঁর কবিতায় ও সাহিত্যে এমন কি নিজের চরিত্র যৌবনের রবীন্দ্রনাথ) বিশ্লেষণ করে নিজেই ফোটাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর কবিতায়, ছিন্নপত্রে, আত্মপরিচয়ে ও ভাষারি দুটিতে। আবার নিজের জীবনকে ঋতু অহুসারে বিভক্ত করে তাঁর জীবন কাহিনীও প্রকাশ করেছেন, এবং দুর্লভ মুহূর্তের স্মৃতিগুলি কবির চিত্তপটে যথেষ্ট উপন্যাসে ও বহু কবিতায় লিখে রেখে গেছেন। বিশেষভাবে ক্ষণিক। কাব্যগ্রন্থখানি রচনা করেছেন কবির বর্তমানের (শিলাইদহ ১৩০৭) প্রতি

‘নিমেষের’ কাহিনী দিয়ে এবং ধ্বনির জগতে (বিরহ ও আনন্দধ্বনি) শিল্পী কবি সৃষ্টি করেছেন প্রথম যৌবনের ভাব কল্পনার অসম্পূর্ণ মানসীকে (গাজীপুর ১৮৮৮)।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলির পঠন পদ্ধতিরও নির্দেশ দেওয়া আছে আত্ম-পরিচয়ে ও কবির বিভিন্ন লেখাতে। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘আপাততঃ একটা বইয়ের মধ্যে যে কবিতাগুলি টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন মনে হয়, তার মধ্যেও এমন একটা যোগ আছে, যদি দেখবার চেষ্টা করা যায় তা হলে দৃষ্টি পড়ে।’ কবির একই উক্তি প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীর (১৩০৩ বঙ্গাব্দ) ভূমিকাতেও উল্লেখ করেছেন—‘অনেক সময় কবিতা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে রচনাগুলি পরস্পরের সাহায্যে ক্ষুণ্ণতর হইয়া দেখা দেয়, লেখকের মর্মকথাটি পাঠকের নিকট সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে। একবার লেখকের সমস্ত রচনার সহিত সেইরূপ বৃহৎভাবে পরিচয় হইয়া গেলে তখন প্রত্যেক স্বতন্ত্র লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারে।’ কবি আত্মপরিচয়ে (১১০ পৃষ্ঠা) নিজের কবিতা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—‘কোন গীতিকাব্যরচয়িতার কোন কবিতা ভালো কোনটা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাহাব সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিধ কোন বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ করিয়া বীণাপানি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।’ আবার নিজের কবিতা লেখার ধারার কথাও প্রকাশ করেছেন আত্মপরিচয়ে—‘আমার স্মরণীয়কালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম তখন মনে করিয়াছি, আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ড কবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয় নাই—সেই তাৎপর্যটি কী তাহাও আমি পূর্বে জানিতাম না। এইরূপ পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটি কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি— তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটি অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল।’

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিগুলিকে অঙ্গস্বরূপ করে, তাঁর টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলিকে একত্রিত করে, তাকে সাজিয়ে (শ্রেণী বিভাগ করে) অবিচ্ছিন্ন ধারায় কবি মনের গতি প্রকৃতির (উত্থান-পতনের) দিকে লক্ষ্য রেখে কবিতাগুলির সমার্থ বুঝতে চেষ্টা করেছি। কবি-মনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে বয়সানুসারে কবির কবিতাগুলিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, বিশেষভাবে শেষ যৌবনের ক্ষণিকা পর্ব পর্যন্ত। এই জন্ত কবি-মনের গতি প্রকৃতি নির্ণয়ে, কবিতা রচনার স্থান, কাল পরিবেশ এই তিনটি প্রধান উপাদানের প্রয়োজন। কবি যে স্থানে, যে বয়সে কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্য রচনা করেছেন, সেই স্থানে যে পরিবেশে বাস করতেন, সেই পরিবেশের প্রভাব এবং সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিশেষত্বগুলি ও বয়সানুসারে সেই সময়কার কবি মনের গতি প্রকৃতি, এবং দেশ ও কালের প্রভাব সবই তাঁর কবিতায় জীবনস্বত্তি, ছিন্নপত্র, ডায়ারি, চিঠিপত্র এবং সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন। কবির জীবন ও কাব্যের বিশেষ বিশেষ পর্বের সঙ্গে বয়সানুসারে কবির ভৌগোলিক অবস্থান ও জড়িত রয়েছে, এবং এটাকেই ‘রাবৌজিক ভূগোল’ নামে অভিহিত করা যায়। আবার কবির শৈশব কৈশোর ও নব যৌবনের লেখা কাব্যগ্রন্থ গুলির মধ্যে কবি-মনের তারতম্যগুলিও বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। অর্থাৎ কবির জীবন ও কাব্যের প্রথম পর্বে, যৌবন সমাগমের দরুন কবি-মন যে ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই ভাবগুলি তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবিতায় ধরে রেখেছেন। বিশেষভাবে কবির শৈশব-কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালের লেখা সন্ধ্যাসংগীতে, কৈশোর যৌবনের বয়ঃসন্ধিকালের লেখা ছবি ও গানে এবং নব যৌবনের লেখা কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে। এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে সন্ধ্যাসংগীতে রয়েছে কবির বয়ঃসন্ধিকালের অন্তর রহস্যের বিষাদ ও বেদনা। ছবি ও গানে ‘রাজর প্রেম’ ও ‘জাগ্রত স্বপ্নের’ মধ্যে অনাগত ‘কে’ কবিতায় রয়েছে ‘বাতায়ন বাসী’ কবির দূরের ঝুঁকুর ‘স্বপ্নস্বপ্ন’ ও রহস্যময় যৌবনের স্বায়ী আগমন। আর কড়ি ও কোমলে রয়েছে কবির নব যৌবনের ‘যৌবন স্বপ্ন’ ও ‘গীতোচ্ছ্বাসের’ মধ্য দিয়ে ‘ক্ষণিক মিলনের’ আনন্দ বেদনার কাহিনী, যা’ তিনি নিজের গীতিকাব্যে লিখে গেছেন। কবির মনস্তত্ত্বমূলক কবিতা এবং অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী ও কল্পনার সংমিশ্রণে রচিত বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি, একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত হয়ে তার তথ্যগুলোকে পদে পদে বাড়িয়ে কমিয়ে এগিয়ে চলেছে এবং কবির জীবনের একটি পর্বের সঙ্গে আরেকটি পর্ব যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই অপ্ৰকাশিত জীবনের কাহিনী রচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের ও কাব্যের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে প্রেম। এই প্রেমই কবিকে শেষ যৌবনে বৈরাগ্যের দিকে টেনে নিয়ে গেল—‘কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকে চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অন্তরাগকেই বোধবান ও বিপুল করে’ (আত্মপরিচয় ২১৫ পৃষ্ঠা)। কবি শৈশবে প্রেমকে খুঁজেছিলেন প্রকৃতির মধ্যে মানবীর মধ্যে, যৌবনে খুঁজেছিলেন দেহের ও রূপের মধ্যে (কড়ি ও কোমল)। এই রূপ ও দেহের মধ্যে প্রেমকে খুঁজে না পেয়ে ‘ধ্যানের’ (মানসী) মাধ্যমে খুঁজতে চেষ্টা করলেন। কবির এই সংশয়াকুল প্রেমই (সংশয়ের আবেগ-মানসী) অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ‘দুঃসময়ের’ মধ্যে ‘ক্ষণিকা’তে কল্যাণরূপে দেখা দিল। প্রেমের এই কল্যাণরূপকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার পরই কবির আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ ‘নৈবত্য’ কাব্যগ্রন্থে, যা ‘কল্যাণ ধর্মী’ রূপ নিয়ে ‘আশ্রমের রূপ ও বিকাশের’ মধ্যে নিহিত। শেষ যৌবনে মৃত্যুর মধ্যে প্রেমের এই সত্যরূপ ও কল্যাণরূপকে উপলব্ধি করে কবির জীবনে অসীমের আবির্ভাব হল—‘দুঃখবিপদ-বিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব’—ক্ষণিকার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে এরই প্রকাশ। কবির জীবন ও কাব্যের মধ্যে প্রেমের এই কল্যাণ রূপ ও অসীমের প্রকাশ রয়েছে। অর্থাৎ কবির সংশয়াকুল প্রেম ভাব কল্পনার অসম্পূর্ণ ‘মানসী’ থেকে (ভাব) প্রেমের কল্যাণ রূপ নিয়ে কল্যাণী নারী (রূপ) ‘ক্ষণিকা’য় পরিণত হল। কবির এই কল্যাণধর্মী প্রেম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অরূপ নারী অধরাকে (অরূপ) সৃষ্টি করে (বলাকা ১৯১৪) মৈত্রী ও মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমের দিকে প্রসারিত। এই ভাবেই কবি ‘শেষ সাতাশের’ (পুরবী-১৯২৪) মহামানব বিশ্বপ্রেমিক ও প্রেমিক রবীন্দ্রনাথে পরিণত হয়ে সীমার মধ্যে অসীমকে খুঁজে পেলেন। কবির জীবনে এই একটি মাত্রই পালা যার প্রথম সূচনা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাট্য কাব্যে। এই নাট্য কাব্যে কবি নিজেরই জীবন নাট্যের ও কাব্যনাট্যের ভূমিকা রচনা করলেন (আত্মপরিচয় ১৭৮ পৃষ্ঠা)।

বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।

বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে,

সেই স্বপ্নের রূপে

সে সংগীতে অনির্বচনীয়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে বাল্য ও যৌবনের স্মৃতিগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কবিতায় পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করেছেন। এর যে ভাবগুরু তিন ‘ভাষার অঞ্জলি’র জন্ম প্রকাশ

করতে পারেন নি সেই ভাবগুলি তিনি চিত্রকলায় প্রকাশ করেছেন। আমি চিত্রকলা এবং অতীত স্মৃতি এই দুটি পৃথক লেখা স্বত্বপঞ্জীর সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছি।

যিনি এই গ্রন্থখানি নামকরণে অলঙ্কৃত করলেন এবং যার পরামর্শ ও প্রভূত সাহায্যের জন্ত এই বই প্রকাশিত হল তাঁকে আমাব অসীম কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সাহায্য না পেলে আমার পক্ষে এই বই প্রকাশ করা সম্ভব হত না। অধ্যাপক শচীনন্দন সিংহ, শ্রীঅসিত চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্তা নন্দরাণী চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে ববীন্দ্র সাহিত্যের যাবা ধারক ও বাহক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী, ডঃ নীহারঞ্জন রায়, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য ও স্বধাংমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অমূল্য সময় নষ্ট করে আমার মতো অনভিজ্ঞা লেখিকার ছোটো লেখাটি (কণিকা অংশটি) পড়েছেন, ভুলত্রুটি দেখিয়েছেন কোথাও কোথাও মত পার্থক্য সঙ্গেও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আমাব অন্তর্বের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন চরিত্রের বহু নারীকে পাওয়া যায়। তাঁদের রূপ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তিনি নানাভাবে রূপায়িত করে নারী এবং নারী-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাই তাঁর কাব্যে প্রত্যেকটি নারীই তাঁদের আপন চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র। কবির বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে যে কবিতাগুলি তাঁদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন সেই কবিতাগুলির মাধ্যমেই তাঁদের বিভিন্ন চারিত্রিক সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে; এবং কবির সঙ্গে বিভিন্ন সম্পর্কের ধারাও প্রকাশিত। রবীন্দ্র জীবনীতে নারীর প্রভাব অত্যধিক, কারণ এঁদের প্রেরণাই কবিকে উদ্দীপিত করে পূর্ণ বিকাশের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তাই কবি এই প্রেরণাদাত্রী নারীদের রূপ এবং চারিত্রিক গুণগুলি নানাভাবে ফুটিয়ে তুলে তাঁদের পরিচয় নিয়ে, নিজেরাই জীবন কাহিনী রচনা করেছেন। এবং এই নারীদের বিশেষ বিশেষ দানের কথা স্মরণ করেছেন—‘কে সামনে এল, কে পেছনে রইল সেটা সামান্য। অসামান্য সেইটাই যেটা তার দান, কি উপায়ে দিল তা নয়—কি দিল, (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)।

কবির জীবনে পাঁচজন নারীর বিপুল অবদান আছে, এবং এঁদেরই প্রেরণা কবিকে কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায় ও কল্যাণকর্মে উদ্দীপিত করে শেষ সাতাশের মহামানব রবীন্দ্রনাথে পরিবর্তিত করে দিল। তাই কবির কাব্যগ্রন্থে একদিকে রয়েছে এই বিচিত্ররূপিণী, আকাশচারিণী, অসামান্য বিদূষী নারীদের কাহিনী, আবার অন্যদিকে রয়েছে একাকিনী ভূতলবাসিনী অগোরবা কল্যাণী নারীর কাহিনী, এই দুই ধারার প্রবাহ নিয়েই কবির কাব্যগ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়েছে। চিত্রার ভূমিকায় আছে, ‘বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। জগতে বিচিত্র-রূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এই দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য।’ তাই কবি গড়ে পড়ে এবং জীবনে বহু বিচিত্ররূপিণী নারীর কথা ব্যক্ত করে কাব্যগ্রন্থে উজ্জলভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। এই বিচিত্ররূপিণী নারীরাই ছিলেন কবির আকাশ, ধাঁদের কবির ভালো লেগেছিল (পশ্চিম-বাজার ডায়ারি ১৭৭, পৃষ্ঠা শেষ সপ্তক পয়্যাতাল্লিশ সংখ্যক), এবং ধাঁদের বহু সমাদর করে

বরণ করে নিয়েছিলেন (বলাকা বিয়াজিশ সংখ্যক)। আবার ধীর স্থির একাকিনী অন্তরবাসিনী, যিনি অশরীরী নারীৰূপে মলিন বেশে ‘প্রচ্ছন্ন’ (প্রচ্ছন্ন—থেয়া কাব্যগ্রন্থ—বলাকা-কাব্য-পৰিক্রমা, ক্ষিতি মোহন সেন ১০৪, ১০৫ পৃষ্ঠা) হয়ে রয়েছেন, সেই অগৌরবা কল্যাণী নারীর কথাও তাঁর কাব্যে প্রকাশিত। তিনিই কবির ভূতল, যাকে কবি ভালোবেসেছিলেন, এবং যাকে সমাদর করেন নি (বলাকা ৪২ সংখ্যক) কবির কাছে দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য)।

কবির জীবনের এক-এক পর্যায়ের সঙ্গে এক একটি ঋতুর আধিপত্য রয়েছে। এবং বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ও বিভিন্ন নারী (কাব্য লক্ষ্মী) সেই বিশেষ বিশেষ ঋতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবির জীবনকে ও কাব্যকে প্রভাবান্বিত করে সেই সময়ের প্রেরণাদাত্রী ও কাব্যলক্ষ্মীৰূপে নিরূপিত হয়েছেন। কবির জীবনে ও কাব্যে সে সময়ে ও যে ঋতুতে এই প্রেরণাদাত্রী নারীদের আগমন কবি সেই ঋতু অনুসারে নামকরণ করে তাঁদের পরিচয় দিয়েছেন। এবং এই বিভিন্ন ঋতুর নামকরণের মধ্য দিয়ে কবির জীবনের ও কাব্যের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা প্রকাশিত। কবির জীবন দুই প্রধান ঋতুতে বিভক্ত—শৈশবের বর্ষাকাল,—বনফুল থেকে ছবি ও গান, এবং যৌবনের শবৎকাল—কড়ি ও কোমল থেকে নৈবেদ্য।

কবি জীবনশ্রুতিতে শৈশবের বর্ষা ও যৌবনের শবৎকাল সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—‘সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শবৎকাল মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা-বাঁহা লইয়া মহাসমাবোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আব, এই শবৎকালের মধুর উজ্জল আলোটির মধ্যে যে-উৎসব তাহা মাহুষের। মেঘবোজের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখেব আন্দোলন মর্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মাহুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মাহুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাবিবেক নিখসিত হইয়া বহিতেছে।’

কবির এই দুই প্রধান ঋতুর মধ্যে কাব্যলক্ষ্মীর (তিনজন কাব্যলক্ষ্মী ও একজন প্রেরণাদাত্রী) আবির্ভাব হয়েছিল, সেই নারীদের বিভিন্ন ঋতুর নামানুসারে সঞ্চারিত হবে, তাঁর জীবন ও কাব্যকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন কবি-কাহিনী থেকে স্মরণ ১৩০২।

কবি জীবনস্বত্তিতে নিজের জীবন কাব্যকে ঋতু অহুসারে বিভক্ত করেছেন।

**বর্ষাকাল**—কবির শৈশব—কবি কাহিনী থেকে ছবি ও গান। কবির শৈশব থেকে নব যৌবনের সূচনা পর্যন্ত বর্ষাকাল রূপে নিরূপিত করেছেন (১৮৭৮—১৮৮৪)।

**বর্ষাপর্ষ্যায়ের প্রথম পর্ব**—কবির শৈশব।

কাব্যলক্ষ্মী—আম্মা তরুণড় (প্রাবণনিশি)। ‘তারা দেখা দিয়েছিল কেউ বা বনের ছায়ায়’—কবির প্রথমা প্রিয়া ‘কৈশোরিকা’।

কাব্যগ্রন্থ—কবি কাহিনী (১৮৭৮), ভগ্নহৃদয় (১৮৮২), নলিনী (.৮৮৪)।

**বর্ষাপর্ষ্যায়ের শেষ পর্ব**—শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিকাল থেকে নব যৌবনের সূচনা পর্যন্ত। ‘বাতায়নবাসী কবি’।

কাব্যলক্ষ্মী—কাদম্বরী দেবী (হে পুরাতন সহচরী। ‘কেউ বা নদীর ধারে’—গঙ্গাব তীব্রে চন্দননগর) কবির কাব্যসঙ্গিনী ও কাব্যের প্রেবণাদাত্রী নারী।

কাব্যগ্রন্থ—সন্ধ্যা সংগীত (১৮৮২), প্রভাত সংগীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪)।

**কবির ভৌগোলিক অবস্থান**—চন্দননগরের গঙ্গারতীর।  
কবির সন্ধ্যা সংগীত কাব্যগ্রন্থখানির সঙ্গে যুক্ত।

**শরৎকাল**—কবির যৌবন—কড়ি ও কোমল থেকে নৈবেদ্য।  
কবির নব যৌবন থেকে শেষ যৌবন পর্যন্ত শরৎকাল (১৮৮৬—১৯০১)।

**শরৎ পর্ষ্যায়ের প্রথম পর্ব**—কবির নব যৌবনের নব বসন্ত।  
আরম্ভ বেলাকার সাভাশের ‘কবি রবীন্দ্রনাথ’।

কাব্যলক্ষ্মী—মৃণালিনী দেবী (শরৎ লক্ষ্মী)। ‘নূতন’ (কড়ি ও কোমল) এবং বসন্তের নারী, ধীর আবির্ভাবে আদিরসাত্মক কবিতার সূত্রপাত।

কাব্যগ্রন্থ—কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০)। যুরোপসাত্রীর ডায়ারী (১৮৯০), চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড এবং কবির ভৌগোলিক অবস্থান (গাজীপুর) মানসী কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত।

**শরৎ পর্ষ্যায়ের দ্বিতীয় পর্ব**—পূর্ণ যৌবন, কবির ‘বসন্ত দিন’।



প্রেরণাদাত্রী—ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (লয়ে তোমার পুষ্প পক্ষী—কবির স্নেহভাজন নারী) সংগীতের প্রেরণাদাত্রী—ক্ষণিকার পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত সংগীতের তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক।

কাব্যগ্রন্থ—সোনার তরী (১৩০১), চিত্রা (১৩০২)। এই সময়ের মনোভাব কবি ‘ছিন্নপত্র’ বিশ্লেষণ করেছেন ৭ ডিসেম্বর ১৯২৪। ছিন্নপত্র—১৮২১—২৫।

**শরৎ পর্ষ্যায়ের শেষ পর্ব**—শেষ ঘোবনের শেষ বসন্ত বা অকাল বসন্তের ঘন বরষা।

কাব্যলক্ষ্মী—মৃণালিনী দেবী (কল্যাণী নারী—নূতন আশি)। ‘কেউ বা ঘরের কোণে’—গৃহলক্ষ্মী। কবির মঙ্গলকর্মের প্রেরণাদাত্রী ‘পূজারিণী নারী’। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে কবি শিলাইদহে কর্মমজের ‘উদ্‌বোধন’ করলেন। অধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ (নৈবেদ্য)।

কাব্যগ্রন্থ—ক্ষণিকা (১২০০), নৈবেদ্য (১২০১)। চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে ও পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে ‘ক্ষণিকার’ বিশ্লেষণ রয়েছে ৫ অক্টোবর ১৯২৪, এবং পূর্ববর্তীতে ‘ক্ষণিকার’ পরিচয় দিয়েছেন।

**শেষ সাতাশের শেষ বসন্ত-পূর্ববর্তী**—শেষ সাতাশের নিঃসঙ্গ কবি মহামানব রবীন্দ্রনাথ—৫ অক্টোবর ১৯২৪, ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯২৫ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি।

প্রেরণাদাত্রী—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো (তপস্বিনী নারী)। ‘কেউ বা পথের বঁকে’—কবির বিদেশী ফুল ও চিত্রকলার প্রেরণাদাত্রী।

কাব্যগ্রন্থ—পূর্ববর্তী (১৯২৪—২৫)। পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে পূর্ববর্তী কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করে ‘ক্ষণিকার’ পরিচয় দিয়েছেন (ক্ষণিকা—পূর্ববর্তী—৬ অক্টোবর ১৯২৪)।

পূর্ববর্তী—অতীত বসন্তব (কড়ি ও কোমল—ক্ষণিকা) শেষ রাগিণী (গান)।

বর্ষাকাল—কবির শৈশব

১৮৭৮—১৮৮৪

“বাতায়নবাসী কবি”—(ছবি ও গানের ভূমিকা)



वर्षापर्याप्तम् प्रथम पर्व—

রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের বহু রচনায় প্রেরণাস্বরূপা ছিলেন আত্মা তরুণ। কবি তাঁর নাম দেন ‘নলিনী’। কবির কাব্যগ্রন্থের প্রথম যুগে, অপরিণত মনের প্রদোষালোকের প্রথম স্তরের প্রথম পর্বে, কল্পনাশ্রবণ ও আবেগশ্রবণ কবির জীবনে যে কৈশোরিকার আগমন হয়েছিল, সেই প্রথম প্রিয়র উদ্দেশ্যে লিখেছেন কবি-কাহিনী, ভগ্নহৃদয়, নলিনী, মায়ার খেলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং বহু গান, আর পরবর্তীকালের কবিতায় লিখেছেন আমি-হারা, উপহার, স্মৃতিপ্রতিমা, কিশোর প্রেম, কনি ও কৈশোরিকা। কবি-কাহিনী, ভগ্নহৃদয়, নলিনী, মায়ার খেলাব বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরণের। নায়ক যে শাস্ত্র ভালোবাসা প্রথম জীবনে তাঁর বালাসঙ্গিনীর কাছে পেয়েছিলেন সেই ভালোবাসার মর্দাদা বুঝতে না পেরে অগ্র এক লীলাময়ী ও ছলনাময়ী নারীর রূপে মোহিত হয়ে সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পুনরায় সেই বালাসঙ্গিনীর কাছে ফিরে আসেন। কবি প্রথম পর্বের কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন—

क.-का. २

হৃদয় কানন তলে                      কবিরে লইয়া যেত  
নলিনী, সে যে এক বনেরি দেবতা ।

কবির কাব্যগ্রন্থের প্রথম যুগের প্রথম পর্বে প্রকৃতির বালক বালিকার মতোই কবি ও কবির প্রথমা প্রিয়াকে নিয়ে কল্পিত কাব্য কাহিনী রচিত হয়েছে। এবং বনফুল ও কবি কাহিনী কাব্যগ্রন্থে কবিতাকে মোহিনী কল্পনে ! ‘ভূন কল্পনা বালা’ বলে সর্ষোধন করেছেন। আবার বর্ষা পর্ষায়ের শেষ পর্বে সন্ধ্যা সংগীতে, কবির প্রথম যৌবন সমাগমের দক্ষণ, ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরে নিজের মধ্যেই নিজের যে আবর্তন ও যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে কবি শৈশবের প্রথমা প্রিয়া পুরাতন সখীকে কবির শূণ্য হৃদয়ের মধ্যে আহ্বান করে নিলেন। এবং তাঁর স্মৃতির মন্দিরখানি উজ্জ্বল করে অতীতের সেই কল্পনা জগতের পুরাতন বিশ্বকে পুরনায় ফিরে পেতে চাইলেন ‘আমি হারা’ ও ‘উপহারা’ কবিতায়। আর নবযৌবনের নববসন্তের সূচনায় ‘ছবি ও গানে’ শৈশবের স্মৃতিময়ী মায়া ‘স্মৃতি-প্রতিমা’ বাল্য সঙ্গিনী কবির শূণ্য হৃদয়ে আসন পাতেন।

জীবনস্মৃতিতে ‘কবি কাহিনী’ বিষয়ে মন্তব্য রয়েছে—‘যে’-বয়সে লেখক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেখেন নাই, কেবল নিজের অপরিমুচ্যতার ছায়ামূর্তিটাকেই খুব বড়ো করিয়া দেখিতেছে, ইহা সেই বয়সের লেখা। সেই জন্ত ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে—লেখক আপনাকে বাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে, ইহা তাহাই’ (জীবনস্মৃতি)। আবার নিজের বাল্য রচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিপিবদ্ধ করেন—‘বাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্ত লজ্জা বোধ হয় বটে, কিন্তু তখন মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিস্তার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা তো ভুল করিবারই কাল বটে কিন্তু বিশ্বাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভুলগুলিকে ইচ্ছন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জলিয়া থাকে, তবে যাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিন্তু সেই অগ্নির যা কাজ তাহা ইহজীবনে কখনোই ব্যর্থ হইবে না।’

তাই পরবর্তীকালের লেখা ‘কৈশোরিকা’ (বীথিকা) কবিতাটিতে কবি নিজের জীবনের প্রথম প্রণয় কাহিনীর কথা প্রকাশ করেছেন। এই কবিতাটিতে কবি প্রথমা প্রিয়াকে কৈশোর জীবনের আনন্দের মধ্যে তাঁর কাব্যতরঙ্গীতে আহ্বান করে কাব্যলক্ষ্মীরূপে বরণ করে নিলেন—

আমি কহিলাম, “তোমাতে আমাতে চলো,

তরুণ রোদ্র জলে করে ঝলোমলো,—  
নৌকা রয়েছে ঘাটে।”

এই কৈশোরিকাই কবির প্রথমা প্রিয়া ও প্রথমা কাব্যলক্ষ্মী যার প্রথম পদার্পনে  
কবির আনন্দময় কৈশোর জীবনের কাব্যতরঙ্গী পূর্ণ হয়।

পেলব প্রাণের প্রথম পসরা নিয়ে

সে তরঙ্গী—’ পরে পা ফেলেছ তুমি প্রিয়ে,

পাশাপাশি সেথা খেয়েছি ঢেউয়ের দোলা।

কখনো যা কথা কয়েছিলে কানে কানে,

কখনো বা মুখে ছলোছলো ছুনয়ানে

চেয়েছিলে ভাষা ভোলা।

কবির শেষ যৌবনে অকাল বসন্তের আগমনে (১৩০৭) ক্ষণিকায়, যৌবনের হিসাব-  
নিকাশের জগ্ন অতীত কৈশোরের প্রথমা প্রিয়াকে ‘অনবসর’ কবিতায় পরিহাস  
ছলে আহ্বান করে তাঁর উদ্দেশ্যে লিখলেন—‘এসো আমার আবেগ নিশি—তুমি  
এসো।’

**কাব্যগ্রন্থ—**

**কবি কাহিনী**—ভারতীতে মুদ্রিত আকারে প্রথম প্রকাশিত কাব্য  
গ্রন্থ। বয়স ষোল।

**ভগ্নহৃদয়**—বিলাতে আর একটি কাব্যের পুস্তক হইয়াছিল। কতকটা  
দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। ভগ্নহৃদয় যখন আরম্ভ করেছিলেম তখন  
আমার বয়স আঠারো।’

কবির বাল্যকালের এই বর্ষা পর্ষায়ের কাব্যগ্রন্থের প্রথম পর্ব সম্বন্ধে  
জীবনস্মৃতিতে আছে, ‘আমার পনেরো ষোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ তেইশ  
বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল।  
যে যুগে পৃথিবীতে জলস্থলের বিভাগ ভালো করিয়া হইয়া যায় নাই, তখনকার  
সেই প্রথম পঙ্কস্তরের উপর বৃহদায়তন অদ্ভুত-আকার উভচর জন্তুসকল  
আদিকালের শাখাসম্পদহীন অরণ্যের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত  
মনের প্রদোষালোকে আবেগগুলো সেইরূপ পরিমাণ বহিভূত অদ্ভুতমূর্তি ধারণ  
করিয়া একটা নামহীন পথহীন অস্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।  
তাহারা আপনাকেও জানে না, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানে না। তাহারা  
নিজেকে কিছুই জানে না বলিয়া পদে পদে আর-একটা-কিছুকে নকল করিতে  
থাকে।’

## বর্ষা পর্যায়ের শেষ পর্ব

ইরোপ-প্রবাসীর পত্র থেকে ছবি ও গান (১৮৭৮-১৮৮৪)।

**কাব্যালক্ষী**—‘হে পুরাতন সহচরী।’

কবির শৈশব থেকে কৈশোর যৌবনের সন্ধিকালে পর্যন্ত যে ‘স্নেহময়ী’ কল্পণাময়ী (ছবি ও গান) ও অসামান্য বিদূষী নারী শৈশবের অনাদৃত কবিকে, নিজেব স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে কবির জীবনকে আনন্দে অভিষিক্ত করেছিলেন ; কৈশোর জীবনের কাব্যতরঙ্গীকে ঠেলে দিয়েছিলেন পূর্ণতার লক্ষ্যে— তিনিই কবির নূতন বোঠান কাদম্বরী দেবী। জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছেও কবি চিন্তা এই নারীকে ঘিরে আলোড়িত হয়। বার বার স্পষ্টভঙ্গিতে বহু কবিতায় ও গানে প্রকাশিত। বহু কাব্যগ্রন্থেব উৎসর্গপত্র তার সাক্ষী। তবু তাঁর স্মৃতিচারণ যেন শেষ হয় না। এই নারীকে ঘিবেই কবির শৈশব ও প্রথম যৌবন পর্যন্ত কবির জীবন পরিক্রমা ও কাব্য পরিক্রমা এবং তিনিই ছিলেন সে প্রভাতের (কবির শৈশবের প্রাতে), বর্ষা পর্যায়ের প্রধান কাব্যালক্ষী।

সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে

এ বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী। (ছবি)।

এই নারীর প্রেৰণাই কবির প্রথম যুগের সাহিত্য সাধনার উৎস—

মোর চক্ষে এ নিখিলে

দিকে দিকে তুমিই লিখিলে

রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি (ছবি)।

আবার কবির বয়ঃসন্ধিকালের লেখা ‘ছবি ও গান’ কাব্যগ্রন্থে এই ‘স্নেহময়ী’ নারীর উদ্দেশ্যে রচিত—

ওই-যে তোমার কাছে সকলে দাঁড়ায়ে আছে

ওরা মোর আপনার লোক,

ওরাও আমারি মতো তোর স্নেহে আছে রত

জুঁই বেলা বকুল অশোক।

বড়ো সাধ যায় তোরে ফুল হয়ে থাকি ঘিরে

কাননে ফুলের সাথে মিশে

নয়নকিরণে তার জুলিবে পরাণ মোর,

স্ববাস ছুটিবে দিশে দিশে। (স্নেহময়ী)

এইসব কামনা ও আশা স্মৃতির মন্দিরে পরম ধনের মতো রক্ষিত হয় বলেই অনেক পরেও ‘চৈতালিতে’ এই পুরাতন সহচরীর ‘স্মৃতি’ পূর্ণবার তর্পিত হয়—

সে ছিল আরেক দিন এই তরী—' পরে

কণ্ঠ তার পূর্ণ ছিল স্বধাগীতিস্বরে ।

ছিল তার আঁখি দুটি ঘন পদ্মছায়,

সজল মেঘের মতো ভরা করুণায় ।

কোমল হৃদয়খানি উদ্বেলিত স্তখে,

উচ্ছ্বসি উঠিত হাসি নবল কোঁক্কে । (স্মৃতি) ।

কবির স্নেহময়ী করুণাময়ী ও কৌতুকময়ী কাব্যসজ্জিনীও কাব্যলক্ষ্মী যিনি কবির প্রথম যুগের (আরেক দিন, কাব্যতরগীতে (তরী—' পরে) পদার্পণ করেছিলেন এবং তাঁর স্নেহের ধারায় কবিকে অভিষিক্ত কবে বেখেছিলেন তাঁরই স্নেহলীলার কথা 'স্মৃতি' রূপে চৈতালিতে ও ক্ষণিকায় (তথ্যপি) প্রকাশ করেছেন । শৈশবে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই নারীর স্নেহের কাঙাল । জীবনস্মৃতিতে কবি তা' উল্লেখ করে গেছেন । তিনিই ছিলেন কবির কাব্যের প্রেবণাদাত্রী তাই কবির কাব্য রচনার মূলেও ছিলেন তিনি, আবার শৈশবে মাতৃহীন বালককে কাছে টেনে নিয়ে- ছিলেন বলে জীবনের মূলেও ছিলেন তিনি ।

‘তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে ।’

কবির সঙ্গে কাদম্বরী দেবীর ভাবগত ও চরিত্রগত মিল ছিল (জীবনস্মৃতি, চরিত্র), দুজনেই ছিলেন কবি । এই একটি মাত্র নারীর সঙ্গে ছিল তাঁব মিল । ‘মিলভাঙা’ ও ‘শেষ সপ্তক ত্রিশ’ সংখ্যক কবিতায় কবি লিখেছেন, কবির অসংখ্যের মধ্যে এই একটি মাত্র নারীর সঙ্গে ছিল তাঁর ভাবগত ও চরিত্রগত মিল । দুজনেই ছিলেন কবি, যেন কবিতার দুটি পদ । এই নারীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে সেই মিল ভেঙে গেল—যেন বিশ্বকবি তাঁর কবিতার একটি মিলের পদ কৌতুক করে মুছে দিলেন । আবার ‘মিলভাঙা’ কবিতায়ও সেই একই কথা লিখেছেন । কাদম্বরী দেবী এসেছিলেন কবির শৈশব জীবনে ।

মনের মধ্যে তখনো

অসংশয় হয় নি পাখির কাকলী,

বনের মর্মর একবার জাগে

একবার যায় মিলিয়ে ।

তিনি নিয়ে এসেছিলেন কবির জীবনের প্রথম বিষয় । তারপর বহুলোকের সংসারের মাঝখানে দুজনে মিলে যে কাব্য জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তার মূল্য ছিল রচনায় । পাখি যেমন খড় কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে, সেই রকম ছোট



ছোট উড়ে আসা ভাবনা দিয়ে দুজনে মিলে কাব্য রচনা করতেন। শেষে একদিন এই কাব্য জগৎ থেকে এই নারী ছোড় ভেঙে মিলিয়ে গেলেন। কবিও চলে এসেছেন এই নারীর জানা সীমাব বাইরে বহুদূরে। তিনি যদি আবার ফিরে আসেন তাঁর বাণী হবে খেলার ভেলা 'খেপা জলের ঘূর্ণিপাকে'। কবির প্রথম যুগের কাব্যরচনায় এই নারীর সহায়ভূতি ও উৎসাহ ছিল প্রচুর, এবং দুজনের মনের মিল ছিল বলেই প্রকাশ পেয়েছে নূতন গান, প্রথম সৃষ্টির আনন্দ। ইনিই কবির কিশোর বয়সের কাব্যতরঙ্গীকে ঠেলে দিয়েছিলেন বৃহত্তর জগতের দিকে তাই কবির নামের সঙ্গে তাঁর নাম থাকবে বাঁধা।

কবি এই নারীর রূপ চরিত্র এবং সমস্ত গুণগুলি এবং কবির জীবনের বাল্যকালের ঘটনাবলী তিনি জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা, ও কাব্যগ্রন্থে এবং বহু জনের কাছে অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করে গেছেন। 'কাঁচা আম' ও 'শ্রামা' কবিতায় কবি শৈশব জীবনের কাহিনী ব্যক্ত করেছেন এবং এই নারীর স্বর্ণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। কবি এই নারীর রূপ এবং চরিত্র কাব্যের মাধ্যমে পরিষ্কার ভাবে নির্দেশ করে দিয়ে গেছেন। তাই এই নারীকে কবিতায় মাধ্যমে খুঁজে নিতে খুব অন্তর্বিধা হয় না, এমন কি যাতে আমরা সহজেই অল্প নারীদের থেকে আলাদা ভাবে খুঁজে নিতে পাবি সেই উদ্দেশ্যে কবির দুটি কবিতা 'ছবি' ও 'শ্রামা' বিশেষভাবে যেখানে তাঁর রূপ ও চরিত্রের বর্ণনা আছে সেটাই কবি স্পষ্ট ভাবে বলে গেছেন।

**মৃত্যুর প্রথম অভিজ্ঞতা**—উদ্ভাস্তরঙ্গ-জীবনস্মৃতি ১১৮, ১১৯, ১২০ পৃষ্ঠা, বয়স ২৪ বৎসর।

তোমার ক্ষুণ্ণ ভঙ্গি তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত

নামিল আঘাত।

রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন, 'আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনে পূর্ণ নির্ভর ছিলেন, তিনি।' তাঁর সেই মর্মান্তিক ও আকস্মিক মৃত্যুই কবির স্মৃতির ও অল্পভূতিগ্রহণ মনকে দিশাহারা করে দেয়, এবং তাঁর মর্মান্তিক ও আকস্মিক মৃত্যুর আঘাতের কথা কবি কখনও ভোলেন নি, জীবনস্মৃতিতে ও বহু কবিতায় তার বর্ণনা দিয়েছেন—

ঘোর ঝটিকার রাতে দারুণ অশনিপাতে

বিদ্যীরিল যে গিরি-শিখর

বিশাল পর্বত কেটে, পাষাণ-হৃদয় ফেটে,

প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—

এই অল্প বয়সের প্রথম মৃত্যুর আঘাত কবিকে অনেকটা উদ্ভ্রান্তের মত করে দিয়ে স্থায়ী শোকের বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করে দিল। এই নারীর মৃত্যুতে কিছুদিনের জন্য কবির বেশভূষারও পরিবর্তন হয়েছিল। ‘কড়ি ও কোমলে’ আছে, ‘তখন আমার বেশভূষার আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটোয় বাঁধা ভোরবেলায় তোলা একমুঠো বেলফুল, পায়ে একজোড়া চটি।’ কবি শেষ সপ্তক ত্রিশ সংখ্যকে এই প্রেরণা স্বরূপা নারীকে উদ্দেশ্য করেন—

চোখে ছিল

একটা দিশাহারা ভয়ের চমক

পাছে কেউ পালায় তাকে না বলে।

তার হুটি পায়ে ছিল দ্বিধা,

ঠাহর পায নি

কোনখানে সোয়া

তার আঙিনাতে।

দেখা হল।

সংসারের আনাগোনার পথেব পাশে

আমার প্রতীক্ষা ছিল

গুধু ঐ টুকু নিয়ে।

তার পরে সে চলে গেছে।

এই ছত্র কয়টি বুঝি কাদম্বরী-জীবনের এক গূঢ় রহস্যকে উন্মোচন করতে সক্ষম।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোক কবি জীবনস্মৃতিতে, চিঠিপত্রে, কাব্যগ্রন্থে এবং লিপিকায় উল্লেখ করেছেন যদিও আলাদাভাবে মৃত্যুশোক জনিত In memorium জাতীয় কোন কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন নি। কবির শৈশব যৌবনের লেখা এবং কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি বিজড়িত ‘ছবি ও গান’ কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গ করে গেছেন, এবং কবি জীবনের এই পর্যায়ে শৈশবের বর্ধাষ্মতুর সঙ্গে তুলনা করেছেন—

আষাঢ়ের আসন্নবর্ষণ সন্ধ্যায়

যখন তোমাকে দেখি মনে মনে

দেখতে পাই তুমি আছ

সেইদিনকার কচি বোবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।

আবার ‘ছেলেবেলায়’ আছে, ‘গঙ্গার ধারে সেই স্বপ্ন দিয়ে মিনে করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিন্ধুকাতে।’ এই মৃত্যুর ভিতর দিয়েই কবি জগৎকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে দেখলেন—‘জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং স্বন্দর করিয়া দেখিবার জন্ম যে-দ্রব্ধের প্রয়োজন, মৃত্যু সেই দ্রব্ধ ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম, তাহা বড়ো মনোহর।’ কবির প্রথম গল্পগ্রন্থ ইউরোপ প্রবাসীর পত্র এবং শৈশব সংগীত এই নারীর উদ্দেশ্যেই লিখেছেন, এবং এই নারীর মৃত্যুর পর তাঁকে ছয়খানি কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করে তাঁর স্নেহের ও কাব্যের ঋণশোধের প্রচেষ্টা লক্ষণীয় (স্মরণ—সঁজুতি)।

**শ্রামা** —(উজ্জল শ্রামল বর্ণ)।

স্বন্দর তুমি বাঁধা রেখায়,

প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে (মিল ভাঙা-শ্রামলী)।

কবি এই নাবীকে এবং তাঁর রূপকে সৃষ্টি করেন নি, কারণ এই বিদূষী ও অসামান্য আধুনিক নাবী তাঁর আপন দেহের (বেখায়) সৌন্দর্যে ও রূপে অতুলনীয় ছিলেন। তাই কবি এই নারীকে ও তাঁর রূপকে কাব্যে যথাযথ ভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন। অমিতাভ চৌধুরীর লেখা ‘রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা’তেও কবি এই নারীকে আপন স্বরূপেই দেখতে চেয়েছেন। কবি কাব্যে গ্রন্থে থাকে সবচেয়ে বেশী উজ্জল ও স্পষ্টভাবে এঁকেছেন তিনি হলেন কবির নূতন বোঁঠান কাদম্বরী দেবী। (রূপ ও চরিত্র)।

কাদম্বরী দেবীর রং উজ্জল শ্রামলবর্ণ, গলায় পলার হার কিংবা সোনার হার। বড়ো বড়ো চোখ, চিকণ দেহ, ঘন পশ্চাঘ (স্মৃতি-চৈতালি), সরস অধর (ভৈরবী গান), পরিহাস প্রিয়া, চঞ্চল ও কৌতুকময়ী (শ্রামা), কবির সঙ্গে স্বভাবের ও মনের মিল ছিল। হৃদয়েই কবি, কবির অত্যন্ত চেনা নারী (শেষ সপ্তক ত্রিশ), আবেগপ্রবণ ও আধুনিক—

আধুনিক যারে বল তারে আমি চিনি যে

কবি যশে তারি কাছে বারো আনা ঋণী যে।

কবি শেষ যৌবনে অকাল বসন্তের আগমনে, শৈশবের এই ‘স্মৃতি’রূপিণী পরিহাস প্রিয়া পুরাতন সহচরীর উদ্দেশ্যে ঋণিকার ‘অনবসর’ কবিতায় স্মরণ করেন—

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চল

হে পুরাতন সহচরী!

অর্থাৎ কবির শেষ যৌবনে ‘স্মৃতি’ রূপিণী পুরাতন সহচরীর বিদায় এবং ‘বাস্তবে’র ‘নূতন আশির’ ‘আবির্ভাব’। (আবির্ভাব—কণিকা ১০ই আষাঢ় ১৩০৭ শিলাই-দহ, তথাপি—কণিকা)।

### কাব্যগ্রন্থ—

**সন্ধ্যা সঙ্গীত**—সন্ধ্যার মতোই বিষন্ন অন্তরের গান অথবা সন্ধ্যার মতোই আবৃত হৃদয়। হৃদয়—অরণ্যের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার গান যা’ তিনি শৈশব কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালে লিখেছেন।

**স্থান**—তেতালার ছাদ ও ঘর, চন্দননগর ও দশ নম্বর সদর ষ্ট্রীট।

যদিও কবির সেই সময় আনন্দ মুখরিত দিনগুলির মধ্যে কবির জীবনের আনন্দ উল্লাসের বাতা পাওয়া যায় (জীবনস্মৃতি), কিন্তু সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলির মধ্যে তার বিপরীত ভাবের সাক্ষ্য দেয়। এতদিন কবি শৈশবের কাব্যগ্রন্থগুলিতে (কবি-কাহিনী, ভগ্নহৃদয়), প্রধানতঃ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কল্পনা মিশ্রিত বাইরের উপাদান এবং প্রথমা শ্রিয়াই কবিতাতে অবলম্বিত হতো। সন্ধ্যাসংগীতে এই প্রথম কবি গোড় ফিরলেন। নিজের যৌবন সমাগমের দরুণ অন্তরের বিষাদ ও বেদনার কথা প্রকাশ কবে নিজেরই অন্তর কাহিনীর মনস্তত্ত্বমূলক কবিতার প্রথম সূত্রপাত ঘটালেন তিনি। এবং সেই সঙ্গে কবিতাকে ‘বধু’ রূপে সম্বোধন করে সন্ধ্যাসংগীতে ‘গান আরম্ভ’ করলেন। সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলির মধ্যে কবির যৌবন সমাগম জনিত কবি-মনের পরিবর্তন বিষাদ ও বেদনা এবং অন্তর যুদ্ধের কথা ব্যক্ত করেছেন। ‘এমনি করিয়া ঢুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল, বাঁচিয়া গেলাম যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই’ (জীবনস্মৃতি ২২ পৃষ্ঠা)। এই কারণেই কবির কাব্য লেখার ইতিহাসের মধ্যে সন্ধ্যাসংগীতই প্রথম স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ যেখানে কবির নিজস্ব মনের গভীরে নিজেরই অন্তর রহস্যের সন্ধান পেলেন। ‘সন্ধ্যাসংগীতে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোনোমতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনোমতে আগিয়া উঠিতে চায়, ভিতরের সত্যটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত অটলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে, অন্তরের

প্রকাশিত হয়েছে' (জীবনস্মৃতি পৃ: ৯৮)। কবির বাল্যকালের অর্থাৎ বর্ষার দিনে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। সন্ধ্যাসংগীতে যৌবনের প্রথম উন্মেষে কবির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সেই সহজ যোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কবি-মনের এই অসামঞ্জস্যের দরুণ কবির ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরে নিজেদের মধ্যেই নিজেদের যে আবর্তন ও যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেই অন্তর প্রকৃতির যুদ্ধের ইতিহাসেরই প্রকাশ রয়েছে কবির 'আশার নৈরাশ্র' দিয়ে হৃদয়ের 'গীতি ধ্বনি'তে 'দুঃখ-আবাহনের' মধ্যে 'শান্তি গীতে', 'অসহ ভালোবাসার' 'হলাহলে' এবং 'পরাজয় সংগীতে'র মধ্য দিয়ে 'সংগ্রাম সংগীতে' ও 'আমি-হারাতে'। কবির অন্তরের গভীরতম প্রদেশের এই ছই শক্তির ঘন্ডের কথা এই কবিতাগুলিতে ভালোভাবে প্রকাশিত। কবি অসহ ভালোবাসায় ব্যক্ত করেছেন—

এমন কি কেহ নাই, বল মোরে বল আশা,  
মার্জনা করিবে মোর অতি—অতি ভালোবাসা।

আবার 'হলাহল' কবিতায়—

প্রণয় অমৃত এ কি ? এ যে ঘোর হলাহল—  
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে  
অবশ করিছে দেহ, শোণিত করিছে জল।

কবি এই বিকৃত ভালোবাসার থেকে নিজেকে মুক্ত করে জগৎকে আবার আপন স্বরূপে দেখতে চাইলেন—

দূর করো, দূর করো বিকৃত এ ভালোবাসা—  
জীবনদ্বাদ্বিগী নহে এ যে গো হৃদয় নাশা।

সন্ধ্যাসংগীতের কবিতাগুলি প্রসঙ্গে কবির মন্তব্যই সম্ভবতঃ শেষ কথাটি উচ্চারণ করে, 'মাহুঘের মধ্যে অবস্থাবিন্যেবে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, অপরিষ্কৃতিতার ব্যাকুলতা। মাহুঘ প্রকৃতিতে তাহা সত্য, স্ততরাং তাহার প্রকাশকে মিথ্যা বলিব কী করিয়া। একরূপ কবিতার মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, তবে কি না মূল্য নাই তর্ক বলিয়া করা চলিতে পারে। কিন্তু, একেবারে নাই বলিলে কি অতুক্তি হইবে না। কেননা, কাবোর ভিতর দিয়া মাহুঘ আপনার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার কোনো পরিচয় যদি কোনো লেখায় ব্যক্ত হয় তবে মাহুঘ তাহাকে কুড়াইয়া রাখিয়া দেয়, ব্যক্ত যদি না হয় তবেই তাহাকে ফেলিয়া দিয়া থাকে।'।

## প্ৰভাত সংগীত—

মোহিতবাবুৰ গ্ৰন্থাবলীতে প্ৰভাত সংগীতৰ কবিতাগুলিকে ‘নিষ্ক্ৰমণ নাম দেওয়া হয়েছে। নিষ্ক্ৰমণ—বহিৰ্গমন। অস্তৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰথম বহিমুখ উচ্ছ্বাস, প্ৰভাতেৰ উজ্জ্বল আলোৰ মতই হৃদয়াবণ্য হইতে বাহিৰেৰে বিৰ্ধে প্ৰথম আগমনেৰ বাৰ্তা। ৰাতেৰ অন্ধকাৰ দূৰ হয়ে প্ৰভাতেৰ উজ্জ্বল আলোৰ মध्ये পৃথিবী যেমন সুন্দৰ হয়ে দেখা দেয়, তেমনি কবিৰ হৃদয়ও বিবাদেৰ আচ্ছাদন (বিকৃত ভালবাসা) থেকে মুক্ত হয়ে বিৰ্ধেৰ আলোকে আলোকিত হয়ে উঠল। প্ৰভাত সংগীতে কবি অস্তৰ প্ৰকৃতিৰ প্ৰথম বহিমুখ উচ্ছ্বাস দিয়ে নিৰ্মল অস্তৰেৰ গান গাইলেন—

আজি এ প্ৰভাতে ৰবিৰ কৰ

কেমনে পশিল প্ৰাণেৰ পৰ,

কেমনে পশিল

গুহাৰ আঁধাৰে

প্ৰভাত-পাখিৰ গান।

না জানি কেন রে

এতদিন পৰে

জাগিয়া উঠিল প্ৰাণ।

কবি জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন (১০৪পৃষ্ঠা)।—‘একদিন যখন যৌবনেৰ প্ৰথম উন্মেষে হৃদয় আপনাৰ খোঁৰাকৈৰ দ্বাৰি কৰিতে লাগিল, তখন বাহিৰেৰে সজে জীবনেৰ সহজ যোগটি বাধাগ্ৰস্ত হইয়া গেল। তখন বাধিত হৃদয়টাকে ঘিৰিয়া ঘিৰিয়া নিজেৰ মধ্যেই নিজেৰ আবৰ্তন শুকু হইল; চেতনা তখন আপনাৰ ভিতৰেৰ দিকেই আবদ্ধ হইয়া বহিল। এইৰূপে কল্প হৃদয়টাৰ আবদাৰে অস্তৰেৰে সজে বাহিৰেৰে যে সামঞ্জস্যটা ভাঙিয়া গেল, নিজেৰ চিৰদিনেৰে যে সহজ অধিকাৰটি হাৰাইলাম, সন্ধ্যাসংগীতে তাহাৰই বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে। অবশেষে একদিন সেই কল্প দ্বাৰ জানি না কোন্ ধাক্কাৰে হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, তখন বাহাকে হাৰাইয়াছিলাম তাহাকে পাইলাম। শুধু পাইলাম তাহা নহে, বিচ্ছেদেৰ ব্যবধানের ভিতৰে দিয়া তাহাৰ পূৰ্ণতৰ পৰিচয় পাইলাম। এইজন্য আমাৰ শিশু-কালেৰ বিৰ্ধে প্ৰভাত সংগীতে যখন আবাব পাইলাম তখন তাহাকে অনেক বেশি পাওয়া গেল। এমনি কৰিয়া প্ৰকৃতিৰ সজে সহজ মিলন (কবি কাহিনী) বিচ্ছেদ (সন্ধ্যাসংগীত) ও পুনর্মিলন (প্ৰভাত সংগীত) জীবনেৰ প্ৰথম অধ্যায়েৰ একটা পিলা শেষ হইয়া গেল।’

## ছবি ও গান—বসন্তের সূচনা। ‘বাতায়নবাসী বয়ঃ- সন্ধিকালের কবি’—

কবির কৈশোর যৌবনের বয়ঃসন্ধিকালের লেখা। যৌবন আরম্ভের প্রথম পর্ব, বসন্তের সূচনা।

**সূচনা**—‘চৌরঙ্গির নিকটবর্তী সাকুল্যর রোডের একটি বাগানবাড়িতে আমরা তখন বাস করতাম। তাহার দক্ষিণের দিকে মস্ত একটা বসতি ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া সেই লোকালয়ের দৃশ্য দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত—সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত’ (জীবনস্মৃতি)।

কবির কৈশোর যৌবনের বয়ঃসন্ধিকালে নব যৌবনের সূচনায় সংসারের নানান রূপের ছবিই কবির অন্তরের গান হয়ে ‘ছবি ও গানে’ মূৰ্ত্ত হয়। ‘সেইদিন নব যৌবনের নানান রঙের বাস্কাটা নূতন পাইয়া আপন মনে কেবলই রকম-বেরকম ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশবছর বয়সের সঙ্গে এই ছবিগুলোকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়তো ইহাদের কাঁচা লাইন ও ঝাপসা রঙের ভিতর দিয়াও একটা কিছু চেহারা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে।’ কবি ‘ছবি ও গান’ কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—‘এটা বয়ঃসন্ধিকালের লেখা, শৈশব যৌবন সবে মিলেছে। ভাষায় আছে ছেলেমানুষি, ভাবে এসেছে কৈশোর। তার পূর্বকার অবস্থায় একটা বেদনা ছিল অহুদ্দিষ্ট, সে যেন প্রলাপ বকে আপনাকে শান্ত করতে চেয়েছে। কিছু আলো আধারে রূপের আভাস পায়, স্পষ্ট করে কিছু পায় না। ছবি এঁকে তখন প্রত্যক্ষতার স্বাদ পাবার ইচ্ছা জেগেছে মনে, কিন্তু ছবি আঁকবার হাত তেরি হয় নি তো। কবি সংসারের ভিতরে তখনও প্রবেশ করেন নি তখনও সে বাতায়নবাসী। দূর থেকে যার আভাস দেখে তার সঙ্গে নিজের মনের নেশা মিলিয়ে দেয়।’ এই বাতায়নবাসী বয়ঃসন্ধিকালের কবি নিজের মনের নেশা মিলিয়ে তাঁর দূরের ধ্বংস ছবি এঁকে বসন্তের ও নব যৌবনের সূচনা করলেন ‘স্বপ্ন স্বপ্ন’ ও ‘জাগ্রত স্বপ্নের’ মধ্যে অনাগত ‘কে’ কবিতাটি লিখে। কবি এই সময়কার নিজের মনের অবস্থার কথা বর্ণনা দিয়েছেন প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডে; ‘স্বপ্ন স্বপ্ন’ ও ‘জাগ্রত স্বপ্নের’ কবিতার মধ্যে—

উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ,  
 উদাস পরান কোথা নিরুদ্ধেশ,  
 হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি  
 ভ্রমিতেছি আনমনে ।  
 চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,  
 যৌবন কুসুম প্রাণে বিকশিত,  
 কুসুমের পরে ফেলিব চরণ  
 যৌবন মাধুরী ভরে  
 চারি দিকে মোর মাধবী মালতী  
 সৌরভে আকুল করে ।  
 কেহ কি আমারে চাহিবে না ?  
 কাছে এসে গান গাহিবে না ?  
 পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে  
 কবে না প্রাণের আশা ?  
 চাঁদের আলোতে দখিন বাতাসে  
 কুসুমকাননে বাঁধি বাহুপাশে  
 শরমে সোহাগে মৃত মধু হাসে  
 জানাবে না ভালোবাসা ?  
 আমার যৌবন কুসুম কাননে  
 ললিত চরণে বেড়াবে না ?  
 আমার প্রাণের লতিকা-বাঁধন  
 চরণে তাহার জড়াবে না ?  
 আমার প্রাণের কুসুম গাঁথিয়া  
 কেহ পরিবে না গলে ?  
 তাই ভাবিতেছি আপনার মনে  
 বসিয়া তরুর তলে ।

কবি বয়ঃসন্ধিকালের প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে যৌবনের প্রারম্ভে ‘জাগ্রত স্বপ্নের’ ভাবনার মধ্যে তাঁর দূরের বঁধুব’ উত্তরীয়ের স্নগন্ধি হাওয়ার আভাস পেলেন, এবং এই স্নগন্ধি হাওয়ার ‘স্বপ্ন স্বপ্নের’ আভাস ও ‘জাগ্রত স্বপ্নের’ মধ্য দিয়ে বর্ষাপর্ষায়ের শেষ পূর্বে, কবির ভালো লাগুক বা না লাগুক স্থায়ী-ভাবে কবির জীবনে রহস্যময় যৌবনেব আবির্ভাব হল যা’ কবির—



বৃকের ভিতরে ছুরির মতন,  
মনের মাঝারে বিষের মতন,  
রোগের মতন, শোকের মতন  
রব আমি অনিবার । (রাহুর প্রেম) ।

### প্রকৃতির প্রতিশোধ—

কবির জীবন নাট্যের সূচনা । সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা । স্থান—কারোয়ার সমুদ্রতীর । কবি জীবনযন্ত্রিতে লিখেছেন (১০২ পৃষ্ঠা), এই কারোয়ারে ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নামক নাট্য কাব্যটি লিখিয়াছিলাম । এই কাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিগুহভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল । অনন্ত যেন সব কিছুর বাইরে । অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহ পাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হহতে সংসারে ফিরাইয়া আনে ।’

বিবাহ-পূর্ব কবি কল্পনার বালিকা-রূপিণী সীমা ও সন্ন্যাসী রূপী অসীমের মিলন সাধনের ভাবরূপ কবির মনে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাট্য কাব্যে । এই নাট্য কাব্যে বালিকা-রূপিণী সীমার ভালোবাসার সঙ্গে সন্ন্যাসী রূপী অসীমের শূন্যতার মিলন সাধনের মধ্যেই জীবনের পূর্ণতার কথা প্রকাশ করে নিজেদেরই জীবন নাট্যের ও কাব্য নাট্যের ভূমিকা রচনা করলেন । বালিকার স্নেহই সন্ন্যাসী অনন্তের ধ্যান থেকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে আসে । সংসারে এসে সন্ন্যাসীর এই উপলব্ধি হয়—‘ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি । প্রেমের আলো যখনই পাই তখনই যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দোষ সীমার মধ্যেও সীমা নাই ।’ বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যের স্নেহ প্রেম দুইই কবিকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু তিনি সেই মোহের দ্বারা বদ্ধ নন । কবি আত্মপরিশুদ্ধে লিখেছেন—‘জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদের টানিতেছেন আর কাহারও টানিবার ক্ষমতা নাই । পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপকল্পকে প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি ।’ কবির পরবর্তীকালের সমস্ত রচনার ভূমিকা । ইহাই কবির জীবনে ও কাব্যে এই একটি মাত্র পালা, সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা । কবির কবিতায়ও ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ।

অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,  
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।  
প্রলয়ে স্বপ্ননে না জানি এ কার যুক্তি,  
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,  
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,  
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

কবির প্রেমের একটি ধারায় রয়েছে বৈরাগ্যের ধারা (অসীম, সন্ন্যাসী সত্তা) যা' তাঁকে শেষ যৌবনে' মঙ্গলকর্মের দিকে টেনে নিয়ে গেল। আর এক ধারায় রয়েছে সীমার (নারী, জ্ঞেহ, প্রেম, সত্তা) মধ্যে অসীমের (শূন্যতা সন্ন্যাসীসত্তা) মিলন সাধনের কথা। সেই কথা কবি নানাভাবে নানা রূপে কবিতায় ও গানে প্রকাশ করেছেন। এই সংসারকে সত্য ভাবে গ্রহণ করে তাব অর্থ দুঃখ, আনন্দ বেদনা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃত, আনন্দে প্রেমে উত্তীর্ণ হবার কথাই কবি বার বার লিখেছেন। 'আমি বালক বয়সে প্রকৃতির প্রতিশোধ লিখিয়াছিলাম—তখন আমি নিজে ভালো করিয়া, বুঝিয়াছিলাম কি না জানি না—কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা ষথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে' (আত্মপরিচয় ১৭৮ পৃঃ)।

তাই কারোয়ার হইতে ফিরিবার পথে আনন্দের সঙ্গে কবি 'হাদে গো নন্দরাণী' গানটি রচনা করেন। এবং কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসাব কিছুকাল পরে ১২২০ সালে ২৪শে অগ্রহায়ণে কবির বিবাহ হয়, তখন কবির বয়স বাইশ বৎসর। (জীবনস্মৃতি)।

## শরণ কাল—কবির যৌবন

১৮৮৪-১৯০২

‘কবির বিশ্বরণধর্মী জীবন’।

অতি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য জু পাকার করে তা দিয়ে স্বরণস্তম্ভ হতে পারে,  
কিন্তু জীবনচরিত হবে কী করে? জীবন চরিত থেকে যদি বিশ্বরণধর্মী  
জীবনটাই বাদ পড়ে তা হলে মৃত চরিতের কবরটাকে নিয়ে হবে কী?

## মানসী ও ক্ষণিকা

(যৌবনের মানসভূমি—গাজীপুর, শিলাইদহ) ।

তার পরে ?

যে জীবনে আলো নিবল

স্বর থামল,

সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই

ভরা সত্য ছিল,

সে কথা একেবারেই ভুলবে জানি,

ভোলাই ভালো ।

তবু তার আগে কোনো একদিনের জ্ঞান

কেউ একজন

সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখে

বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো ।

## শরৎ কাল—কবির যৌবন

বসন্ত কাল—কড়ি ও কোমল থেকে নৈবেদ্য ।

‘একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে

প্রিয়ার মধুর রূপে’ (পত্রপুট পনেরো) ।

নবযৌবনের শবৎকালে (১২২১ বঙ্গাব্দ আশ্বিন - শরৎকাল), দূরের বঁধুর আগমনে (১২২০ বঙ্গাব্দ ২৪শে অগ্রহায়ণ), কবির নববসন্তের ও বসন্তরাতের ফুল (বসন্ত-কল্পনা) ‘কড়ি ও কোমল’ এবং মানদী’ কাব্যগ্রন্থে ফুটে উঠল—

আকাশের দুই দিক হতে দুইখানি মেঘ এল ভেসে,

দুই খানি দিশাহারা মেঘ—কে জানে এসেছে কোথা হতে ।

অথবা—

হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে

চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য আভাসে (স্মরণ ২২ সংখ্যক) ।

**রবীন্দ্র কাব্যের শ্রেষ্ঠ পর্ব—**(১৮৮৬-১২০১) কড়ি ও কোমল থেকে নৈবেদ্য । **যৌবনের মানসভূমি ।**

**কড়ি ও কোমল—কবির নবযৌবনের গান** (১৮৮৬) ।

‘যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেবণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে । কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা ।’ কবির নবযৌবনের নববসন্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে দখিণ হাওয়া, নব ফাস্তুণ, চৈত্র পূর্ণিমা, কনক চাঁপা, সর্ষে ফুলের গন্ধের সঙ্গে প্রেমের স্মৃতি এবং তাবই সঙ্গে কবির মনের মধ্যে নেশার মতো বয়ে গেছে হেনার গন্ধে ভরা বাসন্তী রং এবং আকাশের সঙ্গে বাসন্তী<sup>২</sup> রঙের বসনধানি । কড়ি ও কোমল কবির কাব্যগ্রন্থের প্রথম ডাঙা এবং শূন্য জীবনের প্রথম সৈকত তীব্র অথবা জীবন নাটোর প্রথম অঙ্কভাগ । আরম্ভ বেলাকাঁচ সাতাশের ‘কবি রবীন্দ্রনাথ’—২৭ জুন ১৮৮৭ ছিন্নপত্র ।

স্থান—তেতালাব ছাদ ও কোণের ঘর, দক্ষিণের বারান্দা, বন্দোব’ সমুদ্র-তীর, সোলাপুর ও নাসিক ।

কবি ছিন্নপত্রে লিখেছেন—‘জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যাকথা বলি নে, সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের আশ্রয় স্থান ।’ তাই কবির কবিতার মধ্যে

প্রচ্ছন্নভাবে 'অশরীর্যভাবে' যে শ্রামলী নারীকে পাওয়া যায় তিনিও কবির জীবনে গভীর ভাবে সত্য ছিলেন।

সবচেয়ে সত্য করে পেয়েছিলাম যাবে  
সবচেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছদ্মবেশ ধবি,  
অস্তিত্বের এ কলঙ্ক কভু  
সহিত না বিশ্বের বিধান  
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি শেষ লেখা দুঃ)।

কবির যৌবনকে এবং শূন্য দিগন্তকে ঘিরে যে নারীর আবির্ভাব ও তীব্রতা  
তিনিই কবিপত্নী মুণালিনী দেবী।

সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল  
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল

চকিত পদে

(শেষ সপ্তক ছয়)।

যার কথা কবি কখনো কোথাও বলেন নি, যাকে কবিতায় 'অশরীর্য নারী'রূপে  
মলিন বেশে 'প্রচ্ছন্ন' (থেয়া কাব্যগ্রন্থ) করে রেখেছেন।

### শরৎ পর্যায়ের প্রথম পর্ব—

কড়ি ও কোমল, মানসী (১৮৮৬-১৮৯০) কবির নব বসন্ত।

### কাব্যালক্ষ্যী — 'এসো আমার শরৎ-লক্ষ্যী'।

কবির যৌবনে এই নারীর আবির্ভাবে কবির কাব্যের ও সাহিত্যের যেমন  
শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হয়েছিল তেমনি কবির জীবনেরও শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয়েছিল। এই  
সময়টা কবির কাব্যের (১৮৮৩-১৯০১) স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যায়। এবং  
বহু গান, গল্প, কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের উৎস স্থান। আর এই শরৎ পর্যায়ের  
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধিত্বের বিশেষ যোগাযোগ হয় (১৯২১ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র—  
অগ্রহায়ণ)। কবি নিজের প্রথম যুগের কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে কড়ি ও কোমলের  
তুলনা করে মন্তব্য করেছেন—'আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন  
কেবল ভাবাবেগের বাষ্প, এবং বায়ু, এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলা ছন্দ ও  
অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের  
রঙ্গ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে  
কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানা প্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।'।  
কবির এই নব যৌবনের রসোচ্ছ্বাস কেবল যে মানব জীবনের বিচিত্র রসলীলা

কবির মনকে আকৃষ্ট করেছিল তা নয় সেই সঙ্গে কবির চিত্রকলা গান গল্প কবিতা সবই যেন একসঙ্গে কবির অন্তঃস্তরের উৎস থেকে আপনা আপনি উৎসারিত হচ্ছিল। তাই কবি শব্দকালের বর্ণনা লিখেছেন—মনে পড়ে, হৃদয় বেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘবে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। মে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা কণা। যেটুকু মনেব মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না সেইটুকুই ছিল তাহাব প্রবান অংশ।’ শব্দকালেব আব একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কবির গান ও ছবি আঁকা। এই প্রথম কবি ছবি আঁকার কথা উল্লেখ করলেন অর্থাৎ কবির নবযৌবনেব বসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্তবেব সমস্ত ইচ্ছা আপনা আপনিই প্রস্ফুটত হতে লাগল, নবযৌবনেই (কডি ও কোমল—শব্দকাল কবির ছবি আঁকা উল্লেখযোগ্য ভাবে শুরু হয়েছিল। বৃদ্ধ বয়সে তা সম্পূর্ণ পায়। এই দিক থেকে কবির জীবনেব শব্দ পর্ষায় (কডি ও কোমল) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবির নবযৌবনের লেখা কডি ও কোমলের ভাষা ও ছন্দ যেমন নানা রূপ ধরে উঠবার চেষ্টা করছে তেমনি কবির গান গল্প চিত্রকলাও বিশিষ্ট রূপ নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। ‘আব এই শব্দকালের মধুর উজ্জল আলোটিব মধ্যে যে উৎসব তাহা মালুযেব। মেঘ বোদ্রেব লীলাকে শশাটে বাধিয়া স্বখণ্ডঃখের আলোলন মর্মবিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশেব উপবে মালুযেব অনিমেষ দৃষ্টিব আবেশটুকু একটা বড় মাথাইয়াছে, এবং বাতাসেব সঙ্গে মালুযের হৃদয়েব আকাঙ্ক্ষাবেগ নিখসিত হইয়া বহিতেছে।

মনেব সঙ্গে মনেব আপস, ইচ্ছাব সঙ্গে ইচ্ছাব বোঝাপড়া, কত বাক্যচোরা বাধাব ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। সেই-সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নিরবধাবা মুখবিত উচ্ছ্বাসে হাসিকান্নায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য কবিতা থাকে, পদে পদে আবত ঘুবিয়া ঘুরিয়া উঠে এবং তাহাব গতিবিধির কোন নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না’ (জীবনস্মৃতি—বর্ষা ও শরৎ)।

কবির এই নবযৌবনেব নববসন্তের বাসন্তী রং এব আকাশে, শুক্লা চতুর্থীব চাঁদেব আলোতে, এক অচেনা নারী কবির বসন্তরাতে (বসন্ত-কল্পনা, গীতালি ১০৮ সংখ্যক) ভীক দীপশিখা এবং বর্ণ গন্ধ গান ও বসন্তের রূপ নিয়ে রূপকালের জন্ত আসে। আব সেই ‘নূতন’কে (কডি ও কোমল) ‘যৌবন স্বপ্নের’ ‘গীতোচ্ছ্বাসে’র মধ্যে তিনি বরণ করে নেন। এবং সেই সঙ্গে কবির নীরব

বাণিশখানি বেজে উঠে আবার বহুদিন পরে কাব্যাজগতের নূতন কাব্যলক্ষ্মী ‘শরৎ-লক্ষ্মী’ রূপে ফিরে আসে—

জগৎ-কমল-বনে কমল-আসন।

কতদিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে।

পরবর্তীকালে আকাশ প্রদীপের ‘বধূ’ কবিতায় কবি শৈশবকৈশোরের স্বাভিচারণ করে বসন্তের নারীর কথাই বাস্তব করেছেন। কবির যৌবনের রূপ বস বর্ণগন্ধময় প্রথম বসন্তে, নারীর রহস্যময় স্পর্শের আনন্দের তীব্রতায় অভিভূত মুহূর্তে সেই নারীকেই শুধিয়েছিলেন—

“তুমি কি সেই,

আধারের কোন্ ঘাট হতে

এসেছ আলোকে।”

অর্থাৎ তুমিই কি সেই শৈশবের কৈলাশ মুখুজোর ছড়ার বধূ (জীবনস্মৃতি, ৭ পৃষ্ঠা)। কবি যৌবনের প্রারম্ভেই ‘জাগ্রত স্বপ্নের’ ভাবনার মধ্যে এই দুর্বল বধূর উত্তরায়ের স্বগন্ধি হাওয়ার আভাস পেয়েছিলেন! শৈশবের সেই ছড়ার বধূ এতদিনে বুঝি প্রত্যক্ষ সংসারের সীমায় কবির যৌবনে ‘বাস্তব বধূ’ রূপে প্রকাশিত হয়। আর তারই রহস্যময় স্পর্শে নূতন চেতনায় জেগে ওঠে কবির স্তম্ভ যৌবন। ‘অকাল ঘুম’ (শ্রামলী) কবিতায় ঠিক এই কথাই উচ্চারণ করেন কবি -

“কে তুমি।

তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন লোকে।”

কড়ি ও কোমলের ‘নিদ্রিতার চিত্র’টি পরবর্তীকালে আরও বিস্তারিত বর্ণনায় ‘অকাল ঘুম’ কবিতায় চিত্রিত। এই ‘নিদ্রিতার চিত্র’ ভাব ও রূপ এই দুই অংশে বিভক্ত হয়ে অপক্লপ সৌকর্যে বিকশিত হয় ‘নিদ্রিতা’ ও ‘স্বপ্নোচ্ছিতা’র ছবি। কড়ি ও কোমলের বহু কবিতা রূপান্তরিত হয়ে অজাগ কাব্যগ্রন্থে লিখিত হয়েছে।

যৌবনে কবি ছিলেন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ অল্পভূমিপ্রবণ, খেয়ালি সরল ও অধৈর্যপ্রকৃতির; তাই কবির আবেগের গতি যে দিকে যে ভাবে গেছে কবির কবিতাগুলিও সেই পথগামী। এবং কিছুদিনের মধ্যেই কবি মৃত্যুকে এবং ‘পুরাতন’কে পশ্চাতে রেখে জীবনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন। ‘নূতনে’র উদ্দেশ্যে



রচনা করেন ‘তুমি’—যা অদূর ভবিষ্যতে কবির জীবনে বিশেষ রূপ ধরে ‘পরিশেষে’ দেখা দেয় ‘তুমি’ আর ‘আমি’ রূপে। যদিও শরৎ কাল কবির নব যৌবনের নববসন্ত কিন্তু তখনও তিনি ‘শেষ কথা’ বলেন নি। তাই কড়ি ও কোমলের ‘শেষ কথা’য় লিখেছেন—

মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে,  
সে কথা হঠলে বলা সব বলা হয়।  
কল্পনা কাঁদিয়া কিবে তারি পাছে পাছে,  
তারি তরে চেয়ে আছে সমস্ত হৃদয়।

কবি যেন এই একটি কথার জগুই অপেক্ষা করে আছেন! কিন্তু ২২ অক্টোবর ‘৮৯ সালে যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে কবি-মনের পারবর্তন ঘটে। কবি স্বগতোক্তি করেন ‘কোন অসম্ভব স্থখ, কোন দুর্লভ ভালোবাসার এত চিরদিন নিখোঁসেব মতো অপেক্ষা করে বসে আছি আমাদের কি অপেক্ষা করবার সময় আছে।’ অবশেষে বসন্তের ‘সমাপ্তি’ ও অকাল বসন্তের সূচনায় চৈত্রালির ‘শেষ কথা’য় কবির হৃদয়ে ভাব যজ্ঞ স্রুত হয়ে মংগাগানের এক ব্যাকুল হয়ে উঠল ৩০ চৈত্র ১৩০২।

এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ  
উজ্জ্বলি উঠিবে যেন সেই মহাগান।  
অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলে আসি—  
হে চির স্নহর আমি তোরে ভালোবাসি।

‘তত্ত্ব’ কবিতাটি মুগালিনী দেবীর উদ্দেশ্যেই রচিত এবং যখনই তাঁর রূপের বর্ণনা দিয়েছেন তখনই ‘তত্ত্ব’ ‘তত্ত্বদেহ’ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ‘তত্ত্ব’ কবিতাটিতে ‘পঞ্চদশ’ কথাটিও গুরুত্বপূর্ণ এবং কবি বসন্তের সঙ্গে জড়িত। ‘পূর্ণা’ (পরিপূর্ণা, সফলা—সানাতী) কবিতাটিতে ‘পঞ্চদশী’ কথাটির উল্লেখ রয়েছে। এই পঞ্চদশী নামে, ‘কর্দিকে তিন’ সানাতী মাহাত্ম্যে অর্থাৎ ক যৌবনবতী মনোরমা প্রণয়িনী এই ৬টি স্বরূপে তিনি সফলা বা পরিপূর্ণা যার মনের দিগন্তে অকারণ বেদনার গোপন অশান্তি। কবি মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে ‘শেষ লেখা ৮ সংখ্যক’ কবিতায় পঞ্চদশ কথটি পরিবর্তিত করে ‘বিবাহের পঞ্চম বরষে’ পরিণত করেছেন। ‘বিবাহের পঞ্চা বরষ’ অর্থাৎ সানাতী বৎসব পর্যন্ত কবির প্রথম বসন্ত, যে বসন্ত বহুসংখ্য যৌবনের পরিণত বসন্তের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে আর

তা পুষ্পের রক্তরী থেকে ফলের স্তবকে পবিত্র হয়ে অতিথিকে\* আহ্বান করে  
আনে। আবার বিবাহের প্রথম বৎসবে—

দিকে দিগন্তাব

শাহানায বে'জছিন বা'শি

উঠেছিল নাজানা, ন হা'সি

কবিব নবযৌবনের নববসন্তের প্রথম বৎসবে বিবাহ উৎসবেই আনন্দে মধ্যে  
শাহানায বসন্ত পঞ্চম রাগ বেজে উঠেছিল আবেশে যৌবনের শেষ বসন্তে 'সুখ  
অকারণ পুলকে' বেজে উঠেছিল মূলতান বাগিণীব সঙ্গে প্রেমের গান। কবির  
আদিরসাত্মক কবিতাব সূত্রপাতও কাঁড় ও কোমল কাবাগ্রন্থে। এই রীতিব  
কবিতাব প্রথম আধুনিক পথপ্রদর্শকও তিনি, এবং পরবর্তীকালের কাবাগ্রন্থের  
বহু কবিতায় তা প্রকাশ কবেছেন। কাঁড় ও কোমল কাবাগ্রন্থখানিও অধিকাংশ  
কবিতা এই পঞ্চদশী নারী ও সাতাশেবড় কবিকে নিয়েই রচিত হয়েছে যদিও এই  
নারীর সঙ্গে কবির রূপ ও চরিত্রের যথেষ্ট 'প্রভেদ' (বিচিত্রিতা) অনুধাবন যোগ্য।

এই নারী কবিব বিপরীত চরিত্র ছিলেন, ফণিকার 'দুই তীরে' এবং  
সোনার তরীর 'দুই পাখি' (নর নারী) কবিতাটিতে তাঁদের দুই বিপরীত চরিত্রের  
বর্ণনা দিয়েছেন—একজন ভালোবাসেন নীড (খাঁচা), অপরজন ভালোবাসেন  
আকাশ (সুখ, বালু চব), ওঁ নীড ও আকাশের মাঝে বইছে ভালোবাসার  
নদী। এই চরিত্রগত পার্থক্যের জন্য তিনি ছিলেন কবির অচেনা\*। 'যাকে দশ-  
বৎসর জানি, সেই দশবৎসরের সুদীর্ঘ অংশ তাকে জানি নে—বোধহয় আজীবন  
সম্পর্কের জমা খরচ হিসাব করলে খুব একটা বড়ো রকম অঙ্ক হাতে থাকে না।  
এই তো কেবল চোখের জানা তাবপবে মনের জানার তো কথাই নেই। সে কথা  
ভেবে দেখলে সবাইকেই অপচিহ্ন বলে বোধহয়।' (ছিন্নপত্র ১৩০)

'তুমি চেন না আমাকে, তোমাকে চিনি নে আমি

আজ পর্যন্ত কেমন কবে এটা হল সম্ব

তাই আমি ভাবি।"

খামি বললেন, "তুই না চেনার মাঝখানে

চিরকাল ধরে আমবা ভুলে বোধ সেতু,

এই কৌতুহল দমস্ত বিশেষ অন্তরে।" (পত্রপুট, ১৫ সংখ্যক।)

শ্রামলা\*, শ্রামলা\* কবিতায় এই নারীর রূপ ও চরিত্রের বর্ণনা আছে।  
বাস্তবের এই ধীর, স্থির, শান্ত, আবেগহীন, সনাতনী, স্বল্পভাবী ও কল্যাণী নারী

এবং কবি কল্পনার অর্ধ মানবী ও অর্ধ কল্পনার মানসীকে ঘিরেই আবেগ প্রবণ কবির ভালোবাসা সম্বন্ধে সংশয়েব সূত্রপাত, যা কবিব ডাষারি, কাব্য ও গানের অধিকাংশ অধিকার করে রয়েছে। হেমসুখালা দেবীর প্রেমের উত্তরে লিখিত 'নীহারিকা' (বিচিত্রিতা) কবিতায় এই অশরীরী নারীর উক্তি দিয়ে কবি নিজের সংশয়িত প্রেমের কথাই ব্যক্ত করেছেন—“আমি যখন তোমাকে চুশন কবে নিশ্চিন্তি বাতের অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জ্বলে দিয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে ভালো কবে দেখনি, শুধু অর্ধ জাগরণের মধ্যে দেখেছিলে। আমি তোমাব খেয়ালি পুরুষের প্রথম নারী, যে তোমার জীবনে বর্ণ গন্ধ গান ও রহস্যময় যৌবনের আভাস নিয়ে প্রথম বসন্তের ফুল ফুটিয়েছিল (কডি ও কোমল, মানসী কাব্যগ্রন্থ)। সেদিন তুমি আমাকে বুঝে নাও নি, জেগে উঠ কোন ভাষাও বুঝে পাও নি আমাকে সমাদরও কব নি শুধু সংশয়ের দোলায় দুলে তুমি তোমার রাত কাটালে। সংশয়ের আবেগ-মানসী। আমি যেন তোমার জীবনে এসেছিলাম অকাল বর্ষণের এক পশলা ধারার মতো তারপবই তো আমাব জয় হল সেই স্বপ্ন পরিচয় নিয়েই আমি তোমাব চন্দ্রের মধ্যে বাসা বেঁধেছি। আমি তোমার চেনা কিংবা অচেনা যাই হই না কেন আমি 'তোমাবই'। আমাকে হাবিয়ে আমাবই বিরহের গান আজ তোমাব বীণায় বাজে। যেদিন আমি তোমার বসন্তে (শরৎকালে) একা এসেছিলাম সেদিন তোমাব যৌবন হস্ত ছিল। আমি তোমাব স্তম্ভ যৌবনকে জাগ্রত করে তে মাব বন্ধ হৃদয়কে ভালোবাসা দিয়ে উন্মত্ত কবে তাকে রাক্ষসে গন্ধ বিভোল বড় ছড়ানো বনের ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছিলাম। আজ তাই তোমাব গানের সঙ্গে, তোমার গোপন অশ্রুজলের মধ্যে তোমাব আনন্দের মধ্যে আমাবই বিবহের গান রয়েছে এবং আমার প্রিয় হাতের ছোঁয়া” তোমাব কাবোর মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে।”

চিত্রা ও কল্পনা কাব্যগ্রন্থ (১৯০৬ বঙ্গাব্দ) কবিব যখন 'দুঃসময়' আবহু হল সেই 'দুঃসময়ে' একমাত্র মুণালিনী দেবীই ছিলেন ঋণগ্রস্ত কবির 'সামান্য'-দাত্রী নারী এবং

সুদিনে দুর্দিনে

কল্যাণকঙ্কন করে,

সীমন্ত সীমায় মঙ্গলদিন্দুব বিন্দু,

গৃহলক্ষ্মী দুঃখ স্তাথ পূর্ণিমাব ইন্দু

সংসারের সমুদ্র শিখরে।

ঋণভারে অর্জ্জ্বরিত বেহিসারি'- কবি যখন শিলাইদহে ও শান্তিনিকেতনে কর্ম স্বজ্ঞের 'উদ্‌বোধন' করলেন সেই চরম 'হৃদিনে' 'ক্ষণিকা', এই কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী নারীই কবির কাব্যের ও কল্যাণকর্মের প্রেরণাদাত্রী। নিজের স্বথ হুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছ করে হুঃখ দৈন্তকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছিলেন তিনি। ঋণগ্রস্ত কবির সংসারের সমস্ত গুরুভার বহন কবেছিলেন একা। আর এভাবে কবিকে হুঃখ দৈন্ত থেকে মুক্ত করে রাখেন (ম'পুতে রবীন্দ্রনাথ)। 'কৃতার্থ' কবির 'কৃতজ্ঞ'তা নিজের কয়ছত্রে তো নিদারুণ বিধৃত।

তুমি আছ একা সজল নয়নে

দাঁড়িয়ে দুয়ার ধরি।

চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে

ভীত পাখি সম এলে মোর বুকে

আছে আছে বিধি এখনো অনেক

বয়েছে বাকি।

আমাবো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি

সকলি ফাঁকি।

এই 'কৃতার্থ' কবিতাটিই পরবর্তীকালে পূর্ববর্তীতে 'কৃতজ্ঞ' কপে স্থান পায়। আর তাতেও সেই সময়কার হুঃখ বেদনার কথা গাঁপা আছে।

এই শ্রামল বরণ (সজলনৌল-জলদ বরণ, কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীই কবির শেষ পূজারিণী নারী ও শেষ কাব্যলক্ষ্মী। এই নারীই তো কবির 'হৃদিনে' অকাল বসন্তের দ্বন্দ্ব বরণের মধ্যে একলা শুধুমাত্র 'এক আঁচি ধান নিয়ে' ঋণগ্রস্ত কবির কাব্যতরঙ্গীতে ধুলা পায়ে আসেন। কেননা কবির আহ্বান ছিল,

এসো এসো নায়ে!

ধুলা যদি থাকে কিছু

ধাক-না ধুল পায়ে।

তহু তোমার তরুলতা

চোখের কোণে চঞ্চল গা,

সজলনৌল-জলদ-বরণ

বসনখানি গায়ে।

তোমার তরে হবে গো ঠাই

এসো এসো নায়ে।

[এক তুমি, তোমার শুধু একটি আঁটি ধান - লক্ষ্মীর প্রতীক বা দূতী।  
গুহলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার ভাগ্যার (পশ্চিম-বাঁত্রীর-ভায়ায় ৭৭৬ পৃষ্ঠা)। 'বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর  
আঁসন টেলছিল। তিনি পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কোনো কোনো দূতীকে'—  
গুহলক্ষ্মী।]

কবির শেষ যৌবনে এষ্ট নারীর 'আবির্ভাব' কবির জীবনের ধারা ও  
কাব্যের ধারা পরিবর্তিত হল। কবি মহামানব রবীন্দ্রনাথের পরিণত হলেন।  
তাই 'আবির্ভাব' কবিতাটি কবির কাব্যে ও জীবনে যেন এক পরম সন্ধিক্ষেপে  
লিখিত হয়েছে। কবির প্রথম যৌবনে, শরৎকালের বাসন্তী রং এর আকাশে  
যে নারীকে আপন বর্ণ গন্ধ গান ও বসন্তের শরৎের রূপ নিয়ে দেখেছিলেন, সেই  
বসন্তের নারীকেই আবার যৌবনের শেষে সংসারের নানান অভিজ্ঞতার মধ্যে বর্ষার  
শ্রাম সমারোহে আবার এক মূর্তিতে দেখলেন। তখন দিনের একমাত্র সাথীরূপে,  
কলাগন্ধের প্রেবণাদাত্রী কলাগী নারীরূপে, এবং পূজারিণী বেশে। কবি  
যৌবনে যার ভরসাও অপেক্ষাও ছিলেন তিনি এলেন ভবা বরষায় অর্থাৎ  
যৌবনের শেষে—

আঁস নাই তুমি নক্ষত্রনে

ছিন্ন যবে তব ভবমাগ।

এসে এসো ভবা বরষায়।

এসো গো গগনে আঁসল লুটায়

এসো গো সকল স্বপন ছুটায়,

এ পবন ভদি যে গান নাজানে

সে গান তোমার করে সাধ

আজি হল ভবা বরষায়।

কবি 'আবির্ভাব' প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এক সময়ে প্রাণ মন ছিল ফাগুন মাসের  
জগৎ কড়ি ও কোমল, মানস'। তখন জীবনের কেন্দ্রস্থলে একটি রূপ দেখা  
দিয়েছিল আপন বর্ণ গন্ধ গান নিয়ে সে বসন্তের রূপ যৌবনের আবির্ভাব—তার  
আশা আকাঙ্ক্ষার একটি বিশেষ বাণী ছিল। তারপর জীবনের অভিজ্ঞতা  
প্রশস্ত হব হয়ে এল, তখন প্রথম যৌবনের বাসন্তী রং-এর আকাশে ঘনিষে এল  
বর্ষার সজল শ্রাম সমারোহ, জীবনে বাণীর বদল হল, বাণীর আর এক স্তর  
বীধিতে হবে সেদিন যাকে 'দেখছিলাম এক বেশে একভাবে আজ তাকে দেখছি  
আবার এক মূর্তিতে খুঁজে বেড়াচ্ছি তারই অতীর্ণার নূতন আয়োজন।'

কে জানিত যোবে এত দিবে লাজ ?

তোমার যোগ্য করি নাই সাজ,

বাসর-বরের দুয়ারে করালে,

পূজার অর্ঘ্য বিবচন.

এ কি রূপে দিলে দরশন ! '১০ আষাঢ় ১৩০৭।

এবার কবির কাব্যলক্ষ্মী পূজাবিণী বেশে দেখা দিল তাই ক্ষণিকার পরবর্তীকালের রচনা নৈবেদ্য, খেঁষা. উৎসর্গ. গীতাঞ্জলি. গীতালি গীতিমালা প্রভৃতি কবিতায় কবি পূজার অর্ঘ্যই বচনা কবলেন। এই পূজাবিণী নারী তাঁর শত পূজার ফুলের সাজি নিয়ে একলা এতদিন পরে কবির 'তুর্দিনে' ক্ষণিকা' অর্থাৎ শেষ যৌবনের বর্ষাতে এলেও কবি তাঁকে সাদবে অভ্যর্থনা কবে নিলেন—

যাহা আছে ল' প্রসন্ন কবে

ও সাজি তোমাব ভরে কি না ভবে -

ওই—যে আমার নামে বাবিশাব

বাবাব বরষণে।

কবির যখন যৌবন ছিল সেট মধুমাসে কখনো তাঁর গানেব অভাব ঘটে নি, কিন্তু এই শেষ যৌবনে যখন বর্ণ গন্ধ গান রিক্ত হসে এসে'ছ সেট রিক্ত যৌবনের দিনে এবং সাংসারিক দুর্ভোগের মধ্যে ঋণগ্রস্ত কবি যখন জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন, সেই সময় কবির জীবনে অমৃতরস নিয়ে এই নাবী এল—‘এত দিন পবে তুমি যে এসেছ/কী জানি কী ভাবি মনে।’ ক্ষণিকার ‘তুর্দিন’ কবিতাটির মধ্যে বক্তকরবা নাটকটির আভাস রয়েছে। তুর্দিন —কবির দুঃসম, বিস্তৃত জীবন ও বস্তৃত যৌবনের দিন গর্হিত -যাত্রীর—জায়গি (৫৪৭ পৃষ্ঠা)। কবির জীবনে এই নারী দেবীতে এলেও কবি তাঁকে কিছুক্ষণের জন্ত অপেক্ষা করতে বললেন এবং ধুলায় লুটি ৫ ছিন্ন মলিন ফুলগুলি যত্নে তুলে দিলেন। যদিও কবির শেষ যৌবনে কিছুই অশিষ্ট নাই তবুও যা ‘স্বল্প শেষ’ (ক্ষণিকা) আছে সেটুকু দিয়েই কবি তাঁকে একটি ছোট নূতন গান রচনা করে দিতে পারেন। তাই কবি এই ‘কল্যাণী’ নারীর বন্দনা করে সর্বশেষের শ্রেষ্ঠ-গানটি তাঁর উদ্দেশ্যে রেখে দিলেন,—

আমার কাব্যকুঞ্জবনে

কত অধীর সমীরণে

কত যে ফুল কত আঁকুল

মুকুল খসে পড়ে—

সৰ্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান

আছে তোমাৎতবে। (২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭, ১।

এই নাট্যীয় মৃত্যুৰ কাৰণে তাঁকে শ্রেষ্ঠ গানটি শোনাতে পাবলেন না, এই দুঃখই কবির সমস্ত কাব্যের মধ্যে ধ্বনিত হ'ছে অবিরাম—

বিরহের কালো গুহা ক্ষুধিতগহ্বর থেকে

ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত স্ববের বর্ণা রাত্রিদিন। (পত্রপুট ১২)।

আর, কবি যে কথা কখনো কোথাও বলেন নি, সেই না বলা কথা দিয়ে নূতন বীণায় তাব বৈধে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে নূতন গান 'নিবেদন' করলেন—

যে-বাণী আমার কখনো কায়ে

হয় নি বলা

তাই দিয়ে গানে বচিব নূতন

নৃত্য কলা। (মন্তব্য ২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৫।

**মৃত্যুর শেষ অভিজ্ঞতা**—(কল্যাণরূপ স্মরণ ১৩ সংখ্যক, আরোগ্য বার সংখ্যক, বয়স ৪১)

ভদ্রাশ্রমে, 'আবো কিছু আছে নাকি,

আছে বাকি

শেষ বজ্রপাত ?'

নামিল আঘাত।

এই মাত্র ? আর কিছু নয় ?

ভেঙে গেল ভয়।

কবির শেষ যৌবনে পর পর মৃত্যু এসে তাঁর জীবনকে কত বিকৃত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিল। তখন সেই দুঃখের আঘাত কবি অসীম ধৈর্য সহকারে হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে কল্যাণ কর্মের দিকে মনকে নিয়োজিত করলেন (আরোগ্য বার সংখ্যক, শেষ সপ্তক দশ)। কবি ধীর স্থির ভাবে শেষ যৌবনে যে মৃত্যু-দুঃখ বহন করেছিলেন, সেই মৃত্যু কবির জীবনে কল্যাণের রূপ ধবে দেখা দিল—'সেদিন অশ্রু-ধোত সৌম্য বিষাদের (শাস্ত বিবাদ) দীক্ষা পেলে তুমি' (শেষ সপ্তক আটত্রিশ)। কবির জীবনে দুই নারীর মৃত্যু দুই রূপে দেখা দিল। প্রথম যৌবনের মৃত্যু কবিকে

উদ্ভাস্ত ও দিশাহারা করে দিয়ে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল (জীবনমৃত্তি)। শেষ যৌবনের মৃত্যু তাঁর সমস্ত শক্তিকে সংহত করে কর্ম যজ্ঞের দিকে টেনে নিয়ে গেল। চিঠিপত্র দশম খণ্ডে ১১ পরিচ্ছেদ, স্মরণ ১৩ সংখ্যক, পথে ও পথের প্রান্তে ১৮ সংখ্যক। এই দুই মৃত্যুর অভিজ্ঞতার প্রভাব তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে রয়েছে।

মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুশোকের কথা কবি কখনো কোথাও বলেন নি বা লেখেন নি। সেই শোকের আঘাত তিনি আজীবন নিঃশব্দে বয়ে বেড়িয়েছেন। প্রকাশ্যভাবে তাঁকে কোন কাব্যগ্রন্থে উৎসর্গ করেন নি। কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে ‘উপহার’ দিয়েছেন মানসী কাব্য গ্রন্থখানি (মানসী-উপহার)। আর তাঁর উদ্দেশ্য আলাদাভাবে লিখে গেছেন ‘স্মরণ’ (In memoriam) এবং উৎসর্গের বহু কবিতা যা মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর কয়েকমাস পরে লিখিত হয়েছে। কবি শোকের কথা প্রকাশ করেছেন কবিতার মাধ্যমেই যে কবিতা কবির আজন্ম প্রেয়সী এবং কবির জীবনের ‘সমস্ত গভীর সত্যের আশ্রয় স্থান।’ তাই স্মরণের প্রতিটি কবিতাই অত্যন্ত মূল্যবান কারণ তাঁর শোকের কথা শুধু স্মরণেই প্রকাশ করেছেন আর অল্প কোথাও প্রকাশ করেন নি। এমন কি মৃত্যুজনিত আবেগপ্রবণতার জন্ম কবি আত্মচরিত পৰ্যন্ত প্রকাশ করতে পারেন নি। মংপুতে আত্মজীবনী প্রকাশ করা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—‘সে হয় না, সে হয় না। যে পর্যন্ত হয়, সে পর্যন্ত ছবি মাত্র, সে পর্যন্ত ত লিখেছি, কিন্তু যখন সত্যিকারের জীবন সূরু হল সে আর লেখা যায় না। লিখতে গেলে আবার সেই Experience-এর মধ্যে চিন্তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়, --সে বড় বেদনা। আর দেখো ঐ ভায়ারি, সে আমার দ্বারা কোনো কালে লেখা হল না, Emotion-এর একটা গোপনীয়তা আছে, তা হাটের মাঝখানে প্রকাশ্য নয়।’ কবির জীবনে এই মৃত্যুই সবচেয়ে কঠিনতম আঘাত (শেষ বজ্রপাত—মৃত্যুঞ্জয়, পরিশেষ) যা কবি আজীবন নিঃশব্দে বয়ে বেড়িয়েছেন—‘মৃত্যু আছে যে মৃত্যু—সে যে হঠাৎ আসে, তখন জীবন বৃন্তান্ত যেমন করে শোনাতে চাও না তেমন করেই লোকে শোনে’ (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ২০২ পৃষ্ঠা)। এই মৃত্যুজনিত আঘাতের জন্মই কবির উৎসর্গপত্রের বিরলতা দেখা দেয়, এমন কি কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ‘গীতাঞ্জলি’ও উৎসর্গপত্র বিহীন। এবং পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদেও উদাসীন ছিলেন তিনি। ক্ষণিকার পরবর্তী অধ্যায়ে কবির ‘শ্রেষ্ঠ গানটি’ শোনাতে পারলেন না বলে মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর চার মাস পরে উৎসর্গ ৪০ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—



কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো—

সে গান শুধু তব সে নহে আর কারো—

তুমিও গেলে চলে সময় হল তাবো

ফুটল তব পূজা তরে । (১০ চৈত্র ১৩০২) ।

এই শেষ যৌবনের মৃত্যুতে তাঁর বেশভূষা একেবারেই পাল্টে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলেন । প্রথম যৌবনের লেখা কড়িও কোমল কাব্যগ্রন্থে যেমন মৃত্যুশোকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কবির বসন্ত (শরৎকাল, ফাগুন মাস) তেমনি শেষ যৌবনের লেখা ‘স্মরণ’ কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মৃত্যুশোকের সঙ্গে মঙ্গল কর্ম । ‘কড়ি ও কোমল’ যেমন নূতন অব্যাহার সূচনা, ‘স্মরণ’ তেমনি শেষ অব্যাহার সূচনা । তাই কবির জীবনে স্মরণ কবিতাটির মূল্য অপরিমিত কারণ ‘স্মরণ’ পবেই তিনি রূপ থেকে অরূপে গিয়ে পৌঁছলেন । ভাব থেকে রূপে এবং রূপ থেকে একরূপে—অর্থাৎ ভাব কল্পনাব মানসী থেকে পূজাবিণী নারী রূপে ক্ষণিকা, এবং ক্ষণিকা থেকে অশরীরী নারী রূপে অধরা (অরূপ) । এই মৃত্যুর ভিতর দিয়েই কবি প্রেমকে এবং অসীমকে প্রত্যক্ষ করলেন—

সহমরণের বধু

বুঝি এমনি কবেই দেখতে পায়

মৃত্যুর চিরদর্শন ভিতর দিয়ে

নূতন চোখে

চির জীবনের অগ্নির স্বরূপ ।

এই কল্যাণী নারীর প্রেমের স্মৃতিই কবির পবিত্রীকালব জীবনকে ও কাব্যকে প্রভাবান্বিত করেছিল (চিঠিপত্র ১০ম খণ্ড একাদশ পরিচ্ছেদ), এবং ক্রমে কবির এই প্রেমই বিধি প্রেমে পবিত্র হযে অসীমের দিকে প্রসারিত ।

**শ্যামলী (রূপ ও চরিত্র) । ম্যাটির শ্যামল অঙ্কন ।**

কবি সঙ্কোচের জগুই ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতে পারেন নি । শেষ সপ্তক ছাব্বিশ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

মন অনায়াসে মাথা তুলে বলতে পারে না—

“ভালোবাসি”

সংকোচ লাগে কণ্ঠের রূপগতায় ।

পূর্ববীর ‘চাবি’ কবিতায় লিখেছেন—

সেখানে লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে,

মধ্যাহ্নে করণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ডাকে ।

আবার মংপুতে বলেছেন—Emotion এর গোপনীয়তা আছে (১২৫ পৃষ্ঠা)। তাই কবি অশরীরী শ্রামলী নারীমূর্তিকে কবিতার মধ্যে সবচেয়ে গোপন করে রেখেছেন, যার কথা কবি কখনো কোথাও বলেন নি, অথচ বহু কবিতাই কবি এই নারীর উদ্দেশে লিখেছেন। কবিব কবিতাগুলির মধ্যে যে অশরীরী নারীমূর্তি কবির কাব্যে অপরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, তার ভাব মূর্তি এবং চরিত্রের পরিচয় তাঁর কাব্যগ্রন্থে মাধ্যমেই পাওয়া যায়, বিশেষ করে ‘শ্রামলী’ (বিচিঞ্জিতা) ও ‘শ্রামলী’ কবিতায়। ‘শ্রামলী’ কাব্যগ্রন্থে ‘দেহত’ কবিতায় আছে—

আমি তোমার কাবিগরেব দোসর,

কথা ছিল তোমার রূপের’ পরে মনের তুলি

আমিও দেব বলিয়ে,

পুরিয়ে তুলব তোমার গডনটিকে।

অর্থাৎ কবি এই স্বল্প ভাষা (মোন ভাষা-মানসী, নারীকে অল্পবয়সের ধারা দিয়ে নিজেই সৃষ্টি করেছেন ‘মানসী’ রূপে। এই নারীর রূপ তিনি ভাব ও কল্পনা দিয়ে রসের তুলিতে এঁকেছেন। এই কারণে এই নারীর সান্নিধ্য তাঁর অল্পভবেব মধ্যেই ছিল। কবি প্রিয়া—উর্মিলা দাস ৪৬ পৃষ্ঠা, ববীন্দ্রনাথের পবলোক চর্চা—অমিতাভ চৌধুরী)।

**শ্রামলী**—এই নারীর রং শ্রামলী—‘তাতে আছে যেন এই মাটির শ্রামল অঙ্গন’ তত্ত্বদেহ, শান্ত অথব (পুরুষের উক্তি), মৃত্ত সবল কালো হরিণ চোখ (যুবোপ—যাত্রীর ডায়ারি ৪০২ পৃষ্ঠা, কৃষ্ণকলি, ক্ষতিপূরণ—ক্ষণিকা), ভীরা সঙ্কুচিতা (পঞ্চমী—আকাশ প্রদীপ, ক্ষণিকা—পূরবী), ধীর, স্থির, গভীর (চিত্রা—চিত্রা, শ্রামলী—বিচিঞ্জিতা), স্বল্পভাষা (মোনভাষা—মানসী) অভিমানী (যুবোপ যাত্রীর ডায়ারি, পুরুষের উক্তি—মানসী, অদেয়—মানসী, কবি প্রিয়া—উর্মিলা দেবী) বেদের মেয়ের মতো বাসা ভাঙে বায়ে বায়ে, যিনি নিঃশেষে গরীব এবং গাঁঠিছড়ার বাঁধন দেন না (অধিকার দাবি করেন না—স্মরণ ১২ সংখ্যক, শ্রামলী—শ্রামলী), ‘ভালো’ (বাঁশিওয়ালা—শ্রামলী, মুক্তি-পলাতকা, চিষ্টপত্র—১ম খণ্ড), কবির অচেনা (ক্ষণিক মিলন—কড়ি ও কোমল, ক্ষণিকা, বিচিঞ্জিতা, ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক, পত্রপুট ১৫ সংখ্যক), আবেগহীন ও সনাতনী (চিরকালিনী) কল্যাণী বাংলা দেশের মেয়ে—

আমাদের কত ক্রটি আসনে ও শয়নে,

কমা ছিল চিরদিন তাহাদের নয়নে।

প্রেমদীপ জ্বলছিল গুণের আলোকে  
 মধুর করেছে তারা যত কিছু ভালোকে ।  
 নানা রূপ ভোগ সুখা যা করেছে বরষণ  
 তারে স্মৃতি করেছিল স্বকুমার পরশন ।

‘প্রেম অনেক সহ করে, অনেক ক্ষমা করে আঘাতকে গ্রহণ করিয়াই সে আপনার মহত্ব প্রকাশ করে’ (আত্মপরিচয়, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি, শেষ সপ্তক এক, স্মরণ দুই সংখ্যক) । এই রূপটিই কবির কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়, যাকে কবি মলিন বেশে ‘প্রচ্ছন্ন’ করে রেখেছেন । ইনিই কবির-অস্তব বাসিনী বা ভূতল, ধীর অভিমানের জগুই কবি আত্মচরিত লেখেন নি—

আধার করে আছে আমার সমস্ত জগৎ,  
 পাই নে খুঁজে সার্থকতার পথ । (অদেয়—সানাই) ।

অথবা

মৃত্যুর গ্রহি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে  
 বে উদ্ধার কার জীবনকে  
 সেই রক্ত মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত  
 কীণ পাণ্ডুর আমি

অপরিষ্কৃততার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছ চলে ।

**শরৎ পর্যায়ের প্রথম পর্বের কাব্যগ্রন্থ**

**কড়ি ও কোমল (কবি রবীন্দ্রনাথ) ।**

নবযৌবনের নববসন্ত

কাদম্বরী দেবীর মর্যাস্তিক মৃত্যুর পর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে রয়েছে কবির নবযৌবনের নববসন্তের গান । একদিকে মৃত্যুশোক অন্তরিকে যৌবনের রসোচ্ছ্বাস এই দুই ধারার কবিতা কড়ি ও কোমলের মধ্যে পাওয়া যায় । তাই কড়ি ও কোমলেব প্রথম দিকের কবিতাগুলিতে দুই বিপরীতধর্মী কবিতা দেখা যায়, জীবন ও মৃত্যু নূতন ও পুরাতন, আনন্দ ও বিষাদের কবিতা । পরবর্তীকালে যখনই এই সময়কার কথা কবি কবিতায় প্রকাশ করেছেন তখনই লিখেছেন—  
 বিচ্ছেদে-মিলনে<sup>১২</sup>, দুঃখে-সুখে<sup>১৩</sup>, আনন্দ ও বিষাদে<sup>১৪</sup>, জীবনমৃত্যুর  
 হরণেপূরণে<sup>১৫</sup> ও বিরহানন্দ<sup>১৬</sup> এই বিপরীত দুটি শব্দ এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে ধরা  
 দিল ধ্বংস ও সৃষ্টি, ভীষণ ও মধুর রূপে আর নারীর মধ্যে দেখা দিল উদ্ভাস্ত ও  
 কল্যাণ রূপ ।

কড়ি ও কোমলের প্রথম কবিতা ‘প্রাণ’। প্রাণ—জীবন, মন ক্রিয়াময় বাহু। স্বভাবতঃ মন নির্মল আলোকময় ও অমিশ্র। স্বচ্ছ জল যেমন বিভিন্ন বর্ণের সংমিশ্রণে বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয় সেরূপ নির্মল মন ও বিভিন্ন বাহ্যিক উপসর্গের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। মন যখন দুঃখের সমুদ্রে নিমগ্ন হয় তখনই সে চেষ্টা করে কি ভাবে সে দুঃখের অতিক্রম করে আনন্দে প্রেমে অমৃত পৌঁছাবে। কবি যখন দুঃখের সমুদ্রে নিমগ্ন হলেন তখনই তিনি উপলব্ধি কবলেন, ‘সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভাব জীবনমৃত্যুর হরণেপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চাষিদেরকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে সে-ভাব বন্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না, একেবারে জীবনের দৌবাওয়া কাহাকেও বহন করিতে হইবে না, এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উল্লিখিত কবিতা ছিলাম।’ তাই ‘কড়ি ও কোমলে’ লিখেছেন—

সে কি চায় শুধু বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে

আগে তাবা গাহিত যেমন ?

অ’গেকাব মতো করে স্নেহে তাব নাম ধরে

উচ্ছ্বসিবে বসন্ত পবন ?

নহে নহে সে কি হয় ! সংসার জীবনময়

নাহি হেথা মরণের স্থান ।

আয়বে নূতন, অ’গ, সঙ্গ কবে নিয়ে আয়,

তোব স্মৃতি, তোব হাসি গান ।

ফোঁটা নব ফুলসয়, ঠোঁট নব কিশলয়,

নবীন বসন্ত আ নিয় ।

এই হচ্ছে প্রাণের ধর্ম দুঃখের মধ্যেও সে ভা লাভাসাবে অ নষ্টন করে বীজ ত চায় । তাই কবি নবযৌবন নববয়সসম্পন্ন প্রাপ্তে ‘মরিতে চাহি না আমি স্তম্ভব ভুবনে’ এই পংক্তিটি লিখে এই কাব্যগ্রন্থের এ’ং জীবনের গতি পরিবর্তন করে নূতন অধ্যায়ের সূচনা কবলেন । ‘প্রাণ’ কবিতার পরেই রয়েছে ‘পুন্ডরীক’ ও ‘নূতন’ কবিতা দুটি । ‘নূতন’ তাঁর ভালোবাসা দিয়ে কবিকে জীবনমৃত্যুর ভিতর দিয়ে অনন্তের পূজার সন্ধিবে নিয়ে গিয়ে কবিকে প্রথম মৃত্যুদুঃখ থেকে উদ্ধার করিয়ে দেয় । তাই কবি উদাও কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন ‘মরিতে চাহি না আমি স্তম্ভব ভুবনে’ এবং নূতন কবিতার লিখলেন—

আনে হাসি, আনে গান, আনে রে নূতন প্রাণ,  
 সঙ্গ করে আনে দিবাকর,  
 অশোক শিশুর প্রায় এত হাসে এত গায়  
 কাঁদিতে দেয় না অবসর।

প্রথম যৌবনের লেখা ‘প্রাণ’ এবং শেষ যৌবনের লেখা ‘উদ্‌বোধন’ এই দুটি কবিতাই কবির জীবনে ও কাব্যে বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে। ‘প্রাণ’ দিয়ে কবি নবযৌবনকে ও নববসন্তকে আহ্বান করলেন, প্রেম দিয়ে আহ্বান করলেন শেষ যৌবনের অকালবসন্তের পূজারিণীকে। আর তারই সঙ্গে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে শিলাইদহে কর্মযজ্ঞের ‘উদ্‌বোধন’ করেন। নবযৌবনে এই নারীর আগমন তাঁর জীবনের ধারা ও কাব্যের ধারাকে আমূল বদলে দিয়ে যায়। ‘কড়ি ও কোমলে’ই কবির আদিরসাত্মক কবিতার সূত্রপাত। যা’ কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে লিখিত হয়েছে। ‘কড়ি ও কোমলে’র শেষ পর্বে ১৮৮৬ সালের শেষের দিকে কবির অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। কবি-মনের প্রথম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় ‘কেন’ এবং ‘মোহ’ কবিতায় যা পরবর্তীকালে মানসীতে ‘ভুল-ভাঙা’ কবিতায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। কবি মোহ কবিতায় নিজেকে বিশ্লেষণ করেছেন—

কেহ করে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।

ফুল ফোটা সাক্ষ হলে গায়ে না পাখিতে।

আবার মানসীর ‘ভুল-ভাঙা’ কবিতায় লিখেছেন,

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিছু ঘেঁই

থামিল বাঁশি—

এখন কেবল চরণে শিকল

কঠিন ফাঁসি।

এই কবিতা দুটিতে কবির মনের ভাব ভালোভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কবি ‘ভুলে’ (মানসী) যে ‘মোহে’র (দেহের—কড়ি ও কোমল) আর্ষতে পড়েছিলেন, মানসীতে সেই ‘ভুল ভেঙে’ গেল (ভুলভাঙা—মানসী)। আবার ‘পবিত্র প্রেম’ ও ‘পবিত্র জীবনে’ কবি যাকে ভালোবেসেছিলেন তাঁকে কামনা বাসনা মূক্ত ‘পবিত্র প্রেম’ দিয়ে পূজা করে ‘পবিত্র জীবন’ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন কারণ—

এ নহে খেলার খন, যৌবনের আশা—

বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী ;

নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,  
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিয়ো না টানি ।  
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল-আশ্বাস,  
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি ।

এই কবিতা দুটি (পবিত্র প্রেম, পবিত্র জীবন) সম্মিলিত ভাব যেমন কবির মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়েছিল মানসীতে, তেমনি আবার ‘পবিত্র প্রেম’ ও ‘পবিত্র জীবনে’র পরিণতি হিসাবে ‘ধ্যান’ কবিতার জন্ম বা স্বদূর ভবিষ্যতে—

মহাসমুদ্রের বিরাট ইচ্ছিত-বাহিনী ।

মহীয়সী নারী স্থান করে উঠেছে

তারই অতল থেকে ।

সে এসেছে অপরিমীম ধ্যানরূপে

আমার সর্ব দেহে মনে,

পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে ।

জেনে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে

চিরবিরহের প্রদীপশিখা ।

কড়ি ও কোমলের ‘পবিত্র প্রেম’ ও ‘পবিত্র জীবনে’র শেষ পরিণতি শেষ লেখা দুই, সাত, জয়দিন (সেঁজুতি-৫৫০ পৃষ্ঠা), প্রাস্তিক সাত সংখ্যক কবিতাগুলির মধ্যে ধৃত ।

**মানসী (শিল্পী রবীন্দ্রনাথ) ১৮৮৮-৯০**

পড়েছে তোমার পরে’ প্রদীপ্ত বাসনা,

অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা ।

মানসী-চৈতালি ।

**সূচনা**—মানসীর সূচনা করলেন কবি-কল্পনার রোম্যান্টিক শহর গাজীপুরে ১৮৮৮ সালে (আত্মপরিচয় ২১০ পৃষ্ঠা, মানসী কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা) ।

**সমাপ্তি**—যুরোপ-বাজীর ডায়ারী ২৮ অক্টোবর ১৮৯০ সালে, মানসী কাব্যগ্রন্থের ‘আমার স্বপ্ন’ কবিতায় ।

**উৎপত্তি**—ধ্বনির জগতে—বিরহ ও আনন্দ ধ্বনি ।

**ভৌগোলিক অবস্থান**—মানসীর বহু কবিতা কবি-কল্পনার রোম্যান্টিক শহর গাজীপুরে ১৮৮৮ সালে রচনা করেন । কবি গাজীপুরে বুদ্ধ মহানিষ

গাভের তলায় বসে ইদারার জলে বাগান সেচ দেবার করুণ ধ্বনি শুনতে শুনতে অদূর গঙ্গার শ্রোতে কল্পনাকে অহৈতুক বেদনার বোঝাই করে দূরে ভাসিয়ে দিয়ে কবি রচনা করেছেন মানসী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি (আত্মপরিচয় ২:০ পৃষ্ঠা)। তাই পরবর্তীকালে গঙ্গায় গুণটানা নোকা, গোলক চাঁপার ঘন পল্লব থেকে বোজ-তপ্ত গ্রহের ভেসে আসা কোকিলের-ডাক, প্রাচীন মহানিম গাছ, পিতল-কাঁকন পরা ভজিয়ার ষাঁতা ভাণ্ডার শব্দ এবং ইদারার জলে বাগান সেচ দেবার করুণ ধ্বনি কবির প্রথম যৌবনের গাজীপুরের 'স্মৃতি' (পুনশ্চ)। গাজীপুর ছাড়া তিনি কবিতা রচনা করেছেন পার্ক ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, শান্তিনিকেতন, সোলাপুর, থিরকি, লণ্ডন ও রেড সাীতে (Red Sea-সু-রাপ-যাজীর ডায়াবী)।

**উৎপত্তি**—রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন অমৃতভূতিপ্রবন সংবেদনশীল ও রসলোলুপ মনের জন্ম পৃথিবীর রূপ রস বর্ণ গন্ধ স্পর্শ<sup>১৭</sup> ও ধ্বনি সবই তাঁর মনোজগতে ধরা পড়ে। কবির স্বপ্ন তাবে বাধা মন অচেনা জগতের ভাষাহীন নানান ধ্বনির আঘাত, কবির হৃদয়কে দোলা দিয়ে বুদ্ধির অগম্য অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে যায় এবং জনপূর্ণ জীবনের যে আবেগ, নানা ভাণ্ডে পৃথিবীতে প্রতিদিন যা বয়ে চলেছে সেই তর, ধ্বনি রূপে তাঁর চেতনাকে জাগ্রত করে সৃষ্টির আদিম ভূমিকায় নিয়ে গেছে।

**মানসী কাব্যগ্রন্থ**—এই ধ্বনির জগতেই মানসী কাব্যগ্রন্থখানি সৃষ্টি। কবির অতীত সংসারের বিচিত্র কলবোলের আনন্দ ধ্বনিব মিলিত উচ্ছ্বাস এবং বাইবে বাগান সেচ দেবার করুণ ধ্বনির বিরহী ভাবনা, এই দুই এর বাণকুল লনের স্তম্ভোচ্ছ্বাসই মানসী (মুক্তিমতী মর্মের কামনা) কাব্যগ্রন্থের মর্মকথা। কবির নিভৃত চিত্ত জগতের এই দুই বিচিত্র তরঙ্গ ধ্বনির মিলিত আঘাত (বিরহানন্দ, ধ্বনিরূপ কবির হৃদয়ে যা ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠেছিল, সেই মিলিত স্তম্ভোচ্ছ্বাস দিয়ে কবি অসীমের সীমাকে, আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে সৃষ্টি করলেন মানসী প্রতিমার মধ্যে। তাই পরবর্তীকালে সৃষ্টি যুগের প্রথম লগ্নের এই দিনটির স্বরণে শেষ সপ্তক ছাব্বিশ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

সৃষ্টি যুগের প্রথম লগ্নে

প্রাণ সমুদ্রের মহাপ্রাবনে

তবঙ্গে তরঙ্গে ডুবেছিল এই মস্ত-বচন।

এই বাণীই দিনে দিনে রচনা কবেছে

স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা।

## আমার বিরহ-গগণে

অন্ত সাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে ।

১২৩-বচন-ভালোবাসা । স্রষ্টা যুগের প্রথম লগ্নে—শিল্পী কবির প্রথম স্রষ্টা মানসী বচনা কালে ।

## শিল্পী ও স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ—

মানসী কাব্যগ্রন্থেব কবিতাগুলিতে এই প্রথম নানা রকম ছন্দেব প্রকাশ হতে লাগল, এবং কবি ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেন একজন শিল্পী ও স্রষ্টা এস যোগ দিল। এবাব শিল্পী ও স্রষ্টা কবি অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে (সংশয়ের আশংকা) ভাব দিয়ে রূপ দিয়ে অন্তর্ভাবের ধাবা দিয়ে গড়ে তুললেন মানসী প্রতিমা । এবং কবি নিঃসন্দেহ যে তাঁর নির্মান সম্পূর্ণ হয় নি বাকী থেকে গেছে অনেক কিছুই । তাই প্রমথ চৌধুরীকে লেখে—‘আমি ভালোবাসি অনেককেই কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া কবেছি সে মানসেই আছে—সে Artist এবং হাতেবচিত ঈশ্বরবৎ অসম্পূর্ণ প্রতিমা, ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি ?’ কবি-ভালোবাসেন অনেককেই—অর্থাৎ কবির ভালো লাগে অনেককেই । ভালো লাগা—পশ্চিম-যাত্রীব ডায়াবী ৫৭৭ পৃষ্ঠা, কিন্তু অনেকের মধ্যে কবি যাকে ভালোবাসেন তাঁকে মানসীতে খাড়া কবেছেন, সে Artist এর হাতে বচিত কবিই প্রথম অর্ধ মানসী ও অর্ধ কল্পনার অসম্পূর্ণ প্রতিমা । ক্রমে তা পূজাবিণী নারীৰূপে ক্ষণিকাতে সম্পূর্ণ হয় (আবির্ভাব ১৩০৭ শিলাইদহ) । প্রমথ চৌধুরীকে মানসী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—‘ওর আসল সত্যকথাটুকু হচ্ছে এই যে মানুষ কি চায় তা কিছু, জানে না এক ঘটি জল চায় কি আধ খানা বেল চায় জিজ্ঞাসা কবলে বলতে পারে না,—আমি এমন অবস্থায় মনেব সঙ্গে আপোষে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াফল পাড়বার চেষ্টা করছি ।’ কবি আবও লিখেছেন, ‘আমি দেখতে পাচ্ছি নিজের বচনা ও নিজের মন সম্বন্ধে সমালোচনা কবা ভাবি কঠিন । আমার চরিত্রের কোনখানে সেই কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে গিয়ে আমার সমস্তটা একটি মানে পাওয়া যায় । কড়ি ও কোমলের সমালোচনায় আন্তরিক বলেছিলেন জীবনের প্রতি দৃঢ় আশ্রিত্তিই আমার কবিত্বের মূল মন্ত্র, তখন হঠাৎ একবার মনে হয়েছিল হতেও পারে তাতে কবে পরিষ্কৃত হয় বটে । কিন্তু এখন আর মনে হয় না এখন এক এক বার মনে হয় আমার মধ্যে বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে ।’ অর্থাৎ যিনি কবির মানসেই ছিলেন সেই প্রথম ছোটো যৌবনের অচেনা নারীকে (ক্ষণিক মিলন) স্রষ্টা করলেন অসম্পূর্ণ মানসী রূপে । এই অসম্পূর্ণ মানসীকে ঘিরেই কবির অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত—



হুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,

বুঝাতে না রে আপনায় ।

হুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা

কাতরে কহে—কাছে আয় !’ (নর-নারী) ।

কবি এই অচেনা, অপরিচিত, শাস্ত ও আবেগহীন নারীকে বুঝতে পারতেন না বলেই নিজের মনের সঙ্গে আপোষে বোঝাপড়া করে কল্পনার কল্পবৃক্ষের মায়াবল পাড়বার চেষ্টা করেছেন ।

কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলিতে কবি নিজের প্রবল আশক্তির কথাই কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মানসীতে কবির মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব (অন্তর্দ্বন্দ্ব-সংশয়ের আবেগ) চলছে । একদিকে রয়েছে কবির ভালো-বাসা সশব্দে সংশয়—

ভালোবাস কি না বাস বুঝিতে পারি নে,

তাই কাছে থাকি ।

আবার অন্য দিকে নিজে ক কামনা বাসনা থেকে মুক্ত কয়বার চেষ্টা—

সৌন্দর্য সম্পাদ-মাঝে বসি

কে জানিত কাঁদিয়ে বাসনা ।

‘ভক্ষা ভিক্ষা সব ঠাঁই তবে আর কোথা যাই

ভিখারিণী হল যদি কমল-আসনা ।

কবির এই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব (অন্তর্দ্বন্দ্ব) মানসীর কবিতার মধ্যে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে । কবি নিজেও সেই কথা প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন । অর্থাৎ মানসীতে কবির নিজের মনই নিজের কাছে হুর্বোধ্য হয়ে উঠল । কবির এই মনের পরিবর্তন ‘পুরুষের উজ্জ্বল’ই ভালভাবে প্রকাশ পেয়েছে । কবিতার প্রথমার্শে আছে ‘কড়ি ও কোমল’-এ বর্ণ গন্ধ গানময় বসন্ত ও কবির রহস্যময় যৌবনের প্রথম রসোচ্ছ্বাসের কাহিনী ।

অজানিত সকলি নতুন,

অবশ চরণ টলমল !

কোথা পথ কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,

কোথা হতে উঠে হাসি কোথা অশ্রুজল !

আর শেষার্শে আছে অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী ।

ফেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে,

বহিলে না ধান-ধারণার।

সেই মায়া-উপবন কোথা হল অদর্শন,

কেন হাস ঝাঁপ দিতে শুকালো পাখাঘ।

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়—

প্রবেশিয়া দেখিছু সেখানে

এই দিবা এই নিশা এই ক্ষুধা এই তৃষা,

প্রাণপাখি কাদে এই বাসনাব টানে।

কবির এই মনোভাবের জন্তই (অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্ত) এই নারীর অভিমান ছিল প্রবল।

কেন হেবি অশ্রুজল হৃদয়ের হলাহল

রূপ কেন বাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে।

কবি-মনের ভালোবাসা সম্বন্ধে এই-দ্বিগা-দ্বন্দ্বের চিত্তই মানসীর কবিতাগুলিতে ধৃত। কবি প্রেমকে মিথ্যা রূপের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারলেন না, তাই ‘নিষ্ফল প্রয়াসে’ সেই কথাই ব্যক্ত কবলেন—

রূপ নাহি ধবা দেয় বুঝা সে প্রয়াস।’

আবার ‘হৃদয়েব ধন’কে দেহেব মধ্যেও খুঁজে পেলেন না।

নাই, নাই, কিছু নাই শুণ্য অন্বেষণ—

নৌলিমা লইতে চাই অাকাশ ছাঁকিয়া।

কাছে গেলে রূপ কোথা কবে পলায়ন,

দেহ শুণ্য হাটু আসে— শ্রাস্ত কবে হিয়া।

প্রভাতে মলিন মুখে কি-ব যাউ গেহে,

হৃদয়েব ধন কভু ধবা যাগ দেহে ?

কবি প্রেমের স্বরূপকে নানাভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা কবেছেন। কিন্তু হৃদয়ের এই পবন ধনকে তিনি কোথাও খুঁজে পেলেন না। কবি শৈশবে প্রেমকে প্রকৃতির মধ্যে, মানবীর মধ্যে খুঁজে বেড়িয়েছেন, যৌবনে প্রেমকে রূপের মধ্যে ও দেহের মধ্যে খুঁজে বেড়ালেন। অবশেষে প্রেমের স্বরূপকে রূপ ও দেহেব মধ্যে খুঁজে না পেয়ে ধ্যানের মাধ্যমে উপলব্ধি কববার চেষ্টা এই কাব্যংশে স্পষ্ট—

সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে

অল্পম জ্যোতির্ময়ী মাদুরীমুখতি

স্থাপনা করিব যত্নে হৃদয়-আসনে। (নিতৃত আশ্রম)।

এই দুই বিপরীত ভাবের মধ্য দিয়ে ‘খান’ কবিতার জন্ম, যা’ পরবর্তীকালে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খ্যানের মাধ্যমে মহীয়সী নারী ‘খানোন্তবা প্রিয়া’ অধরার জন্ম দেয়। আর কবি তাকে উৎসর্গ করে দেন বিশ্বের কাছে –

জানি না তোমার নাম,

তোমায়েই সঁপিলাম

আমার খ্যানের ধন খানি ॥ (মহুয়া)।

মানসীতেই প্রথম ‘বধূ’ কবিতাটি লিখিত হয়েছে। শৈশবে কবিতাকে তিনি ‘কবিতা কল্পনালতা’! অথবা ‘মোহিনী কল্পনে’! বলে সম্বোধন করেছেন। আবার কবির যৌবন সমাগমেই দক্ষ কবিতা ‘বধূ’ রূপে সম্বোধিত হয়, আর কবি সঙ্ক্যাসংগীতে ‘গান আরম্ভ’ করলেন কবিতা রূপিণী বধূকে নিয়ে। কিন্তু নব যৌবনে বধুর আগমনে এই প্রথম মানসীতে ‘বধূ’ শিরোনামায় গ্রাম্য বালিকা ‘বধূ’র কাহিনী রচিত। তারপর সতেরো বৎসর পরে ক্ষণিকার পরবর্তীকালে খেয়াতে পুনরায় ‘অতীতের দুঃখদিনের ঝড়ের’ কথা লিখে ‘বালিকা বধূ’র কথা ব্যক্ত করেছেন। মানসীর ‘বধূ’ কবিতাটি এই পরিবর্তিত রূপ ‘বধূ’ (আকাশ প্রদীপ) ‘বালিকা বধূ’, ‘বব-বধূ’ প্রভৃতি কবিতাগুলিতে।

মানসীর শেষ পর্বে যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারীতে কবি-মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হতে গেল। কবির ভালোবাসার ধারাটি বৃদ্ধ হয়ে ভালোলাগার ধারা প্রকাশ পেল (আমার স্মৃতি, ছিন্নপত্র ৮ সংখ্যক)। মানসী কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা ‘আমার স্মৃতি’ কবিতায় কবি-মনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং সোনার তরীর পূর্বাভাসও এই কবিতাটির মধ্যে রয়েছে। মানসী কাব্যগ্রন্থের শেষ পাঁচটি কবিতা যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারীতে সমুদ্রের উপর লিখেছেন এবং ক্ষণিকার স্মৃতিপাতও যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে ২৬, ২৭, ২৮ আগষ্ট ৮২০ সালে। ক্ষণিকার স্মৃতি কবিতা করেই কবির ভালোবাসার ধারাটি বৃদ্ধ হয়ে গেল (২২ অক্টোবর ১৮২০)। কবি অন্তর্জ্বলনের মধ্যে যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে মানসীর উদ্দেশে স্বগতোক্তি করলেন— ‘তুমি দৈবক্রমে আমার কাছে এসে পড়েছ, এসো—তুমি আমার ভালোবাসা চাও না, যাও, আপন পথে যাও—জিজ্ঞাসা করবার সময় নেই—বিলাপ করবার অবসর নেই—স্মৃতি দুঃখ হিসাব করবার আবশ্যক নেই। যা পাব না প্রসন্নচিত্তে তার মঙ্গল কামনা করে তার কাছে থেকে বিদায় নেওয়া বাকী’। কবির এই সিদ্ধান্তের ৬ দিন পরে ‘আমার স্মৃতি’ কবিতাটি লিখে তাঁর মনের ব্যথার কথা প্রকাশ করলেন। ‘বিকেলটা কাটাবার জন্ত বসে বসে একটা কবিতা লেখা গেল। এক-

এক সময়ে কবিতা লিখে মনটা বেশ প্রফুল্ল হয়ে উঠে। এক এক সময়ে কবিতা রচনা মনের উপরে যেন একটা বেদনার রক্ত বেথা রেখে দিয়ে যায়, এবং সেই খানটা বরাবর রাখা করতে থাকে' (২৮ অক্টোবর ১৮২০ সাল ১১ কার্তিক)। এই বেদনার রক্ত বেথা দিয়ে আবেগপ্রবণ ও অধৈর্য প্রকৃতির কবি 'আমাব স্মৃতি' কবিতাটি লিখে 'যিনি দৈবক্রমে কবির কাছে এসেছিলেন', তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বপ্নবাজ্যে ভেসে গেলেন।

আমি যা পেয়েছি তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই

কোনো খানে সীমা নাই ও মধু মুখেব—

ঐশ্বর্য স্বপ্ন স্তু নৃতি তাই নিয়ে থাকি নিতি,

আব আশা নাচি বাগি স্মৃতিব তুখেব।

যৌবনে কবি ছিলেন প্রত্যন্ত অন্তর্ভূতিপ্রাণ (ছিন্নপত্র ৬২ সংখ্যক), অধৈর্য প্রকৃতির (ক্ষণিকা-পূর্ববী, ছিন্নপত্র ৪৫ সংখ্যক) হালকা প্রকৃতির কবি-ক্ষণিকা, শেষ সপ্তক ৪১ সংখ্যক, আত্মপারচয় চতুর্থ পবিচ্ছেদ, আদর্শবাদী, গৃহপ্রিয় যুগোপ-ষাট্রীর ভাষারী ৩৮১, ৩৭৮, ৩৯৭, ৪০০ পৃষ্ঠা), পবিহাস প্রিয়, সবল ও আবেগপ্রবণ (উচ্ছ্বল-মানসী)। যৌবনে কবির আবেগপ্রবণতাব জ্ঞাত যেমন অস্বাভাবিক অতিশয়ের প্রকাশ পেত (ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক, উচ্ছ্বল-মানসী, জীবনস্মৃতি ১১২, ১২০ পৃষ্ঠা), আবার আবেগের গতি রুদ্ধ হলেই মনোকষ্ট পেতেন ও দুঃস্বপ্ন দেখতেন (ছিন্নপত্র ১২০, ১২৪ সংখ্যক, যুগোপ-ষাট্রীর ভাষারী ৪৩২, ৪৪১ পৃষ্ঠা)। কবির আবেগপ্রবণতা ও অস্থির প্রকৃতির জ্ঞাত মানসিক গতিপ্রকৃতি যেমন ক্ষণে ক্ষণে পবিবর্তিত হয়েছে তেমনি কাব্যধাবা ও প্রেমের ধারা (ভালো লাগার ধাবা ও ভালোবাসার ধাবা) দুইই একই সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে পবিবর্তিত হয়েও এক অখণ্ড তাৎপর্ষের মধ্যে প্রবাহিত (ছিন্নপত্র ৮ সংখ্যক)।

## কবির বসন্ত দিন—পূর্ণ যৌবনের দিন—

সোনার তরী—১২২০ ফাল্গুন, চিত্রা—১৩০২ ফাল্গুন।

স্থান—শিলাহদহ ১৮২০-২১ মাঘ, ১৮২৬ মার্চ।

পূর্ণ যৌবনের বেগে

নিরুদ্ধ বেদনার জোয়ার উঠেছে মনে জেগে

মানসীর মায়ামূর্তি বহি।

ছন্দের বুনানি র্গেথে অদেখার সাথে কথা কহি।

**ছিন্নপত্র — ৫ মাঘ ১৮৯১ সাল — ১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫ ।**

‘বয়স যখন চিত্রিশের নিচে ছিল তখন বলা-ই আমার কাজ ছিল, বুঝিবে এলাব ধাব ধাবতুম ন’। কেনন’ তখন তেপান্তর মাঠেই মাঝখানটাতে আমার ঘোড়া ছুটছে, যাবা না বুঝে কিছুতেই ছাড়ে না তারা আমার ঠিকানা পাষ নি’ —পশ্চিম-যাত্রীব ডায়াবি ৫৬০ পৃষ্ঠা ।

**শরৎ পর্যায়ের দ্বিতীয় পার্বের কাব্যগ্রন্থ**

**সোনার তরী (প্রকৃতি প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ) ।**

**পূর্ণ যৌবনের দিব — (১২২৮-১৩০২) ।**

এবার কবি ভালোবাসার ধারাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতির মধ্যে নিবদ্ধ করে নিজে একান্তভাবে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে বিলীন কবে দিলেন (ছিন্নপত্র ১৮৯১-২১, আত্মবিশিষ্ট ১০৮, ১১৭ ১৭৮ পৃষ্ঠা) । এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে স্বপ্নের মতো বিচরণ করে রূপকথাব জগতে প্রবেশ করলেন (ছিন্নপত্র ৩৫, ১২, ১৮০ সংখ্যক) । ‘রাজার ছেলে, রাজার মেয়ে, বিশ্ববতী, মানস সুন্দরী, নিদ্রিতা, সুষ্পোখিতা নিরুদ্ধেশ যাত্রা প্রভৃতি কবিতায় তাঁর স্বপ্নময় মনেব (রূপকথা) আভাস পাওয়া যায় । কডি ও কোমলের ‘নিদ্রিতার চিত্রটিকেই’ তিনি দুটি অংশে বিভক্ত কবে ভাব এর কণ দিয়ে অণকণ করে গড়ে তুললেন ‘নিদ্রিতা’ এবং সুষ্পোখিতা’কে । এং এই স্বপ্ন কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণে বচনা কবলেন তাঁব মানস সুন্দরীকে’ যা’ তিনি বাস্তব জীবনকেই কল্পনা দিয়ে রসের তুলিতে এঁকেছেন । বাস্তবের প্রেমসী নাবীকে (যাঁকে পবিত্রীকালে পূববাতে ‘লীলাসঙ্গিনী’ রূপে সম্বোধন কবেছিলেন) প্রেমসী কবিতা রূপে নানা আভাষ দিয়ে সাজিয়ে বসেব তুলিতে স্বপ্ন এং কল্পনা দিয়ে ‘মানস সুন্দরী’ রূপে সৃষ্টি কবলেন । তাই পবিত্রীকালে কবির ‘লীলালোকের’ লীলাসঙ্গিনী’কে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন—

আবার সাজাতে হবে আভাষণে

মানসপ্রতিমাগুলি ?

কল্পনাপটে নেশাব বরণে

বুলাব বসেব তুলি ?

(লীলাসঙ্গিনী-পূরবী) ।

কবি কল্পনার এই শ্রেষ্ঠ কাব্যের ফসল ‘মানস সুন্দরী’কে স্বপ্নময় (সোনার)

কাব্যতরঙ্গিতে (তরী) উত্তীর্ণ করান তিনি। (শিলাইদহ বোট, ৪ পৌষ ১২৯৯)।  
আবার বহু বছর পবে ‘মানাই’ এর মানসৌ’তে শিলাইদহে পদ্মার বোটে লেখা  
অতীতের ‘মানস স্মরণী’কে স্মরণ করে তাঁব আহ্বান বেজে ওঠে,—

সুহৃদ দুর্গম  
কোন পথে যায় শোনা

অগোচর চরণের স্বপ্নে আনাগোনা।

প্রলাপ বিছায়ে দিতু আগন্তুক অচেনার লাগি,  
আহ্বান পাঠাছু শূন্যে তারি পদপরশন মাগি।

‘সোনার তরী’তে এই স্বপ্ন ও কল্পনা জগতের মধ্যে বাস্তবের ছবিও রয়েছে—  
‘যেতে নাহি দিব’, ‘লজ্জা’, ‘নদীপথে’, ‘দুর্বোধ’, ‘বৈষ্ণব কবিতা’, ‘দুই পাখি’ (নর  
নারী) কবিতাগুলিতে। ‘দুই পাখি’ কবিতায় কবি তাঁদের দুই বিপরীত চরিত্রের  
বর্ণনা দিয়েছেন। আবার ‘আকাশের চাঁদ’ কবিতায় কবি, বর্তমানের গীতি-  
গন্ধময় মধুর জীবন—যেখানে ছোট ছোট ফুল, ছোট হাসি ছোট তৃখ ও  
ভালোবাসা, মানব জীবনকে ঘিরে ফুটে উঠেছে ও স্নেহ সূধা নিয়ে গৃহের লক্ষ্মী  
গৃহকে মধ্ব কবেছে, সেই মধুময় জীবনকে পরিত্যাগ কবে বহু দূরে ছায়াপুরীসম  
অতীত জীবনকে, এবং ষাঁদেব প্রতি কখনও চোখ তুলে তাকান নি তাঁদেবকেই  
উজ্জলভাবে এঁকে, কবি সেই অতীতকে ফিবে যেতে চাইছেন। অর্থাৎ বর্তমানের  
স্বন্দর জীবনকে পরিত্যাগ কবে ছায়াসম অতীত স্মৃতিকে ধরে বেখেছেন শুধু।

**ছিন্নপত্র** (১৮৯১-৯৫ শিলাইদহ)।

এই সময় নিজের সঙ্গে বিন্দু প্রকৃতিব যে অনিচ্ছিন্ন যোগ এবং একাত্মতা  
কবিকে একাত্মভাবে আকর্ষণ কবেছিল, ছিন্নপত্রেও পান্যপাতায় তাব বর্ণনা  
পাওয়া যায়। সেই সময় তিনি প্রকৃতিব রূপে এতই মুগ্ধ ছিলেন যে মাতৃষেব সঙ্গ  
পর্যন্ত পবিহাব করে চলতেন (ছিন্নপত্র ১০৫, ১১২, ১৫৬, ১৭০ সংখ্যক)। প্রকৃতির  
স্পর্শ এবং রূপ তাঁব অন্তব বীণাকে নব নব স্তব সংগীতে স্বরুত কবে তুলেছিল  
এবং তিনি নিজেকে প্রকৃতিব মধ্যে বিলীন কবে তাঁব অন্তবাত্মাকে চারিদিকে  
বাস্তব করে দিয়েছিলেন।—‘পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দু’-  
লোকের শিল্পী প্রহবে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়াব তুলি।’ কবি ছিন্নপত্রে  
লিখেছেন—‘এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলাম, যখন  
আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার স্বদূর-  
বিভূত শ্রমল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের স্বগন্ধ উদ্ভাপ উঠিত হতে

থাকত আমি কত দূর দূরান্তর দেশদেশান্তরেব জলন্তল বাগ কবে উজ্জল  
আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎঋতুসীমাকে আমার  
বুহুৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে-একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্থচেতন  
এবং অত্যন্ত প্রকাশ বৃহৎ-ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত তাই যেন খানিকটা মনে  
পড়ে। 'সোনার তবী' ও 'চিত্রা'র প্রায় সব কবিতাই শিলাইদহে লেখা হয়  
তাই 'সোনার তবী', 'বনধারা', 'নদীপথে' প্রভৃতি কবিতায় শিলাইদহের প্রাকৃতিক  
দৃশ্যের বর্ণনা দেখা যায়। এবং এই প্রথম নিজেব স'সাবের বাইরে এসে নূতনজ্ঞ ও  
বৈচিত্র্যের মধ্যে মানুষের স্বর্থ দুঃখের বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হলেন  
কবি। সেই বৈচিত্র্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ছোট গল্পের বিচিত্র ধারায় (গল্প  
শুদ্ধ)। আবার বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজেব একাত্মতা তাঁকে এমন-ই একাত্মভাবে  
আকষণ করেছিল যে শিলাইদহেব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর দৈনন্দিন জীবনের  
চিন্তা ভাবনার বিস্তারিত ছবি ইত্যাদি সবই ইন্দ্রিবা দেবীকে চিঠিতে লিখে  
জানাতে থাকেন।

### কবির বসন্ত দিন

প্রেরণাদাত্রী—এসো আমার বসন্ত দিন

লয়ে তোমার পুষ্প পক্ষী।'

কবির বসন্ত-দিনেব লেখা 'ছিন্নপত্র' কবির একান্ত স্নেহভাজন নারী ইন্দ্রিবা  
দেবীকে ৭ অক্টোবর ১৮৯৪ সালে লিখেছেন—'তোকে আমি যে সব চিঠি লিখছি  
তাতে আমার মনেব সমস্ত বিচিত্র ভাব যে বকম ব্যক্ত হ'য়েছে এমন আমার আব  
কোন লেখায় হয়নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই, ইচ্ছা কবলেও  
আমি তাদের এ-সমস্ত দিতে পাবি নে। সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই।  
তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই  
আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিংবা বিশ্বাস কববি নে, কিম্বা  
যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সূচচিত  
কাব্য কথা-বলে মনে করবি। সেই জন্তে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই  
রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি।' তাই কবির বসন্ত-দিনের মধ্যে যিনি পুষ্প  
পক্ষী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই একান্ত স্নেহভাজন নারীকে 'অনবদর'  
কবিতায় আহ্বান করলেন—

এসো আমার বসন্ত-দিন

লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী

প্রকৃতি প্রেমের বিচিত্র মনোভাব ও দৈনন্দিন জীবনের চিন্তা ভাবনাগুলি ছিন্নপত্রে প্রকাশিত। আর সে তো এই স্নেহ ভাজন নারীর উদ্দেশ্যেই।

কবি কড়ি ও কোমলের ‘মঙ্গল গীতে’ একান্ত স্নেহ ভাজন নারী ‘মা লক্ষ্মী’র উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

মা, আমার এই জেনো হৃদয়ের সাধ  
তুমি হও লক্ষ্মীর প্রতিমা  
মানবের জ্যোতি দাও, কবো আশীর্বাদ,  
অকলঙ্ক মূর্তি মধুরিমা।

একান্ত স্নেহেব পুস্তলি ও সংগীতের প্রেবণাদাত্রী নাবীকেই তাই তিনি দিয়ে যান তাঁর সংগীত-সম্ভাব সংরক্ষণের এক গুরু দায়িত্ব। ইন্দিরা দেবী থাকে জগতের মাঝে মঙ্গলদাত্রী হতে বলেছেন কবি, তিনি আজীবন যত্নে কবির তুলে দেওয়া দায়িত্বভার বহন করে চলেন। কবি তাঁর কবিতায় বলেন—

এ গান যেন রে হয় তোর প্রবতারা  
অঙ্ককারে অনিমেষে নিশি করে সারা।  
তোমার মুখের পরে  
জ্যেগে থাকে স্নেহভরে  
অকুলে নয়ন মেল দেখায় কিনারা।

কবির অসুস্থপ্রকৃতির প্রথম বহিমুখ উজ্জ্বাস ‘প্রভাত সংগীত’ কাব্যগ্রন্থখানি শিশু ইন্দিরা দেবীকে প্রথম উপহার দিয়ে কবি শিশুকালের বিশ্বকে পুনরায় ফিরে পেলেন। এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহজ মিলন (কবি কাহিনী), বিচ্ছেদ (সম্ভাষ্যসংগীত), ও পুনর্মিলন হল প্রভাত সংগীতে। প্রভাত সংগীত কাব্যগ্রন্থখানি ‘সমাপন’ করলেন শিশু ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশ্যেই এবং ছিন্ন পত্রাংলী তাঁরই উদ্দেশ্যে রচিত। ১৮২১-৫ মাঘ-১৮২৫-১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত নিঃশিত ভাবে লিখিত হয়েছে।

চিত্রা কাব্যগ্রন্থে কবির আদর্শ ও বাস্তবের সংঘাতের দৃশ্য যখন ‘দুঃসময়’ আরম্ভ হল সেই দুঃসময়ে চিত্রা, কল্পনা তাঁর গানের ও ব্যাঘাত ঘটল দুঃসময়-১০১, ব্যাঘাত ১০১) এবং সেই সঙ্গে বাস্তবের ধট্টন আঘাতে কবির গানের আসরও ভেঙে গেল। গীতহীন ১৩০২ চৈত্র, তুরাকাজ্জা ৪ ফাল্গুন ১৩০২। তাই ক্ষণিকার পরবর্তীকালে দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই কবি গান সংরক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেন।



**চিত্ৰা (যুগ্মসত্তার দৃষ্ট ১৩০০ মাঘ-২০ ফাল্গুন ১৩০২) । কুষ্টিয়াৰ**  
ব্যবসা । **বসন্তের সমাপ্তি-৭ ফাল্গুন ১৩০২ ।**

রূপনারায়ণের কুলে  
জগে উঠিলাম,  
জানিলাম এ জগৎ  
অপ্ন নয় ।

চিত্ৰায় আবার কবি-মনের গতি পৰিবৰ্ত্তিত ঘেন । কবি দৌষদিন পরে এই প্রথম  
বাস্তবের সংস্পৰ্শে এলেন (ছিন্ন পত্র ২৩১ সংখ্যক) । মার বাস্তবের কঠিন আঘাতে  
প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য (স্বপ্নরাজ্য থেকে) বিদায় নিয়ে মর্তে (সংসারে) নেমে আসেন  
তিনি তাঁর জীবনে এবার অশান্তির স্রব । চিত্ৰা কাব্যে কবির বৈত সত্তার দ্বন্দ্ব অর্থাৎ  
ভিতরের আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত । কবি চিত্ৰার ভূমিকায় লিখেছেন—  
‘পরম দেবতার পূজা যুগ্মসত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আনন্দের প্রেরণা,  
আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ । সংসারে এহ দুই সত্তার বিরোধ  
সর্বদাই ঘটে, নিজের অন্তরে পূর্ণতার যে অলুপ্তাসন মাহুধ গৃঢ়ভাবে বহন করেছে  
তার সম্পূর্ণ প্রতিবাদে জীবন ব্যর্থ হয়েছে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই । নিজের মধ্যে  
নিজের সামঞ্জস্য ঘটতে পারিনি, এই ভ্রষ্টতা মাহুধের পক্ষে সব চেয়ে শোচনীয় ।  
আপনার দুই সত্তার সামঞ্জস্য ঘটেছে কি না এই আশঙ্কাসূচক প্রশ্ন চিত্ৰার কবিতায়  
অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে । বসন্ত চিত্ৰায় জীবনরঙ্গভূমিতে যে মিলন নাট্যের  
উল্লেখ হয়েছে তার কোনো নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাইরে নেই, এবং তার  
মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয় । মাহুধের আত্মিক সৃষ্টি কেন, প্রাকৃতিক  
সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য প্রকাশের সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব  
দেখতে পাওয়া গেছে ।’ চিত্ৰা ও তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে একদিকে যেমন দুঃখ  
দ্বন্দ্ব নিয়ে কঠিন বাস্তবের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি অত্নদিকে কবির সুখ  
দুঃখ তার সমস্ত যোগ বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে একটি অখণ্ড তাৎপৰ্যের মধ্যে গেঁথে  
নিয়ে অমৃত, আনন্দে উত্তীর্ণ হবার চিত্রও পাওয়া যায় । আবার এই দুঃখ-দ্বন্দ্বের  
পাশেই রয়েছে বিচিত্ররূপিণী নারীর বর্ণনা—‘চিত্ৰার প্রথম কবিতায় তার একটি  
সূচনায় বলা হয়েছে—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে  
তুমি বিচিত্ররূপিণী

তার পর আছে—

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একাকী  
তুমি অন্তরবাসিনী ।

আম্র ব্যাখ্যা করে যে কথ! বলবার চেষ্টা করছি সেই কথাটাই এই কবিতার মধ্যে ফুটে চোখেছিল। বাইরে যার প্রকাশ বাস্তবে সে বহু, অন্তরে যার প্রকাশ সে একা। এই দুই ধারার প্রবাহেই কাব্য সম্পূর্ণ হয়। জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এই দুইই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য। তাই চিত্রা কাব্যে যেমন বিচিত্ররূপিণী নারীর কথা ব্যক্ত করেছেন, তেমনি আবার ধীর, স্থির, অন্তরবাসিনী যিনি কবির অন্তরে একা সেই অগৌরবা কল্যাণী নারীর কথাও তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন। তাই কবি লিখেছেন—‘লোক জীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং ঐশনিবদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্র ভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন। আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার পণ্ড ও গুণ রচনাকে চালনা করেছি—

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে

তুমি বিচিত্ররূপিণী।

উৎসাহী, স্বর্গ হইতে বিদায়, প্রেমের অভিষেক, সাস্থনা, রাগে ও প্রভাতে প্রভৃতি কবিতায় এই বিচিত্ররূপিণী নারী এবং একাকিনী নারী এই দুই ভাবের নারীর কথাই বিধৃত করেছেন। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ, উর্বণী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য, সেইজন্য কোন কর্তব্য যদি তার পথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সে নিছক নারী মাতা কন্যা বা গৃহিণী সে নয়—যে নারী সাংসারিক সম্বন্ধের অতীত, মোহিনী সেই। সে যেন চির যৌবনের পাঞ্জে রূপের অমৃত—তার সঙ্গে কল্যাণ মিশ্রিত নেই। সে অবিস্মৃত মাধুর্য। আবার ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ কাব্যে যিনি অঙ্গরী রূপে বর্ণিত, তিনি উদাসীন এবং কাব্যে প্রতি শোক বা দুঃখ অল্পভব করেন না—

হে অঙ্গরী,

তোমার নয়ন জ্যোতি প্রেম বেদনায়

কত না হউক ম্লান—লহু বিদায়।

তুমি কায়ে কর না প্রার্থনা, কারো তরে

নাহি শোক।

আবার যিনি দীনতম ঘরে জন্মগ্রহণ করেন সেই প্রেমসী নারীই সংসার সমুদ্রের  
কর্ণধার এবং দুঃখের দিনের সান্ত্বনাদাত্তী—

ধরা'লে দীনতম ঘরে  
যদি জন্মে প্রেমসী আমাব নদীতীরে  
কোন এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটির  
অশ্বখছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার  
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার  
আমারি লাগিয়া সযতনে । ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২ ।

‘প্রেমের অভিষেক’ কবিতায় কবি সাধারণ নারীর অসাধারণ প্রেম কথা বর্ণনা  
করেছেন। ‘উর্বশী’ কবিতার বহু বছর পবে বলাকা ২৩ সংখ্যক কবিতায় কবি  
একই কথা লিখেছেন—‘একজন সুন্দরী তিনি উর্বশী, বিশ্বের কামনা রাজ্যে  
আধিপত্য করেন। আর একজন লক্ষ্মী, তিনি কল্যাণী। একজন স্বর্গের অমরী,  
অমৃত স্বর্গের ঈশ্বরী। একজন হবণ করেন, আর একজন পূরণ করেন। এক নারী  
বসন্তের চঞ্চল আবেগকে বাইরেব তাপে আন্দোলিত করে দেন, অগ্নাজন তাকে  
শিশির স্নাত করে অস্তবের মাধুর্য়ে ফলবান কবে তোলে।’ কবির কবিতায় যেমন  
এই দুই ভিন্ন চরিত্রের নারীর কথা ব্যক্ত কবেছেন, তেমনি উপন্যাসে এই দুই  
ধরণের নারীর চরিত্রকে রূপায়িত করেছেন ‘দুই বোন’ নারী চরিত্র দুটিতে এবং  
বহু উপন্যাসে (বলাকা-কাব’-পবিত্রতা—ক্ষিত্রিমোহন সেন)।

তাঁই ‘চিত্রা’ কবিতায় লিখেছেন—

কত না বর্ণে কত না স্বর্ণে গঠিত

কত যে ছন্দে কত সংগীত বসিত

কত না গাঁহু - ত না কাণ্ড পঠিত

কত অসংখ্য কাহিনী । ১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২ ।

চিত্রা—অদ্ভুত বিবিধ বর্ণ যুক্ত। জৈনিক প্রভা। কবির জীবনে ও কাব্যে এই  
বিচিত্ররূপিণী নারী ও একাকিনী নারীর পাশেই রয়েছে কবির যুগ্মসত্তার স্বন্দু।  
অর্থাৎ বাস্তব জীবনের দুঃখ-বেদনা, স্বার্থ-দেষ, ভালো-মন্দ নিয়ে যে বাস্তব সত্তা  
আছে, সেই বাস্তব সত্তাকে (ছোট আমি, কবি বিশ্বের সঙ্গে বিবাদের সঙ্গে বিশ্ব-  
মানবের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে উর্ধে তুলে ধরে আদর্শ সত্তায় (বড়ো আমি)  
উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন (আত্ম পরিচয়—১৮২ পৃষ্ঠা)। ‘আমার নিজের মধ্যেই  
বড়ো আছে—যে ব্রহ্ম আমার নিজের মধ্যে ছোট হচ্ছে—যে ভোক্তা। ঐ দুটোকে  
এক করে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়’ (পথে ও পথের

প্রান্তে ৮৪৫ পৃষ্ঠা)। কিংবা মাহুকের ছোটো রূপ, একটা বিশেষ রূপ আর একটা ‘বিশ্ব-রূপ’ (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ১৮২ পৃষ্ঠা)। হৃঃসময় (চিহ্না কল্পনা), ব্যাঘাত, স্বর্গ হইতে বিদায়, সাধনা (চিহ্না), স্বাধী, কাব্য, গীতহীন, স্বার্থ, যৌন, শুশ্রূষা, বিদায় (চৈতালি), হতভাগ্যের গান, ঝড়ের দিনে (কল্পনা), প্রভৃতি কবিতায় কবি-মনের দুঃখ-বিশ্বের কথা জানা যায়। কবি সাংসারিক জীবনের দুঃখ বেদনা, স্বার্থ-স্বৈর, অশান্তি প্রভৃতিকে জয় করেছেন ‘প্রেমমন্ত্র’ দিয়ে (চৈতালি) এবং উদার মঙ্গলমন্ত্র দিয়ে। কবির এই বাস্তব ও আদর্শের সংঘাত বোঝার বহু কবিতায় ধরা পড়ে। চিহ্না ও তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে কবির হৃঃসময় আরম্ভ হয়ে গেছে, তাঁর গানের আসর গেছে ভেঙে। গীতহীন—চৈতালি ১৩০২) ভিন্নবীণার তার হাতে (ব্যাঘাত—চিহ্না) ঋণগ্রস্ত, সঙ্গীহীন, আশ্রয়হীন ভাগ্যহীন কবির দিন আশঙ্কায় কাটে (হৃঃসময়, হতভাগ্যের গান, ঝড়ের দিনে—কল্পনা)। এই হৃঃসময়ে প্রেমসী নারীই তো একমাত্র সহায় ও ভরসাস্থল এবং ‘সংসার সমুদ্রে যেন পুর্ণিমার ইন্দু’ এবং দুখের দিনের ‘সাধনা’ (সাধনা চিহ্না)। কবির নিজের কথায় ‘আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল, সে দেনা সম্পূর্ণ স্বকৃত নয় কিন্তু দায় একেলারই। দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক। অর্পণের এত অভাব ছিল যে আজ জগদ্ব্যাপী হৃঃসময়েও কল্পনা করা যায় না, আর সে কথা কোনে! কালেও তা জানবে না কোন ইতিহাসেও তা লিখিত হবে না।’ এই সব কবিতায় দুঃখ স্বপ্নের ইতিহাস আছে অপরদিকে অন্তরীক্ষা, জীবনদেবতা, এবার ফিরাও মোরে অশেষ (কল্পনা) সাধনা প্রভৃতি বহু কবিতায় দুঃখ-বিশ্বকে অতিক্রম করে সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করে বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস পরিস্ফুট। ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতা প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন, ‘বে শ্রেয় মাহুকের আত্মাকে হৃঃস্বের পথে স্বপ্নের পথে অভয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করেই প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষাটি এই কবিতার মধ্যে স্থল’ বাক্ত হয়েছে। বাণির স্বরের প্রতি ধিক্কার দিয়েই সে কবিতার আরম্ভ (আত্মপরিচয় ১২১ পৃষ্ঠা)।

যে দিন জগতে চলে আসি,

কোন মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাণি।’

আবার শেষাংশে আছে প্রিয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষা

হয়তো যুঁচিবে দুঃখ নিশা,

তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেমতৃষা।

আত্মপরিচয়ে ১ • পৃষ্ঠায় 'জীবনদেবতা'।<sup>১৮</sup> সম্বন্ধে লিখেছেন, 'এই যে কবি, বিনি আমার ভালমন্দ, আমার সমস্ত অল্পকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবন দেবতা নাম দিয়াছি।' কবির এই আদর্শ ও বাস্তব এই দুই সত্তার চিত্র তাঁর কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি বাস্তব সত্তাকে (দুঃখ-দম্ব—ছোট আমি) অতিক্রম করে আদর্শ সত্তার (অমৃত, আনন্দে, প্রেমে—বড়ো আমি) উত্তীর্ণ হতে চান আর ক্রমে সংসারের ঘাত প্রতিঘাত ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে (ছিন্নপত্র ২-১ নং), দুঃখ দম্বকে অতিক্রম করে অখণ্ড সত্যে এসে পৌঁছান। এবং এই সত্যই কবিকে স্বর্ষের তুফান পার করিয়ে দিয়ে আনন্দে অমৃতে প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দিল (আত্মপরিচয় ২০৪ পৃষ্ঠা)। এই প্রেমের আলোতে কবির শেষ ঘোবনের অকাল বসন্তে, কবিকল্পনার অর্ধ মানবী ও অর্ধ কল্পনার 'অসম্পূর্ণ মানসী' বহু দ্বিধা দম্ব উদাসীনতা ও সাংসারিক দুঃখোগের মধ্য দিয়ে পূজারিণী বেশে ক্ষণিকাতে পরিপূর্ণ মানবী রূপে সম্পূর্ণ হল। কবি-মানসীর এবার পূজারিণী বেশ (আবির্ভাব—ক্ষণিকা)। 'রাজ্য'।<sup>১৯</sup> নাটকটি কবির এই সংশ্লিষ্ট প্রেমের ও সাংসারিক জীবনেরই দুঃখ দম্বের (আগুন লাগা) রূপক কাহিনী। অস্থির কবি এবার প্রেমের আলোতে স্থির হয়ে গেলেন। কবির পরিপূর্ণ প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি পরেই তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ হল। এই আধ্যাত্মিক সত্তার প্রথম প্রকাশ তাঁর নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে (১৩০৮ আঘাট)। এরপর থেকেই কবির জীবনধারা ও কাব্যধারা দুইই পরিবর্তিত হয়ে গেল। তাই কবি নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে ছবি এঁকে এই পরিবর্তনের সংকেত দিলেন। কবি সাংসারিক দুঃখোগের মধ্যে [দুঃসময় (ঋণগ্রস্ত কবি)] কল্পনা অভয় মন্ত্রকে সঞ্চল করে, উন্নত শিরে প্রেমকে মানব কল্যাণের পথে চালিত করে কর্ম-যজ্ঞের সূচনা করলেন এবং গৌরবময় অতীত ভারতবর্ষের রূপকে বাস্তবে রূপায়িত করে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেলেন (১৩০৭—১৩০৮ বঙ্গাব্দ)। তাই কবি নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে শাখির<sup>২০</sup> ভয়শূন্য চিন্তের উন্নত শিরের ছবিটি এঁকেছেন। [পরবর্তী-কালে এই সময়কাল কথা (১৩০৮—১৩২১) বিশ্লেষণ করেছেন বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ৫৮, ১০২, ১০৩ পৃষ্ঠায়]।

এবার কবির কাব্য লক্ষ্য পূজারিণী বেশে দেখা দেওয়াতে ক্ষণিকার পরবর্তী-কালের রচনা নৈবেদ্য, উৎসর্গ, গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, গীতালি প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কবি পূজার অর্ঘ্যই রচনা করলেন। এই কাব্যগ্রন্থের নামগুলির মধ্যেও বিশেষ তাৎপৰ্য আছে, বিশেষভাবে উৎসর্গপত্র বিহীন গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, গীতালি

কাব্যগ্রন্থগুলি। কবির প্রথম যুগের কবিতা শৈশব সংগীত, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত সংগীত, ছবি ও গান কাব্যগ্রন্থের নামগুলির মধ্যে ভাবটাই প্রধান গীতট। অপ্রধান (গোপ), যেমন শৈশবের গান, সন্ধ্যার সংগীত, প্রভাতের গান, বাইরে ছবি পড়ে অন্তরে গান হয়ে দেখা দেয়, কিন্তু ক্ষণিকার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, গীতালি কাব্যগ্রন্থের গীতটাই প্রধান ভাবট। অপ্রধান (গোপ), এই গ্রন্থগুলিতে গানই উৎসর্গ (অঞ্জলি দিলেন) করলেন কবিতার মাধ্যমে।

চিত্রা কাব্যগ্রন্থের শেষ পর্বে **বসন্তের সমাপ্তি (৭ ফাল্গুন ১৩০২)** / কবি 'শ্রোত' কবিতায় বসন্তের দিনগুলির কথা ও বসন্ত অবসানের কথা প্রকাশ করেছেন। কবি যৌবনের (বসন্তের) দিনগুলির কথা প্রকাশ করে লিখেছেন—

যৌবন নদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে  
একদিন ছুটেছিছু, বসন্ত পবন  
উঠেছিল উচ্ছ্বসিয়া, তীর উপবন  
ছেয়েছিল ফুল ফুলে, তরু শাখা' পরে  
গেয়েছিল পিককুল—আমি ভালো করে  
দেখি নাঃ শুনি নাই কিছু—অনুক্ষণ  
ভুলেছিছু আলোড়িত তরঙ্গ শিখবে  
মস্ত সন্তপ্ণে।

**কবির বসন্ত অবসান—(৭ ফাল্গুন ১৩০২)।**

আজি দিবা অবসানে  
সমাপ্ত ঝরিয়া খেলা উঠিয়াছি তীরে,  
বসিয়াছি আপনার নিভৃত কুটিবে,  
বিচিত্র কল্লোলগীত পশিতেছে কানে,  
কত গন্ধ আসিতেছে সায়াহ্ন সমীপে—  
বিস্মিত নয়ন মেলি হেরি শূন্য পানে  
গগনে অনন্ত লোক জাগে ধীরে ধীরে।

চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে প্রিয়নাথ সেন চিত্রা কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে দুটি অসাধারণ হৈয়ালিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—“মাঝে মাঝে চিত্রা পড়িতেছি এখনও কিন্তু তোমার.....কে খুঁজিয়া পাইতেছি না।” আবার অন্তত লিখেছেন ‘চিত্রা’ এবং A digit of the moon ভুলিও না’ অর্থাৎ মানসীতে

যিনি মানসেই ছিলেন চিত্রায় তিনি A digit of the moon হয়ে দেখা দিয়ে ক্ষণিকাতে পূর্ণচন্দ্রেতে পরিণত হল। কবির বসন্তের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জীবনের গতি স্থিরতার দিকে এগিয়ে চলল—‘যেন অনেকদিনের দেখা একটা রোজ রঞ্জিত মাঠ, শীতল স্নিগ্ধ বাতাস, পুঙ্খবিলীয় ধার দিয়ে বাঁকা গ্রামের পথ, ঘটকক্ষ অবগুষ্ঠিত বধু এবং সেই সঙ্গে ঐ সর্ষেক্তের মৃদু, স্বগন্ধে অল্পপ্রবিষ্ট একটি উদার নির্মল আকাশ মনে পড়ে—যেন কোন এক সময়ের পরিতৃপ্ত প্রেম এবং পরিপূর্ণ শান্তির স্বগভীর স্বথস্থিতি ঐ সর্ষে ফুলের গন্ধের সঙ্গে জড়িত আছে’ (১১ ডিসেম্বর ১৮২৫ ছিন্নপত্র)।

### শরৎ পর্যায়ের শেষ পর্ব

অকাল বসন্তের সূচনা—চৈতালি (১৩০৩ চৈত্র),

কল্পনা (১৩০৬)।

অকাল বসন্ত অথবা শেষ যৌবনের শেষ বসন্ত—

ক্ষণিকা (১৩০৭)।

### চৈতালি কাব্যগ্রন্থ

চৈতালিতে শেষ সাতাশের আরম্ভে (৩৬-৬৩ বৎসর) ও অকাল-বসন্তের সূচনায় প্রেমের স্থির পদক্ষেপে কবি জীবন দেবতার (পরায়ণ ব্রজ উদ্দেশ্যে প্রথম অর্ঘ্য নিবেদন করলেন—

তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি  
তোমার আনন্দমূর্তি নিত্য হেরে যদি  
এ মুগ্ধ নয়ন মোর,—পরায়ণ-ব্রজভ,  
তোমার কোমল কাস্ত চরণ পল্লব  
চিরস্পর্শ বেখে দেয় জীবন তরীতে  
কোন ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।

চৈতালি—চৈত্রমাসে উৎপন্ন শস্য। চৈত্রমাস—বসন্তকাল। কবির বসন্তের ফসল যৌবন ও প্রেম (প্রেম, শেষ কথা) দুইই ‘উৎসর্গ’ করলেন চৈতালিতে—

আজি মোর ত্রাণাকুঞ্জবনে  
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।  
পরিপূর্ণ বেদনার ভরে

মুহূর্তেই বুঝি ফেটে পড়ে  
বসন্তের দূরন্ত বাতাসে  
জুয়ে বুঝি নমিবে ভূতল—  
রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে  
থরে থরে ফলিয়াছে ফল।

বলাকা-কাব্য পরিক্রমাতে (৮৮ পৃষ্ঠা)। কবি একই কথা প্রকাশ করেছেন, ‘পৌষ মাসেও মাঝে মাঝে বসন্তের হাওয়া এসে নাড়া দিয়ে যায়। এই রকম একটা ভাব চৈতালির যুগে আমার মনে বার বার আঘাত কবেছে।’ তাই চৈতালির যুগে অকাল বসন্তের সূচনায় কবির হৃদয়ে যেন ভাব যজ্ঞ সুরু হয়ে গেল।

এখনি বেদনাভরে ফাটি গিয়া প্রাণ  
উচ্ছ্বসি উঠিবে যেন সেই মহাগান।  
অবশেষে বুক ফেটে শুধু বলে আসি—  
হে চির স্নানর, আমি তোরে ভালোবাসি।  
(৩০ চৈত্র ১৩০২)।

কবির বসন্তের সূচনা-দৃশ্যের গোলাজাত ফসল—প্রেম, প্রিয়া, মানসী, শেষ কথা, ক্ষণমিলন, সমাপ্তি, অসময়, স্মৃতি, নারী, যাত্রী, শাস্তিময়, কাব্য, ধ্যান, স্বার্থ প্রভৃতি ছোট ছোট কবিতায় বিশ্লেষণ করেছেন। এই ছোট ছোট কবিতাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কবির বহু কবিতার মর্মার্থ এবং কবি-জীবনের গুঢ় রহস্য এই কবিতাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। ‘শেষ কথা’ ও ‘ক্ষণ মিলন’ কবিতা দুটির আরম্ভ কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে, এবং ‘ক্ষণিকা শব্দের উৎপত্তি ‘ক্ষণিক মিলন’ অথবা ‘ক্ষণ মিলন’ থেকে। যার বিশ্লেষণ রয়েছে ছিন্নপত্র ১৩০ নং এ।

### কল্পনা (১৩০৬)

কবির ‘দূঃসময়’—  
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ গোর  
এখনি অঙ্ক, বঙ্ক করো না পাখা।  
(১৫ বৈশাখ ১৩০৪)।

ঋণগ্রস্ত কবি (চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড)

হে অলস্মী, কক্ষকেশী  
তুমি দেবী অচঞ্চলা।



তোমার রীতি সবল অতি,

নাহি জ্ঞান ছলাকলা ।

(৭ আশ্বিন ১৩০৪) ।

অত্যন্ত ‘দুঃসময়ে’ ‘অসময়ে’ ‘হতভাগ্যের গানে’র মধ্য দিঘে ‘ঝড়ের দিনে’  
‘স্বপ্নে’র মতো কবির জীবনে অতীতের নব বসন্তের (শবৎকাল) আগমন—

এ দুৰ্দিনে কী কাবণে পড়িল তোমাব মনে

বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী ?

কবি বসন্তের বিস্মৃত কাহিনীর কথা প্রকাশ কবেছেন ‘বসন্ত’ কবিতায়—

আমার বসন্তরাতে চারি চক্রে জেগে উঠেছিল

সে কয়টা কথা,

তোমার কুসুমগুলি হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ

নিখে গেল কোথা ?

যদিও কবি ‘স্বপ্নে’ অতীতের নব বসন্তের শবৎ কালের মধ্যে ফিরে গিষেছিলেন,  
কিন্তু আতিশয্যেব দৰুণ ‘শেষ কথা’ বলবাব পরম লগ্নটি ‘ভ্রষ্ট লগ্নে’ পরিণত হল  
(মংপুত্ৰে ববীজনাথ) ।

শরমে মরিয়া বলিতে নারিছ হায়,

নবীন পথিক, সে যে আমি, সেই আমি ।’

তাই পরবর্তীকালে পূর্ববীৰ ‘ক্ষণিকা’য় কবির আক্ষেপোক্তি—

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি,

বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,

তা হলে পড়িত ধবা বোমাক্তিত নিঃশব্দ নিশাঘ

দুজনেব জীবনেব ছিল যা চরম অভিশ্রাঘ ।

### ক্ষণিকা (১৩০৭-অকাল বসন্ত—প্রেমিক ববীজনাথ) ।

‘অকালবসন্তে জেগেছিল ভোবের কোকিল’—পত্রপুট বারো । শেষ  
যৌবনের শেষ বসন্ত বা অকালবসন্তের ‘ঘন ববঘা’র’ মধ্যে ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থখানি  
লিখিত ও প্রকাশিত হয় । কবি চৈতানিতে ‘প্রেম’ সম্বন্ধে কবিতায় লিখছেন—

দৈবযোগে ঝলি উঠে বিদ্যুতের আলো,

যাবেই দেখিতে পাই তার বাসি ভালো,

তাহারে ডাকিয়া বলি—ধন্য এ জীবন,

তোমারি লাগিয়া মোব এতক ভ্রমণ ।

কবি ‘ভৎসনা’ কবিতাটিতে অভিমানী নারীর উক্তি দিবেই কবির ভালোবাসার কথা এই প্রথম প্রকাশ করলেন—

কাহার লাগি একলা ভিলে বসে

মুক্ত কেশে আপন বাতায়নে !

তডিং শিখা ক্ষণিক দীপ্তালোকে

হানতেছিল চমক তোমাব চোখে,

জানত কে বা দেখতে পারে তুমি

আছি আমি কোথায় যে কোন্ কোণে !

কবি পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতেও (১৬১ পৃষ্ঠা) লিখেছেন—‘তারা দেখা দিয়েছে—

কেউ বা ঘরের কোণে ।’

ক্ষণিকাতেই কবির প্রেমের ধাবা প্রবল হুগে দেখা দিল ।

## উৎপত্তি—

ক্ষণিকা শব্দের উৎপত্তি ক্ষণিক বা ক্ষণ থেকে । রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই ক্ষণিক বা নিমেষগুলি অত্যন্ত দূর্ঘ্ণা । কবি দূর্লভ মুহূর্ত গুলি আপন স্মৃতিপটে ধরে রেখে কালের বৃহৎ ষট্ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করে কবিতায় কিংবা রচনায় বহুবার প্রকাশ কবেছেন । যেমন মুহূর্তের তাসি, নিমেষের দৃষ্টি, ক্ষণকালের মিলন, সমুদ্রের উপর সূর্যাস্তের দৃশ্য, গঙ্গাবক্ষে গান, মহানিমের ঝিল্লিঝংকৃত স্তম্ভ রাত, গ্রামের পথে সর্বেজুলের গন্ধের সঙ্গে প্রেম ও শান্তির স্মৃতি, প্রথম যৌবনের ঘন্টার শব্দ ইত্যাদি । ‘উচ্ছ্বল’ (মানসী) কবিতায়ও কবি লিখেছেন— ‘আমার কেবল একটি নিমেষ, । তা’বি তরে ধৈর্য আসি ।’ কবি কড়ি ও কোমল এবং চৈতালিতে ‘ক্ষণিক মিলন’ ও ‘ক্ষণ মিলনের’ কথা কবি শ্রায় লিখে ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যাকে দূর্ঘ্ণা নিমেষের তিলেক মিলনের কথা বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন— ‘এক এক সময় মনে হয়, এই-যে আমার গুটিক তক সচেতন প্রাণী জড়মহাসমুদ্রের মধ্যে মাথা তুলে বুদ্ধবৃদ্ধের মতো ভেসে উঠেছি এব কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ একটা আকস্মিক সংযোগ—এই সংযোগটুকুর মধ্যে যত বিষয় যত প্রেম যত আনন্দ তা আবার অনন্তকালের মধ্যে গড়ে উঠবে কি না সন্দেহ । বসন্ত রায়ের কবিতায় এক জায়গায় একটা লাইন আছে—নিমেষে শতক যুগ হাবাই হেন বাসি । বাস্তবিক মানুষের এক নিমেষের মধ্যে শত যুগের সংযোগ বিয়োগ ঘটতে পারে । সেই জন্তে নিমেষগুলোকে দূর্ঘ্ণা বলে বোধ হয় ।’ কবি দূর্লভ মুহূর্তের

আকস্মিক সংযোগের কথা বহু কবিতায় উল্লেখ করেছেন যেমন ‘ক্ষণিক মিলন’, ‘ক্ষণ মিলন’, ‘হঠাৎ মিলন’ কবিতায়। এই দুর্ঘট্য নিমেষের দূর্লভ মুহূর্তে যে অচেনা নারীর সঙ্গে কবির ক্ষণকালের জ্ঞাত আকস্মিক (ক্ষণিক, দৈব) সংযোগ (মিলন) হয়েছিল তিনিই ক্ষণিকা—

অসময় কালের মাঝে তিলেক মিলনে  
পল্লব জীবন তাব আমাব জীবনে।  
যতটুকু লেশমাত্র চিনি দৃজনায়,  
তাহার অনন্তগুণ চিনি নাকো হায়।

অথবা—

দৃষেব মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা  
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত কবিছে বচনা  
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি যোব পাশে  
চিত্ত ভবি দিলে সেই রহস্ত-আভাসে (স্বয়ং ১২)।

কবি এই ক্ষণিকারই গান গাইলেন ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থখানিতে। আব চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে, ‘প্রিয়ার একটি নিমেষের দৃষ্টি’কে অক্ষয় সংগীতে গঁথে প্রিয় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে উপহার দিলেন—

এ বসন্তে প্রিয় সব পূর্ণিমা-শীতে  
নব মমিকাব মাল্য জড়াইয়া কেশে  
তোমার আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত স্বতন্ত্র আখিতে  
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে  
সে কি রাখ নাই গঁথে অক্ষয় সংগীতে।  
সে কি গেছে পুষ্পচাত সৌভেব দেশে।

আবার ‘ক্ষণেক দেখা’তে কোতুক কবে লিখলেন—

একটুখানি ফিরে কেন  
দেখলে ঘোমটা ফাঁকে ?

**সূচনা—**

ক্ষণিকার সূচনা যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারিতে, ২৬।২৭।২৮ আগষ্ট ১৮২০ সালে এবং সমাপ্তি ১২০০ সালে শিলাইদহে। কবি ব্রজদ লোকেন পালিতই কবির একটি মাত্র বন্ধু যিনি ক্ষণিকা’র সূচনায় দেখেছিলেন।

কণিকারে দেখেছিলে

কণিক বেশে কাঁচা খাতায়,

সাজিয়ে তারে এনে দিলেম

ছাপা বইয়ের বাঁধা পাতায়।

কবি যখন ত্রিশ বৎসর বয়সে বিলাত যাত্রা করেন তখন লোকেন পালিত কবির সঙ্গী ছিলেন। সেই সময় গৃহপ্রিয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধুমপায়ী যুবক লোকেন পালিতের সিগারেটের ধুম্রজ্বালার মধ্যে ১২৬।২৭।২৮ আগষ্ট রাত দুটো পর্যন্ত) যে রসলাপ হয় সেই স্থিতিগুলি এবং পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতাগুলি সাজিয়ে বন্ধু লোকেন পালিতকেই কণিকা কাব্যগ্রন্থটি ( বাঁধা পাতা ) এবং স্মরণোপহার স্বরূপ যুরোপ যাত্রীব ডায়ারীখানি ( কাঁচা খাতা ) উপহার দিলেন। কণিকার সূচনা এবং কবির 'প্রথম চিঠি'টিও ঐ একই সময়ের লেখা, তাই ২৮ আগষ্ট ১৮২০ সালটি রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশিষ্ট দিন। রবীন্দ্র-জীবনীতে কণিকালের ঐ দিনটি এবং ২০ আগষ্টের লোহিত সংস্করণে স্থায়ীত্বের দুর্লভ সম্ভাব্য রংটি কবির ভালোবাসামুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে চিবদিনের জন্ম অঙ্কিত হয়ে বয়ে গেছে। অতীত যৌবনের সেহ দুর্লভ সম্ভাব্য যে ঐটিকে নিয়ে কবি ভালোবাসার লোকের মুখের উপর ধরে নূতন এবং স্তম্ভর আলোকে দেখতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীকালে নিঃসঙ্গ কবি সেই রঙটিকে ধরে রাখলেন চিত্রকলায়—বিশ্বনাথায়ীমূর্তি ও বেদনার্ত কবির মুখের উপরে। এবং অতীত যৌবনের সেই কণিকালের দিনটিকে ধরে রাখলেন কণিকা কাব্যগ্রন্থে, এবং চিঠির উত্তরটি লিখে রাখলেন লিপিকাব 'প্রথম চিঠি'তে যা' পরিশেষের 'আরেকদিন' কবিতায় ও পূর্ববীর কৃতজ্ঞতায় এই চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন—২৩ আগষ্ট ১৯২৭ রক্ষিউস জাহাজ।

**কণিকা কাব্যগ্রন্থ—শেষ যৌবনের শেষ বসন্ত।**

**স্থান**—কবির 'লীলালোকে'র লীলাক্ষেত্র' শিলাইদহে সংসার জীবনের 'লীলা-সঙ্গিনী' 'নিরুপমার উদ্দেশ্যে একাল বসন্তের ঘন বণবার মধ্যে ১৯০৭ বঙ্গাব্দে রচনা করলেন কণিকা কাব্যগ্রন্থখানি এবং বহু গান। মোর প্রেম এল গান গেয়ে।' নবযৌবনের নববসন্তে কবি থাকে প্রথম গান দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন—'দাঁড়িয়েছ সংগীতের শতদলদলে' (স্মরণ নয় সংখ্যক)। তাই পরবর্তীকালে কবি পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারিতে 'কণিকা' এবং 'অস্থিহে-মজ্জাতে বেহিসাবি, জন্মগরিব,

কাঁচা ঋণগ্রস্ত' কবিকে স্বরণ করে পূর্ববর্তীতে অতীতেব 'আনন্দের হারানো কণিকা' কণিকার পরিচয় দিয়েছেন, যিনি ভীকুদীপশিখা নিয়ে কবির বসন্ত রাতে এসেছিলেন (পশ্চিম-বাতীর-ডায়ারি ৫৬১, ১৬৬ পৃষ্ঠা)।

### ‘উদ্‌বোধন’

কবি শেষ যৌবনে কল্যাণী নারীকে আহ্বান করে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে শিলাইদহে কল্যাণ কর্মের সূচনা করে নব জীবনের ‘উদ্‌বোধন’ করলেন। এই কালশ্রোতে বর্তমানে কবির জীবনে যাবা কণিকের জন্ম এসে হেসে চলে যাচ্ছে কবি তাদেরই গান আনন্দ পুলক ভরে গাইছেন। কবি অতীত জীবনের প্রতি মুহূর্তের কাহিনী ও শোক দিয়ে যে স্মৃতিবাহিনী গেঁথেছিলেন, সেই সব বন্ধন মুক্ত করে শোক দুঃখ স্মৃতি সব কালের পটে মুছে ফেলে দিয়ে দুর্বোধ ও অগ্রাপ্য বস্তুর পেছনে না ছুটে ‘সহজ’কে (নারী) আদরের ডেকে নিয়ে বর্তমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করে আনন্দ-পুলকিত মনে নিজের জীবনের নূতন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। কবির এই মনোভাবকে কালের বুহৎ পটভূমিকার সঙ্গে তুলনা কবে ‘নদী জলে পড়া আলোর মতন’ মহন্তব জীবনের পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেলেন।

### অসম্পূর্ণ মানসী থেকে সম্পূর্ণ কণিকা — কবির যৌবনের মানসভূমি ও তার ভৌগোলিক অবস্থান (১৮৮৮-১৯০১)।

কণিকা কাব্যগ্রন্থের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কাব্যগ্রন্থের পটভূমিকারও আলোচনার দরকার। প্রথম যৌবনে কবি সংসার জীবনের আনন্দ ও কবি-কল্পনার ‘রোম্যান্টিক সহর’ গাজীপুরের নূতনত্বের মধ্যে রচনা করেছেন ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থেব বহু কবিতা (মানসী কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা ১৮৮৮)। ১৮৯১ সালে কবি নিজের পরিচিত সংসার ছেড়ে শিলাইদহে এসে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে এই প্রথম মাতৃবেব স্বথ দুঃখের বিচিত্র জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হলেন। সেই বৈচিত্র্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁব ছোট গল্পের নিবস্তর ধারায়। সোনার তরী থেকে নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থ শিলাইদহে লেখা হয়। যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কবি প্রায় একাই শিলাইদহে কাটিয়েছেন ১৮৯১ ৯২)। এই দীর্ঘ সময় কবির সংসারের ভার কবি-পত্নী একলাই বহন করেছেন মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। শেষ যৌবনে কবি ও কবি-পত্নী জোড়াসাঁকোর সংসার উঠিয়ে দিয়ে শিলাইদহে স্বথের সংসার আরম্ভ করলেন (১৮৯৯ ১৯০১)। এই শেষ যৌবনের সংসার জীবনের মধ্যে কবির ‘লীলালোকের লীলাক্ষেত্র’ শিলাইদহে রচনা করলেন

‘কণিকা’ কাব্যগ্রন্থ (১৩০৭ এবং ‘নৈবেদ্য’ (১৩০৮)। এই সময় কবিপত্নীই ছিলেন কবির একমাত্র সহায় ও ত্বরসাম্বল এবং ঋণগ্রস্ত কবির সংসারের গুরু দায়িত্ব সবই তাঁর উপরে ব্রজ। তাই কবি ‘পথে’ কবিতায় লিখলেন—

ওই-যে শুনি মাঝে মাঝে—

না জানি কোন্ নিতাকাঙ্খে

কোথায় দুটি কঁকন বাজে

গৃহকোণে।

ষেতে যেতে এলেম হেথা

অকারণে।

কবি সংশয় দ্বন্দ্ব বাধা বিরোধ ও সাংসারিক জুর্যোগের মধ্য দিয়ে এতদিন পরে শেষ যৌবনে ‘স্বথের বন্দরে’ অর্থাৎ স্বথের সংসারে এসে পৌঁছলেন। কবি এই নিভৃত কুটিরে এসে কবির প্রথম যৌবনের হারিয়ে যাওয়া ফাস্তান মাসের কথা (শরৎকাল—কড়ি ও কোমল) মনে পড়তে লাগল—

আবেক দিন সে ফাগুন-মাশে

এছ আগে

চলেছিলেম এত পথে সেই

মনে জাগে।

আমের বোলের গন্ধে অবশ

বাতাস ছিল উদাস অলস,

ঘাটের শানে বাজছে কলস

কণে কণে

সে-সব কথা ভাবছি বসে

অকারণে।

কবির এই বিলম্বের জন্ত ‘বিলম্বিত’ কবিতায় লিখেছেন—হাসি গান আনন্দ উচ্ছ্বাস নিয়ে কবির যে যৌবন যে স্বর্গ যে বসন্ত ছিল সেই নব যৌবনের কবি বসন্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কর্মের জগতে সংশয় দ্বন্দ্বের জগতে (মানসী) চলে গেলেন। আবার বহুদিন পরে কবির শেষ যৌবনে যখন পূব হাওয়া বইছে সেই সময় কবি অকাল বসন্তকে তাঁর বর্ণ গন্ধময় প্রথম বসন্তের ফুল ধরিয়ে দিলেন।

হল কালের ভুল,

পূবে হাওয়ায় ধরে দিলেম

দক্ষিণ হাওয়ার ফুল।

শেষ যৌবনে অকালবসন্তের আগমনে কবি কনিকা কাব্যগ্রন্থখানি বসন্তকালে আরম্ভ করেন এবং ইচ্ছা ছিল বসন্তকালেই এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ করা কিন্তু গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় বর্ষাকালে (চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড)। তাই বসন্ত ও বর্ষার দুই রকম কবিতা কনিকা কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। কাব্যগ্রন্থের প্রথম দিকের কবিতাগুলি বসন্তকাল ও বসন্তের নারীকে নিয়ে লেখা (যুগল থেকে অতিথি)।

কুহু আমার এই অমরাবতী—

আমরা দুটি অমর, দুটি অমর।

শেষের কবিতাগুলি বর্ষাকাল ও বর্ষার রূপকে নিয়ে লেখা। তাই প্রথম আষাঢ়ের নব মেঘের নীল, কাল ও শ্রাম বেড়ে সঞ্চে বসন্তের নারী ‘নিকুপমার’ রূপের তুলনা দিয়েছেন যেমন—

তোমার দুখানি কালো আঁখি—পরে

শ্রাম আষাঢ়ের চায়াখানি পড়ে

ঘন কালো তব কৃষ্ণিত কেশে

যুথীর মালা

তোমাঝি ললাটে নববরষার

বরণজালা।

অথবা—

আঁকুল করেছ শ্রাম সমাগোহে

হৃদয়সাগর উপকূল

চরণে জড়িয়ে বনফুল।

কনিকার কবিতাগুলিতে শিলাইদহের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ও বর্ষার বর্ণনা পাওয়া যায় ‘পথে’ ‘মেঘমুক্ত’ ‘নব-বর্ষা’ ‘আষাঢ়’ ‘এক গাঁয়ে’ ‘বিরহ’ ‘দুই বোন’ ইত্যাদি কবিতায়। ‘বিরহ’ কবিতাটি কবিব অত্যন্ত প্রিয় কবিতা চন্দ্রনাথ বসু এই কবিতা সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য করেছেন। ‘দুই বোন’ কবিতাটি অত্যন্ত ভাব সমৃদ্ধ কবিতা। এই কবিতাটিতে দুই মহোদগা কিংবা ভগিনী স্থানীয় বাঙ্গবীব জল আনয়নের কথা বিবৃত করেছেন। সম্ভবতঃ দুটি কবিতাই কবির জীবনের বাস্তব

ঘটনা (ছিন্নপত্র ৪১)। কবির এই শেষ-যৌবনের আঘাত ও বাল্যকালের আঘাত এই দুই আঘাতের দুই রকম ‘খেলা’র (কণিকা) কথা কবিতায় প্রকাশ করেছেন। ছেলেবেলার ‘বর্ষা পর্ষায়ের’ আঘাতে নৌকা ভাসানোর খেলা, এবং শেষ যৌবনের ‘শরৎ পর্ষায়ের’ আঘাতে যৌবন লীলার নানান ‘খেলা’র কথা কণিকার কবিতোগুলিতে রয়েছে। তাই কবির শেষ যৌবনের অকালবসন্তের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পূব হাওয়া, শ্রাবণ পূর্ণিমা, বর্ষা ও আঘাত মাস। আঘাতের সঙ্গে নারীর এত বিচিত্র রূপ কবির আর অত্ৰ কোন কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না। কণিকাতেই বর্ষার সঙ্গে বসন্তের নারীর বিচিত্র রূপের বর্ণনা এবং বিচিত্র লীলার প্রকাশ রয়েছে। শেষ যৌবনের প্রথম আঘাতের (১ আঘাত ১৩০৭) ঘন বরষার ‘দুদিনের’ মধ্যে (দুঃসময়) নব বসন্তের পঞ্চদশী নারী (তম্বু-কড়ি ও কোমল) ‘নিরুপমার’ ‘আবির্ভাবের’ স্মৃতি পরবর্তীকালের বহু কবিতায়, নাটকে ও গানে এবং ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ (৩৬ সংখ্যক) প্রকাশ করেছেন। কবি সানাই এর ‘শেষ অভিসারে’ লিখেছেন—

বসন্তের প্রথম দৃতিকা

এনেছিল আঘাতের প্রথম যুথিকা

অনির্বচনীয় তুমি।

কবি নিজের জীবনের এক-এক পর্ষায়ের সঙ্গে এক একটি ঋতুর তুলনা করে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। এই পাঁচটি পর্বের চারটি প্রধান ঋতুর মধ্যে যে চারজন কাব্যলক্ষ্মীর (৩জন কাব্যলক্ষ্মী ও একজন প্রেরণাদাত্রী) আবির্ভাব হয়েছিল তাদেরই উদ্দেশ্যে ‘অনবসর’ কবিতাটি লেখা হয়েছে যারা কবির কাব্যতরঙ্গীতে পদার্পণ করেছিলেন এবং যারা কবির প্রিয় নারী ছিলেন। কবি ‘অনবসর’ কবিতাটিতে পরিহাস ছলে এই প্রেরণাদাত্রী নারীদের বিভিন্ন ঋতুর নামানুসারে সন্মোদন করে পরিহাস প্রিয়া শৈশবের কাব্যসঙ্গিণী ‘পুরাতন সহচরীর’ উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

এসো আমার শ্রাবণ নিশি

এসো আমার শরৎ লক্ষ্মী,

এসো আমার বসন্ত দিন

লগ্নে তোমার পুষ্প পক্ষী,

তুমি এসো, তুমিও এসো,

তুমি এস, এবং তুমি, (পুরাতন সহচরী)



প্রিয়ে, তোমরা সবাই জান

ধরণীর নাম মর্তভূমি—

যে যায় চলে বিরাগভরে

তারেই শুধু আপন জেনেই

বিলাপ করে কাটাই, এমন

সময় যে নেই, সময় যে নেই ।

কবি এই অসময়ে ও শেষ যৌবনে এঠে চারজন কাব্যলক্ষ্মীর মধ্যে আসলটিকে (তথ্যাপি) রেখে দিলেন । এবং ‘স্মৃতি’ রূপিণী (তথ্যাপি-কণিকা, স্মৃতি-চৈতালি) ‘পুরাতন সহচরী’কে ছেড়ে ‘নূতন আশি’ যিনি বাস্তব নারী তাঁর উদ্দেশ্যে কবির কাব্যের ও হৃদয়ের দ্বার দুইই খুলে দিলেন—‘চারের থেকে একের পরেই আমার অভিকৃতি’ ।

আবার শেষ যৌবনে এই অসময়ে ‘নূতন’ (কড়ি ও কোমল) এবং ‘আসল’ (তথ্যাপি) কাব্যলক্ষ্মীকে নিয়ে নূতন ভাবে কাব্য রচনা করতে পারবেন কি না এই আশঙ্কাও কবির মনে দেখা দিল—

শেষ বসন্তের সন্ধ্যা-হাওয়া

শশু শূন্য মাঠে

উঠল হা হা করি ।

আর কি হবে নূতন যাত্রা

নূতন রাণীর দেশে

নূতন সাজে সেজে ?

এবার যদি বাতাস উঠে

তুফান জাগে শেষে

কিরে আসবি নে যে (পরামর্শ) ।

কবির এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল, কণিকার বিনাশ হ'ল ১৯০২ খৃষ্টাব্দে (জ্যৈষ্ঠ ১১ সংখ্যক) ।

**প্রেম—**‘ভৎসনা’ কবিতাটিতে মঞ্চচিত্রা অভিমাত্রী নারীর উক্তি দিয়ে কবির এই প্রথম ভালোবাসার কথা প্রকাশিত । এই নারী কবির মংগীত মুখর আনন্দিত জীবনে কোনো অধিকার বিস্তার কবেননি অথবা কামনা বাসনা দিয়ে তাঁকে টেনেও আনেন নি, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দীনবেশে তাঁর দ্বারে অতিথি হয়ে লাড়াও দেননি, তিনি শুধু পথের শেষে যেখানে গাছের ছায়ায়

পথিকেরা দাঁড়ায় সেখানে কিছুক্ষণের জন্ত ঘাসের উপর দাঁড়িয়েছিলেন। কেমন করেই বা তিনি জানবেন যে কবি এই নারীকে বিদ্যুৎ ঝলকের মধ্যে ঘরের কোণায় দেখতে পাবেন! এই নারীর আছে পদ্মদিগ্বির ধারে সন্ধ্যাদীপ জ্বালা গৃহখানি। ভালোবাসাকে তিনি ভিক্ষা বা দান স্বরূপ চাননি, তবে কেন কবি তাঁকে ভালোবাসে মিথ্যা লজ্জা দিলেন! এতদিন পরে শেষ ঘৌবনে কবি সব সংশয় (সংশয়ের আবেগ—মানসী) কাটিয়ে যাঁকে ভালোবাসলেন তিনি ঘরের কোণেই ছিলেন (কেউ বা ঘরের কোণে—পশ্চিম বাত্রীর-ডায়ারী ৫৬১ পৃষ্ঠা)। ক্ষণিকার 'ভৎ'সনা' কবিতাতেই কবি এই প্রথম দুর্লভ প্রেমের আবির্ভাব, যার জন্ত কবি বর্হাদন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন (শেষ কথা—কড়ি ও কোমল)। 'সানাই'এব আসা যাওয়া কবিতায় প্রেমের এই উপলব্ধি কথা প্রকাশিত—

ভালো সা এসেছিল

এমন সে নিঃশব্দ চরণে

তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,

দিই নি আসন বসিবার।

'স্বরণ তিন সংখ্যক' কবিতায় লিখেছেন—

প্রেম এসেছিল, চলে গেল সে যে খুলি দ্বাং—

আর ক'তু আঁসবে না।

ভৎ'সনা, নীহারিকা, উদাসীন, আসা যাওয়া, শেষ সপ্তক এক সংখ্যক, পত্রপুট পনেরো সংখ্যক, অদেয় 'সানাই', অন্তহিতা (পরিশেষ), বলাক। বিয়াল্লিশ সংখ্যক প্রভৃতি কবিতায় এবং বহু গানে প্রায় একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ কবি যাকে ভালোবাসলেন তাঁকে সমাদর করেন নি এবং তাঁর প্রতি উদাসীন ছিলেন।

যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন

সে তুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে

যেখানে লোমার ছুটি পাথের চিহ্ন আছে আঁকা।

আবার পত্রপুট পনেরো সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

ভালোবেসেছি তাকে।

তুচ্ছতার আবরণে অল্পজ্বল

অতি সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে

কখনো করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস,

আঘাত করেছে কখনো বা ।

কবি এই নারীকে কৌতুক পরিহাসে সব সময় উল্টো কথা বলে আঘাত দিতেন, তাই কবি গর্ব অথবা ‘ভীকৃত্য’র জন্ম এবং সময়াভাবেব জন্ম ভালোবাসার কথা কোনদিনই বলতে পারেন নি । এই চুঃখ তিনি পত্রপুট বাগে সংখ্যক বলাকা বিয়াল্লিঙ্গ সংখ্যক কবিতায় এবং বহুগানে ব্যক্ত করেছেন । শেষ সপ্তক উনত্রিংশ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

ঠিকমতো সময়টি পাইনি

তাকে সব কথা বলবার,

অনেক কথা বলা হয়েছে যখন-তখন

সে-সব বুঝা কথা

হতে হতে বেলা গেছে চলে ।

এই হল কবির ‘সমগ্র জীবনের সত্য ।’ কবি ষাঁকে প্রথম যৌবনে হালুকা মনে করেছিলেন, শেষ যৌবনে সেটাই ভারী হয়ে গেল । কবি পশ্চিম-বাজীর ভাষারিতে (৫৪৪ পৃষ্ঠা) নিজের ব্যক্তিগত জীবন প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘সরকারী পরিমাপের আদর্শ যেটাকে দেখায় ভারী সেটাই হয়তো হালুকা, যেটাকে বুঝি হালুকা সেটাই হয়তো ভারী । দীর্ঘকালের আত্মযজ্ঞিক অনেক বাজে জিনিষ ভুলে যাওয়ার ভিতর দিয়েই বিশেষ জিনিষের বিশেষ ওজন পাওয়া যায় ।’

‘উৎসৃষ্ট’ কবিতায় কবি হৃদয় নিয়ে হৃদয় দেবার কথা উল্লেখ করেছেন, আবার পরিহাস করে লিখেছেন—

আজ যে তাহা ছড়িয়ে গেছে

অনেক দূরে—

অনেক দেশে, অনেক বেগে,

অনেক স্তরে ।

কুড়িয়ে তারে বাধতে পারে

একটি থানে

এমনতরো মোহন-মস্ত

কেউ বা জানে

নিজের মন তো দেবার আশা

চুকেই গেছে,

পরের মনটি পাবার আশায়

রইছে বেঁচে ।

মৃণালিনী দেবী ভালোবাসার মোহনমন্ত্র দিয়েই কবির ছড়ানো হৃদয় বেঁধে দিলেন । অস্থির কবি শেষ যৌবনে অতীতের (মুদ্রোপ-যাত্রীর-ডায়ারী) বহু আকাজক্ষিত ‘দুর্লভ ভালোবাসা’ অথবা ‘যথার্থ নির্জনতাপ্রিয় একাগ্রগভীর ভালোবাসাপূর্ণ একটি হৃদয়’ (২৩ অক্টোবর ১৮২০ মুদ্রোপ-যাত্রীর ডায়ারী) পেয়ে স্থির হয়ে গেলেন । এতকাল কবি ভাবের বসেই ডুবে ছিলেন, ক্ষণিকাতে সেই ভাব হতে রূপে এসে মনেব সঙ্গে ‘বোঝাপড়া’ (ক্ষণিকা) কবে নিজেকে ‘সম্বরণ’ কবলেন—

মনে রে আজ কহ যে,

ভালো মন্দ যাহাই আসুক

সত্যেরে লও সহজে ।

‘মংপুতে ববীজ্ঞনাথ’ এ তাঁর কথায় আছে, ‘কে সামনে এলো, কে পেছনে রইল সেটা সামান্য, অসামান্য সেইটাই যেটা তার দান, কি উপায়ে দিল তা নয়—কি দিল । মিলন তখনই যথার্থ বড় মিলন হয়, যখন সে মহন্তর জীবনের মধ্যে প্রেরণা আনে । যেখানে পুষ্প মং, যেখানে সে কর্মের দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে তাকে নিয়ত জাগ্রত করে বাথা কম কাজ নয় ।’ তাই কবি কল্যাণগর্মেত্ব সঙ্গনীরূপে কল্যাণী নারীকে পেয়েছিলেন বলেই তিনি ‘প্রতিজ্ঞায়’ (ক্ষণিকা) তাপস হতে পেরেছিলেন ।

ক্ষণিকার অন্তর্নিহিত অর্থ এই, কবির জীবনে যখন নববসন্তেও ভালোবাসা অকালবসন্তে এলো তখন সেই ভালোবাসাব উচ্ছ্বাসে ও আনন্দে কবি কৌতুক পরিহাসে তাঁর ভালোবাসার পাত্রপাত্রীদের উদ্দেশ্যে কবির মনের ভাব এক ঝাঁক বনের পাখির মত নানা খোপখোপের ভেতর থেকে ছেড়ে দিলেন । কবি প্রিয়নাথ সেনকে লিখেছেন—‘তারা গানও গাচ্ছে এবং উড়চোও । তাদের কণ্ঠে স্বর এবং ডানা লঘুতা দিয়ে দিয়েছি । ঐ লঘুতাটার জন্ত একদলেব বিরাগ-ভাজন হব । যারা আকাশের পাখির স্বাভাবিক গানের চেয়ে খাঁচার পাখির কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম তক্তপোষে বসে গুনতে চায়—আমাব ছাড়া পাখিগুলি অত্যন্ত লঘুতাবশতঃ তাঁদের দাঁড়ের উপর ধরা দিবে না বলে তারা চটবে ।’ এমনকি চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে ‘ক্ষণিকার কবিকে’ নিয়েও পবিহাস করেছেন । ‘শিলাইদহের ঘাটে যখন ফিবলেন তখন চতুর্দশীর চাঁদ মধ্য গগনে । আমার সেই জ্যোৎস্না জড়িত নদীটি স্মিত বিষন্ন হাস্ত বলেন, আমাদের কলহংসমুখর নির্জন বালুতে শত শত শব্দেব মৌন ক. কা. ৬

মিলন স্মৃতি একেবারে বিস্মৃত হয়ে তুমি এখন ডাঙার মথুরায় রাজত্ব করতে গেছ। আমি তার একটি অক্ষর জবাব দিতে পারলুম না একেবারে নির্বোধের মত নিঃশব্দে চৌকিটিতে বসে রইলুম (১০ আগষ্ট ১৯০০ সাল)। আবার কবিতায় আনন্দ উচ্ছ্বাসে কৌতুক পরিহাসে ‘অতিবাদ’ করলেন।

প্রিয়ার পুণ্যে হলেম রে আজ

একটি রাতের স্বাজ্যাধিরাজ,

ভাগ্যে আজ করছে বিরাজ

সকল প্রকার অজস্রম্ভ।

কণিকার এই কবিতাগুলিতে যৌবনের রবীন্দ্রনাথকে কিছু কিছু ধরা যায়। কবি ও কবি-পত্নীর চরিত্র গত ‘প্রভেদ’ (বিচিত্রিতা) ও জানা যায়। কবি ছিলেন উদাসীন, পরিহাসপ্রিয়, খেয়ালি, ঋণগ্রস্ত, ক্লান্ত ও অস্থির প্রকৃতির মানুষ, ভালোবাসেন নদীর বালুর চর। কবি-পত্নী ছিলেন সরল, হাস্যমুখী, কর্মঠ আতিথ্য-পরায়ণা সেবাপরায়ণা কলাগী গৃহলক্ষ্মী ভালোবাসেন নীড়কে; এবং শেষ যৌবনে তারা বৃহৎ পরিবারের বাইরে এসে দুজনে একা হলেন—‘তোমার সন্ধ্যাপ্রদীপ আলোকে তুমি আর আমি একা।’ কবি প্রিয়নাথ সেনকে চিঠিতে লিখেছেন—‘এখন ঘরের দিকে মন টানিতেছে...সেখানকার সন্ধ্যাপ্রদীপ শিখা কেবলই চোখে পড়িতেছে।’ কবিতাগুলিতে কবি পত্নীর চেহারার বর্ণনাও পাওয়া যায়। ঝগালিনী দেবীর রং শ্যামলা (কালো-শ্যামা মেয়ে, কৃষ্ণকলি, যাত্রী) তনু, তনুদেহ, মৃদু কালো হরিণ চোখ এবং কবি ছিলেন ঝগালিনী দেবীর নিম্নক ভক্ত, এবং কৌতুক পরিহাসে সব সময় উল্টো কথা বলতেন (ভীকতা)।

‘কৃষ্ণকলি’ কবিতায় কবি কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখের বর্ণনা দিয়েছেন, এবং নব বর্ষার নব মেঘের কালো রূপের সঙ্গ কালো মেয়ের (শ্যামা মেয়ে) রূপের তুলনা করেছেন। এই শ্যামা মেয়ে অথবা শ্যামা সুন্দরীর (বোধন-মহুয়া: কালো-রূপই কবির সকল রসের ধারা বা:’ তাঁর কাব্যে ও জীবনে প্রতিফলিত। আর কবির এই পরম সত্য কথাটির ‘জবাবদিহি’ করেছেন নবজাতকে। আবার ‘হরিণ আধির’ (ইউরোপ-যাত্রীর ডায়ারি ৪০২ পৃষ্ঠা) উদ্দেশ্যে ‘কতিপূরণ’ কবিতাটিও লিখেছেন। ‘কতিপূরণ’ কবিতায় কবি কেন মহাকাব্য না লিখে গান লিখলেন তার কারণ ও প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, এই সময়ে (১৯০১ বঙ্গাব্দ-জীবনস্মৃতি ১১৩ পৃষ্ঠা) বঙ্কিমবাবু লঙ্গে আমার আলাপের স্মরণাত হয়। আবার বঙ্কিমবাবুও লিখেছেন, ‘এই চারমাস ভ্রান্ত-সগ্রহায়ণ ১৯০১ বঙ্গাব্দ মধ্যে

রবীন্দ্রনাথ অল্পগ্রহপূর্বক অনেকবার আমাদের দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন।' নগেন্দ্র গুপ্ত প্রবাসীতে লিখেছেন, 'স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে মহাকাব্য লিখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। মহাকাব্য রচনা করা রবীন্দ্রনাথের ষটিবা উঠে নাই, কিন্তু তিনি মহাকবি কি না জগতের সকল সাহিত্যে সকল ভাষায় তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে।' কবিবও মনে মনে মহাকাব্য রচনা করার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু হরিণ নয়না নারীর কাঁকনের ঝঙ্কারে কবির কল্পনাটি ফেটে গিষে মহাকাব্যের বদলে হাজার গানে পরিণত—

আমি নাবব মহাকাব্য

সংরচনে

ছিল মনে—

ঠেঁফল কখন তোমার কাঁকনে—

কিংকিণিতে,

কল্পনাটি গেল ফাটি

হাজার গীতে।

কবি মহাকাব্য না লেখাতে তাঁর এবং দেশের যে ক্ষতি হল, সেটা গান লিখেই 'ক্ষতিপূরণ' করে দিলেন। পববতীকালে পশ্চিম-যাত্রীব ভাষাবিতে (৫৬২-৫৬৬ পৃষ্ঠা) তাঁর গান সম্বন্ধে অতীতের কথাই (ক্ষতিপূরণ—ক্ষণিকা) আবার পুনরুক্তি কবে লিখেছেন—'এ কথাটাব এতক্ষণ ধরে আলোচনা করছি এইজগে যে, যে লীলালোকে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলুম, যে লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেল, সেইখানেই জীবনটার উপসংহার করার উদ্বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন কেমন-কবার হাওয়া বইছে। 'কদা পদ্মার ধারে আকাশের পাবে সংসারের পথে যাবা আমার সঙ্গী ছিল তারা বলছে, সেদিনকাব পালা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় নি, বিদায়ের গোধূল-বেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলো সাজ করে যেতে হবে। সেইজগেই সকালবেলাকাব মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাকাব বজনী-গন্ধ' হয়ে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্ছে।' বলছে, তোমাব খ্যাতি তোমাকে না টানুক, তোমার কীর্তি তোমাকে না বাঁধুক, তোমার গান তোমাকে পথের পথিক করে তোমাকে শেষ যাত্রা রওনা করে দিক। প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ার স্বগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ-বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগেব রাণা আলোতে তোমাব সেই দূরের বঁধুর সন্ধ্যানে নির্ভয়ে চলে যাও। লোকের ডাকাডাকি শুনো না। সব যে দিক থেকে আসছে সেই দিকে

কান পাতো—আর সেই দিকেই ডান। মেলে দাঁও সাগৰ পাৱেৰ লীলালোকেৰ  
আকাশ পথে ।’

### ক্ষণিকাব বিনাশ ও অসীমৰ আবিৰ্ভাব ।

‘ক্ষণিকাব ‘যথাসময়’ কবিতায় লিখেছেন, কবি ষাঁদেব কাছে ষত বেশী ঋণী  
ছিলেন তাঁদেব উদ্দেশ্যেই তাঁৰ কাব্যগ্রন্থগুলি তন বেশী উৎসৰ্গ কৰেছেন । তাই  
কবি স্নেহময়ী, ককণাময়ী, কাব্যোৰ প্ৰেবণাদাত্ৰী কাব্যসজ্জিনীকে অৰ্বিকাংশ  
কাব্যগ্রন্থগুলি উৎসৰ্গ কৰে তাঁব কাৰে ব স্নেহেব ঋণশোধ কৰে দিলেন । কবি  
‘যথাসময়’ কবিতায় পৰিহাস চলে লিখেছেন—

হঠাৎ পড়ে ঋণশোধেই পালা,

ঋণী ভনেব না যায় পাওয়া দেখা,

তখন ঘবে স্ফুটবে কবি,

খিলেব পৰে খিল লাগাও খিল ।

কথাব সাখে গাঁথো কথাব মালা,

মিলেব সাখে মিল, মিলাও মিল ।

কিন্তু ক্ষণিকাব বিনাশেব পৰ কবি উৎসৰ্গ ২’ সংখ্যক কবিতায় এই প্ৰথম তাঁব  
শূন্য মন ও অনন্ত প্ৰেমেব ঋণেব কথা বাক্ত কৰে জীবনেব বাৰ্থতাৰ কথা প্ৰকাশ  
করলেন—

বাৰ্থ হয়, বাৰ্থ হয় এ দিনরজনীব,

এ মোব জীবন ।

হায় হায় চিবদিন

হৰে আছে অৰ্থহীন

এ বিশ্ব ভুবন ।

অনন্ত প্ৰেমেব ঋণ

কবেহি বহন

বাৰ্থ এ জীবন ।

বলাকা কাব্য-পৰিক্ৰমা ১৩৪ পৃষ্ঠায় প্ৰেমেব ঋণশোধ অথবা প্ৰতিদান সম্বন্ধে কবি  
ব্যাখ্যা কৰে বলেছেন—জন্মাবাব সময়ই আমৰা ঋণ নিয়ে জন্মাই, তাৰপৰ জন্ম  
ভবে সেই ঋণ শোধ কৰি । ..... ..অন্তেব কাছে চাওযা যায়, কিন্তু নিজের  
কাজে নিজের চাওযাব কোনো অৰ্থ নেই । প্ৰেমেব পথে চাইতে গেলেই প্ৰেমের  
অপমান । ববং আমৰা তাকে কিছু দিতে পাৱলে ধন্য হই । শাৱদোৎসব নাটক-

খানাত্তে প্রেমের এই ঋণশোধের কথা কিছু বলা হয়েছে।' তাই কবি ক্ষণিকার পরবর্তীকালে, কবির প্রেমময়ী নারী যিনি দুঃথকে গলার হার করে দৈনন্দিকে মহিমা দিয়েছিলেন (শেষ সপ্তক পাঁচ সংখ্যক,) সেই নারীর অনন্ত প্রেমের ঋণশোধ করলেন মৃত্যুর রূপকে ভেঙে 'খ্যানোন্তবা শ্রিয়া' অশরীরী নারী অধবার সৃষ্টি করে (শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক)। 'দুঃখেবই রূপ মধুবন্ম'—কবি উপনন্দের মতো আজীবন দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ করলেন। কবি নিজেরই প্রেমের ঋণশোধের রূপক কাহিনী লিখেছেন 'শাবদোৎসবে'।

যে-আমি চায় নি কাবে ঋণী কবিতাবে,

বাখিয়া যে যায় নাই ঋণভাব,

সে আমারে কে চিনেছ মর্ত্যকায়াম। (স্ববন-সৈঙ্কৃত)।

কবি 'জ্বলদীন এগারো সংখ্যক কবিতায় ক্ষণিকার উৎপত্তি, বিনাশ, রূপান্তরিত ক্ষণিকা (মুখ ঢাকা বধু-অশরীরী নারী) ও অনন্তের আবিভাবের কথা প্রকাশ করে নিজেব জীবন বৃত্তান্তেব কথা ব্যক্ত কবেছেন।

### ক্ষণিকার বৈশিষ্ট্য ও তার প্রভাব—

ক্ষণিকার কবিতাকে মোহিতচন্দ্র মেন সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থে লীলা' নাম দিয়েছেন, প্রেমলীলার এই অঙ্গটির নামেব মর্যেও গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। 'লৌকিক প্রেম অনেক সময় প্রেমের ছায়ামাত্র। এই অবাস্তব ছায়া যথার্থ প্রেমের নিকট তিরস্কার ভাজন না হইয়া কোতুক ভাজন হইয়াছে এবং তাহার কোতুক মিশ্রিত কটাক্ষের দ্বারা লঙ্ঘিত হইয়া উঠিয়াছে। এই কোতুক হাতুই লীলার কবিতাগুলি দোষিমান।' রবীন্দ্রনাথও 'একদা পদ্মার ধারে আকাশের পার'কে 'লীলালোকের লীলাক্ষেত্র' বলে পশ্চিম-যাত্রীর ভাষারিতে উল্লেখ করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থটি কবির সবচেয়ে প্রিয় গ্রন্থ বলে মংপুতে কবি নিজেই প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীকালের বহু কবিতায় এবং পশ্চিম-যাত্রীর-ভাষারি ও পূর্ববীর ক্ষণিকায় এই 'ক্ষণিকা'রই কথা বার বার উল্লেখ করেছেন। এমন কি 'শেষ অর্ঘ্য' (পূর্ববী) ও 'নৈবেদ্য' (মহয়া) রেখে গেলেন ক্ষণিকার উদ্দেশ্যে। যদিও ক্ষণিকার কবিতাগুলি খুবই হালকা ধরণের এবং কথ্য ভাষায় লিখিত হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটি কবিতাই খুব অর্থপূর্ণ। যুরোপ যাত্রীর ভাষাবীর সেই অন্তর, পরিহাস প্রিয়, আবেগপ্রবণ, গৃহপ্রিয় স্থণী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্ষণিকার কোথায় যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে।



স্বভাৱতঃই মনে হ'ল জাগে কবি মানসে এই শেষ যৌবনে এৰা' শ্লোক  
নসমসে যখন কল্পাব পাঁত্ৰেব সজ্জানে শান্ত সেই সময় হঠাৎ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এত  
আনন্দ এত উচ্ছ্বাসেব কাবণ কি হ'ব পাৰে। এই কবি শুধু ক্ষণিকাবতী কবি।  
একে মানসীৰ ভালোবাসাৰ সংশয় নেই, সোনাৰ ভবীৰ স্বপ্নময় মনেৰ আভাস  
নেই চিত্ৰাব বৈষ্ণৱ সন্তাপ বন্দু নেই কল্পনাৰ দুঃসময়ও নেই, আছে শুধু আনন্দ-  
উচ্ছ্বাসে কোতুক পৰিহাসে যৌৱন ও বসন্তকে আহ্বান কৰে মানাল হ'ল পাতাল  
পানে বাওৱাৰ গান এওঁ স্বৰ্গত শব্দ শোক দুঃখ স্মৃতিকে ভুলে গিয়ে যৌৱনেৰ ও  
বসন্তেৰ কবিকে স্বৰণ কৰে নহন। তাই ক্ষণিকাব কবি মানসেব সঙ্গ অগা কোন  
কাব্যগ্ৰন্থৰ কবি মানসেব কোন যোগ নেই। এই কাব্যগ্ৰন্থ শুধু দুই যৌৱনেব  
(কডি ও কোমল ক্ষণিকা) এবং দুই বসন্তেৰ (নববসন্ত ও শেষ বসন্ত) কবিকে  
নিজে। এবং কবি যাকে ভালোবাসেন (ভৱ'সনা) পৰিহাস কৰতেন (অভিৱাদ,  
উৎসৰ্গ, গৰ্ৱ বা ভৌকতাবজ্ঞতা উল্টো কথা বলে আঘাত কৰতেন (ভৌকতা),  
নিদ্ৰেও কবতেন আৰাব ভক্তও ছিলেন (ক্ষতিশূৰণ, উৎসৰ্গ ও সংখ্যক, আৱাৰ  
ক'ল হ'ল 'দাদাসী' ছিলেন (দাদাসী শেষ সপ্তক এক সংখ্যক), সেই সনাতন  
'পান' দেশেব 'দাদাসী' উদ্দেশ্যে 'ক' কাব্যগ্ৰন্থখানি অতি সাধাৰণ কথা ভাৱে  
কবিৰ পুৰাতন প্ৰাণেব কথাটি 'মেঘমুক্ত' আৰাব নূতনভাবে লিখিত হ'য়েছে।  
অৰ্থাৎ সহজ ভাষাৰ সহজ কথাই 'সোজাভজি' ভাবে 'কল্যাণী' নাবী  
'চিৰায়মানাৰ' উদ্দেশ্যেই লেখা হ'য়েছে।

ক্ষণিকাব কবিতাশৃংখল কবিৰ জীবনে ও কাব্যে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান  
অধিকাৰ কৰে ব'য়েছে, তাৰ কাৰণ নিজেই 'আবিভাব' ও 'ভৌকতা' প্ৰসঙ্গে যা  
লিখেছেন সেও লেখা দুইটিহ ক্ষণিক কাব্যগ্ৰন্থেব সাধাৰ্ম্য ও ভিত্তি স্বৰূপ। কবিৰ  
শেষ যৌৱনে শেষ বসন্তে এমন 'কভন কল্যাণী নাবীৰ 'আবিভাব' হল যাকে  
কবি ভালোবাসলেন, অথচ গৰৱ বা 'ভৌকতা'ৰ জ্ঞতা বিপৰীত পথ অবলম্বন কৰে  
গভীৰ 'কথা'ৰ কোতুক পৰিহাসে পৰিণত কবলেন। কবি 'ভৌকতা' প্ৰসঙ্গে  
লিখেছেন—'ভালোবাসা আপনাকে প্ৰকাশ কবিৱাৰ ব্যাকুলতায় কেবল মৃত্যুকে  
মৃত্যু ফলীককে সঙ্গত নহে অসঙ্গতকে আশ্ৰয় কৰিষা থাকে স্নেহ আদৰ কৰিষা  
স্বন্দৰ মুখকে চোৱাবমুখী বলে, মা আদৰ কৰিষা ছেলেকে দুই বলিষা মাৰে,  
সদাপুত্ৰ ভৱ'ন কৰে। স্বন্দৰকে স্বন্দৰ বলিষা যেন আকাঙ্ক্ষাৰ তৃপ্তি হয় না  
সেই সনাতন ধৰ্মকে ভালোবাসি বলিলে যেন ভাষাৰ কুলাইয়া উঠে না, সেইজন্ত  
সেই সত্যকথাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা সম্বন্ধ একেবাৰে হাল ছাড়িষা দিয়া ঠিক

‘কাহাদের বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে হয়, ‘তখন বেদনার অশ্রুকে হান্তচ্ছটায়’ গভীর কথাকে কোতুক পরিহাসে এবং আদরকে কলহে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে।’ তাই কবি যাকে ভালোবাসতেন, পরিহাস করতেন, নিন্দেও করতেন আবার ভক্তও ছিলেন এবং উলটো (বিপরীত কথা) কথা বলে যাকে আঘাত কবতেন সেই ভালোবাসার পাত্রাকে উপলক্ষ করে কবি কোতুক পরিহাসে নিজের জীবনের গভীর কথা প্রকাশ করেছেন। এবং শৈশব থেকে যৌবনের প্রাপ্তসীমা পর্যন্ত যে সব নর নারীরা ক্ষণকালের জ্ঞাত এসে কবির কাব্য জীবনে এবং কর্ম জীবনে যে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন সেই প্রিয় নর নারীদের উদ্দেশ্যে কবি কোতুকছিলে যৌবনের হিসাব নিকাশও দিয়েছেন। পরবর্তীকালে নিঃসঙ্গ কবি পশ্চিম-যাত্রীর ডাক্তারিতে অতীতের সেই প্রিয় নারীদের স্মরণ করে ‘ক্ষণিকা’র বিশ্লেষণ করেছেন (৫৮১ পৃষ্ঠা)। এবং পূর্ববর্তীতে অতীতের পূজারিণী নারী ‘ক্ষণিকা’কে কবিতায় রূপ দিয়ে তাঁর পরিচয়ও দিয়েছেন (৬ অক্টোবর ১২২৪)। ‘কবির অতীতের সেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভরা শেষ যৌবনের শেষ বসন্তের ক্ষণিকাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছেন যিনি ভৌর দীপশিখা<sup>২৩</sup> নিয়ে কবির জীবনে ক্ষণিকেব জ্ঞাত এসেছিলেন। কবি ভেবেছিলেন সেই নারীকে ভুলেই গেছেন কিন্তু এখন দেখছেন, তাঁর সেই ক্ষীণ পদধ্বনি কবির গানেব ছন্দে অধিকার করে রয়েছে, এবং তাঁরই বিরহের কথা কবির কাব্যে প্রকাশিত হচ্ছে। কবির হৃদয়ে ভালো-বাসার আঘাতে যে বাণী মুহূর্তের জ্ঞাত বেজেছিল কবি সেই অন্ধকারে খেমে যাওয়া বাণীবট সন্ধান করছেন। কবি নিজের অনৈব দিগে ভৌর সঙ্কুচিত ছোঁয়ায় সংকোচন নারীর হৃদয়কে উন্মোচন কবতে পারেন নি, তাই সেই নারীর গোপন হৃদয়ের রহস্য কবির স্বপ্ন দিয়েই উদ্ভাসিত করেছেন। ‘ক’ যদি অস্বপ্নিত হইবে চমকে না যেতেন (যেন সে হঠাৎ গাওয়া স্তম্ভ ছদ্ম বাস্তবিক, চক্ষু লাগল তোমাকেই-বাণিওয়ালা-শ্রামলী) এবং ক্ষিপ্রক্ষণের জ্ঞাত দাঁড়াতেন তবে দুজনের জীবনে যে চরম লক্ষ্য ছিল তাই নয়। পড়ে যেত এবং চিরকালের বাণী হয়ে আলোকে উদ্ভাসিত হত। কবির সেই অপূর্ণের লেখাগুলি এবং না বোঝার বাধাগুলি স্বপ্নের মূর্তি হয়ে আলোকে আবার কবির কাছে কাছে ফিরছে। আর সেই অচেনা নারী ক্ষণিকাকে আকুল হয়ে খুঁজছেন—‘জলভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল চকিত পদে।’ ইনিই কবির শেষ পূজারিণী নারী যিনি কল্যাণকর্মের প্রেরণাদাত্রী, যার ‘অবির্ভাব’ ক্ষণিকাতে যাকে অপরীক্ষা নারীরূপে স্রষ্টা করলেন ‘বলাকা’তে এবং ‘আহ্বান’ করলেন পূর্ববর্তীতে। তাই পূর্ববর্তীতে কবি ‘কৃতজ্ঞ’তার

সঙ্গে লীলালোকের লীলাসঙ্গিনী', প্রথম বসন্তের 'তারা' (তুমি-কাঁড় ও কোমল) 'ক্ষনিকা'কে স্মরণ করেছেন এবং 'শেষ অর্ঘ্য'ও ক্ষণিকাকে দিয়েছেন এবং শেষ বারের মতো কবি বসন্তের কলাগী রমণীকে 'আহ্বান' করে, 'শেষ বসন্ত'র কাছে বিদায় নিলেন। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবং জীবনীতে তাঁর শেষ যৌবনের শেষ বসন্তের রচনা ক্ষণিকার এত গুরুত্ব।

আজ সামনে যখন দেখি

ফুরিয়ে এল পথ,

পাথরের অর্থ আগ রইল না কিছুই।

সে প্রদীপ জ্বলছিল মিলন সন্ধ্যার পাশে (কিভি ও ধোতল)

সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে করে।

তার শিখা নিবল আজ,

সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে।

রবীন্দ্র কাব্যে 'শ্যামা' এবং অশব্দবী নারী 'শ্যামলী' ছাড়াও আরো কয়েকটি নারীকে কবির কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। কয়েকটি নারীকে কবি কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। কনি, কিশোর প্রেম এবং কৈশোরিকা কবিতাটি কবির নিষ্পেষিত কিশোর জীবনের প্রথম প্রণয় কাহিনী। 'হঠাৎ দেখা'তে কবি লিখেছেন—

“আমাদের গেছে যে দিন

একনায়েই কি গেছে,

কিছুই কি নেই বাকি।”

একটুকু বইলেম চুপ করে,

তারপরে বললেম,

“রাতের সব তারাই আছে

দিনের আলোর গভীরে।”

কবিও তাঁদের সবাইকে ধরে বেখেছেন তাঁর কাব্যগ্রন্থে তাঁর কবিতার মাধ্যমে, ভাষার অঞ্জলিতে। 'হাবাণো মনেব' শুধু কনক গৌর বর্ণ পা কুখানির কথা আছে, আর কবির ভালোবাসা—

যেন সেই আল-ভেঙে যাওয়া খেতের মতো

অনেক দিন হল চাষি যাকে

ফেলে দিয়ে গেছে চলে ;

## শেষ সাতাশের শেষ বসন্ত—

**প্রেরণাদাত্রী**—কবির তপস্বিনী নারী—‘বিদেশী ফুল’। ‘কেউ বা পথের বাঁকে’—কবি যখন বৃদ্ধ বয়সে বিদেশে যান তখন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে পরিচয় হয়। এই নারীর আন্তরিকতা ও সেবাপরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে কবি তাঁকে পূরবী কাব্যগ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন। তিনি কবির চিত্রকলার প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। কবি ‘অতিথি’ কবিতায় লিখেছেন—

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,  
মাধুর্য়স্বাস ; ক’ত সহজে কবিলে ‘আপনারি  
দূরদেশে পথিকেষে ;

আবার ‘বিদেশী ফুল’ কবিতায় সেই নারীকে প্রশ্ন কবে নিজের মনেব কথা বাক্য কবেছেন।

কহিলাম, ‘বোঝ নি কি তোমার পরশে  
হৃদয় ভেবেছে মোর রসে ?  
কেউ বা আমাবে চেনে এব চেয়ে বেশি,  
হে ফুল বিদেশী।’

অন্তর্জিহ্বায় লিখেছেন—

‘‘কোন অতিথি ছাবেব কাছে  
একলা রাতে বসে আছে ?’’  
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে  
মন শুধাল যবে  
বলেছিলেম, আব কিছু নয়,  
স্বপ্ন আমার হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি নিজের হৃদয়ের দৈন্ত্য সম্বন্ধে ‘আশঙ্কা’ প্রকাশ করে তপস্বিনী নারীকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন—

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি  
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,  
তবে সে যে দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে  
দৈন্ত্য আমার উঠবে ফুটে।  
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমায়িতে  
এমন কী মোর আছে দিতে।

তাঁই তো আমি বলি তোমাৰ নতশিৰে  
তোমাৰ দেখাৰ স্মৃতি নিষে  
একলা আমি যাব ফিৰে ।

কবির ‘তপস্বিনী নারী’ ষাঁও পৰশে কবির হৃদয় বসে পৰিপূৰ্ণ হয়েছিল তাঁকে শুধু,  
দেখাৰ স্মৃতি নিয়েই একলা দেশে ফিৰে আসলেন এবং ‘পূৰ্ববী’ কাব্যগ্রন্থখানি  
তাঁকে (বিজয়াকে) উৎসৰ্গ করলেন ।

### পূৰ্ববী কাব্যগ্রন্থ (চিত্তশিল্পী রবীন্দ্রনাথ)

কবির শেষ সাতাত্মের শেষ বসন্ত ১৯২৪-১৯২৫ ।

**পূৰ্ববী**—শেষ সাতাত্মের শেষ রাগিণী—কবির স্মৃতিত বসন্তের (ক্ষণিকা) শেষ  
গান ।

খোলো খোলো হে আকাশ, শুদ্ধ তব নীল ববনিকা,—

খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হাবাগো কণিকা ।

কবে সে যে এগেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,

গোধূলি—বেলার পাছ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,

লয়ে তাব ভৌক দীপশিখা ।

দিগন্তেব কোন পাবে চলে গেল আমার ক্ষণিকা ।

পূৰ্ববী কাব্যগ্রন্থে কবি স্মৃতিত বসন্তের (পরিচিত মানসভূমি—কড়ি ও কোমল, ক্ষণিকা) সমাপ্তি সংগীত গাইলেন এবং পশ্চিম-যাত্রাব ভাষাবিভে (১৯২৪-২৫) তার বিশ্লেষণ কবলেন । পূৰ্ববী ‘চাব’ কবিতায় কবি লাজুক হৃদয়েব গভীরতম প্রদেশের জনহীন প্রান্তবেব ছাব উদ্ঘাটন কবে ‘আনন্দের হাবাগো কণিকা’ ক্ষণিকাকে ‘আত্মান’ কবলেন । আব কবি নবযৌবনের দুৰ্লভ মুহূর্তে (প্রত্যুষ বেলাব মাহেন্দ্র ক্ষণে) যিনি স্বপ্নবৃত্তে এসে কবি স্তম্ভ যৌবনকে প্রথম জাগ্রত করেছিলেন, সেই নবযৌবনেব ‘তপোভঙ্গ’ দূত নববসন্তেব ‘ত’রা’ (তুমি-কড়ি ও কোমল) ক্ষণিকাকে ‘শেষ অঘা ও নিবেদন কবলেন । কবির এই নবযৌবনেব প্রথম ‘তপোভঙ্গে’র কাহিনী রয়েছে পূৰ্ববীতে । যা’ তিনি কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে বাবে বাবে এবং ফিবে ফিবে লিখেছেন । ‘বসন্ত বাবে বাবেই ফুলের সমাগোহ ভুলে গিয়ে শূন্য সাজ হাতে মনমনস্ক হয়ে উত্তরের দিকে চলে যায়, সেই ভুলের ফাঁকা বাস্তা দিয়েই ফুলেব দল তাদের নব জন্মের সিংহদ্বাব খোলা পায়’ (পশ্চিম-যাত্রাব ভাষাবি) । আবাব আত্মপরিচয়ে রয়েছে ২০২ পৃষ্ঠা), ‘পূৰ্বাতনই যুক্তাব মধ্য দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে এই তো

বসন্তের উৎসব।’ তাই কবি বসন্তের উদ্দেশ্যে শেষ কথা লিখেছেন—‘এ তো বড় আশ্চৰ্য, তুমি বাৱে বাৱেই প্রথম (নবীন), তুমি ফিৱে ফিৱেই প্রথম (নবীন)।’ এই প্রথমৰ উদ্দেশ্যেই (নববোধনের নববসন্ত) কবি পূৰ্ববী ৰাগিণীতে অতীত বসন্তের (কবিকা-:৩০৭) শেষ গান গেয়ে ‘শেষ বসন্তের’ কাছে বিদায় নিলেন—

ফেলে দিয়ো ভোৱে—গাঁথা ম্লান মল্লিকাৰ মালাখানি

সেই হবে স্পৰ্শ তব, সেই হবে বিদায়েব বাণী।

কাব্যগ্রন্থেব কবিতাগুলিৰ মধো এই তিনজন কাশ্যলক্ষ্মী ও দুইজন প্ৰেৰণাদাত্ৰী নাৰীৰ সঙ্গে কবিৰ বিভিন্ন সম্পৰ্কৰ ধাৰা এবং তাঁদেৰ চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট ভাবে প্ৰকাশিত হয়েছে। তাঁরা ছিলেন কবিৰ অত্যন্ত প্ৰিয় নাৰী, এই প্ৰিয় নাৰীদেৰ প্ৰেৰণাই কবিকে উদ্ভাপিত কৰে পূৰ্ণ বিকাশেৰ দিকে নিয়ে গিয়েছিল। তাই কবিৰ জীৱনে যে সব অসামান্য বিদূষী নাৰীৰা বিচিত্ৰৰূপিণী কবিৰ কাব্যে, সঙ্কীৰ্তে, চিত্ৰকলায় প্ৰেৰণা যুগিগেছিল, সেই অসামান্য নাৰীদেৰ দান এবং কল্যাণকৰ্মেৰ প্ৰেৰণাদাত্ৰী (একাকিনী) জামলী নাৰীৰ ভালোবাসা (অমৃতৰস, স্বৰণ ৫ সংখ্যক), কবি কৃতজ্ঞতাৰ সঙ্গে কাব্যেৰ মাধ্যমে স্বীকাৰ কৰে গৈছে।

“তাঁরা মস্ত বডো কিছুই নয়, তাঁরা দেখা দিগৈছে কেউ বা বনেৰ ছায়ায়” —কবিৰ প্ৰথমা প্ৰিয়া ‘কৈশোৱিকা’ যিনি কবিৰ কৈশোৰ জীৱনে এসেছিল, “কেউ বা নদীৰ ধাৱে”—কবিৰ স্নেহময়ী কৰুণাময়ী অসামান্য বিদূষী, আধুনিকা নাৰী যিনি কবিৰ শৈশবে প্ৰাণে ‘বাণী’ হাওে এসেছিল, “কেউ বা ঘৰেৰ কোণে”—কবিৰ প্ৰিয়সী পূজাৰ্হী কলাণী নাৰী যিনি কাঁবেৰ খোঁৱনে বসন্তবাতে<sup>২২</sup> ‘কম্পিত দীপশিখা’ নিয়ে এসেছিল, “কেউ বা পথেৰ পাঁকে”—কবিৰ তপস্বিনী বিদেশী ফুল, যিনি কবিৰ পূৰ্ণ বয়সে এসেছিল। কবি এই নাৰীদেৰ দান স্বৰণ কৰে তাঁদেৰ উদ্দেশ্যে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

তোমাৰা এসেছ এ জীৱনে

কেহ প্ৰাণে, কেহ ৰাণে, বসন্তে, শ্ৰাৱণ-বৰষুণে,

কাৰো হাতে বাণী ছিল কেহ বা কম্পিত দীপশিখা।

এনেছিল মোৰ ঘৰে, বাৰ খুলে দুৱন্ত ঝটকা

বাৰ বাৰ এনেছ প্ৰাঙ্গনে। যখন গিগৈছে চলে

দেবতাৰ পদচিহ্নেৰেখে গৈছ মোৰ গৃহতলে।

আমাৰ দেবতা নিল তোমাদেৰ সকলেৰ নাম,

ৰহিল পূজাৰ মোৰ তোমাদেৰ সবাৱে প্ৰণাম।

**রবীন্দ্রনাথের যৌবনের মাত্রসভূমি ১৮৮৪-১৯০০**

**ভাব কল্পনার অসম্পূর্ণ নারী—‘মানসী’ ।**

সূচনা—গাজীপুর ১৮৮৮ বৈশাখ । সমাপ্তি ২৮ অক্টোবর যুবোপ-যাত্রীর ডায়াবী ও আমার স্বপ্ন (১৮৯০, ১১ কার্তিক) মানসী কবিতায় ।

উৎপত্তি—বাহিবে বিবহ ধনি ও অন্তবে আনন্দ ধনিব মিলিত স্থখোচ্ছ্বাসেব মধ্যে (বিবহানন্দ) মানসী (মুতিমতী মর্ষের কামনা) কাব্য গ্রন্থখানি রচিত ।

**পুজারিণী নারী—‘ক্ষণিকা’ ।**

সূচনা—যুবোপ-যাত্রীর ডায়াবি ২৬, ২৭, ২৮ আগষ্ট ১৮৯০ সাল রাত ৩টা । কবি সূর্যদ লোকেন পালিতই কবি একমাত্র একু যিনি ক্ষণিকাকে সূচনায় দেখেছিলেন । এবং চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে প্রিয়নাথ সেনেব ‘ক্ষণিকা’ সম্বন্ধে সরস মন্তব্য অল্পধাবন যোগ্য । সমাপ্তি—১৮০৭ শিলাইদহে । উৎপত্তি—ক্ষণিক থেকে । কালের পটভূমিকায় (যুবোপ-যাত্রীর ডায়াবি) ক্ষণিকাকে সৃষ্টি করে কাব্যগ্রন্থ দুটি উৎসর্গ করলেন লোকেন পালিতকে । আর তার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন প্রিয়নাথ সেনকে চিঠিপত্র ৮ম খণ্ডে । অসম্পূর্ণ মানসী থেকে সম্পূর্ণ ক্ষণিকা পর্যন্ত শিল্পী কবির শিল্পকর্মেব সৃষ্টিভূমি এবং মানসভূমি । এবং কবির লীলালোকেব লীলাক্ষেত্র যা ‘অজানাব ঘের ও অপ্রকাশেব পর্দা’ (শেষ সম্বন্ধ নমু সংখ্যক) দিয়ে ঘেরা ।

## কবির প্রকৃত জীবনী

**আত্মপরিচয়**—কাব্যের মাধ্যমে, অশরীরী নারীর মাধ্যমে ।

**অধরা ও বাংলাদেশের স্নেহ**—বৃদ্ধ বয়সের অজানা মানসভূমি ।

### —ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া—

সেদিন অশ্রুধৌত সোম্য বিষাদের

দীক্ষা পেলে তুমি ;

নিজের অন্তর আঙ্গিনায়

গড়ে তুললে অপূৰ্ণ মূর্তিখানি

স্বর্গীয় গরিমায় কাস্তিমতী ।

যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী

তার বসরূপটিকে আসন দিলে

অনন্তেব আনন্দমন্দিরে

ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে ।

আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,

আজ তুমি হগেছ কবি,

ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া

বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে

বিরহের বীণা হাতে ।

আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি

বিশ্বের কাছে উৎসর্গ-করা ।

(শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক)



## রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের ম্যাসভুস্মি ১৯১৪—১৯৩৫

### অশরীরী নারী—‘অধরা’ ।

অগৌরবা নারী—বলাকা পাঁচ সংখ্যক, আরোগা সাতাশ সংখ্যক ।

সূচনা—রামগড়ে ১৯১৪—১৯১৬ বৈশাখে মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত বলাকা কাব্যগ্রন্থে ।

উৎপত্তি—মৃত্যুর রূপকে ভেঙে সৃষ্টি করলেন ‘খানোছবা প্রিয়া’ অধরাকে (শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক, বলাকা ৪৪ সংখ্যক, বলাকা-কাব্য পরিক্রমা ১৫১ পৃষ্ঠা) ।

### শ্যামলী নারী—‘বাংলা দেশের মোয়’ ।

সূচনা—কবির পঁচাত্তরতম জন্মদিবসে ১৯৩৫ সালে ।

উৎপত্তি—শেষ বেলাকার মাটির ঘর ‘শ্যামলী’-তে (শেষ সপ্তক চুয়াল্লিশ সংখ্যক) ।

পরিচয় দিয়েছেন শ্যামলী কাব্যগ্রন্থে ‘বাঁশি ও আলাতে’ ।

## কবির প্রকৃত জীবনী

### আত্মপরিচয়—কাব্যের মাধ্যমে

কবি জীবনযুদ্ধে ‘কড়ি ও কোমল’ পর্যন্ত গন্তের মাধ্যমে রচনা করেছেন যা কবির জীবনের ছবিমাত্র মংপুতে রবীন্দ্রনাথ । তারপর বহুজনের অস্বাভাবিক সংস্পর্শে তিনি জীবনচরিত রচনা করেননি কিন্তু কাব্যের মাধ্যমে কবি-জীবনী যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাই ‘আত্মপরিচয়’ রূপে লিখে গেছেন । অর্থাৎ যৌবনে সংশয়ের আবেগের মধ্যে মানসী কবি মন যে ভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে সেই ভাবগুলি তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবিতায় ধরে রেখেছেন । এবং এই বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি একটির সঙ্গে আর একটি যুক্ত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পদে পদে বাড়িয়ে কমিয়ে এগিয়ে চলেছে । এই কবির জীবনের একটি পর্বের সঙ্গে আর একটি পর্ব যুক্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথেরই অপ্রকাশিত জীবনের কাহিনী রচিত হয়েছে (আত্মপরিচয় ১৬৭১-৭৮ পৃষ্ঠা, রবীন্দ্র বচনাবলীর ভূমিকা, ১০০ বঙ্গাব্দ । এই যৌবন কাহিনীই কবির ‘স্বপ্নবর্ণনামূলক জীবন’ অথবা ‘সত্যিকারের জীবন যা অপ্রকাশের পর্দার মধ্যে ও অজানার ঘেবেব মধ্যেই রয়ে গেছে (মানসী পূর্ববী) ।

### আত্মপরিচয়—অশরীরী নারীর মাধ্যমে ১৮০ পৃষ্ঠা ।

কবি সৃষ্ট অশরীরী নারীমূর্তি সম্বন্ধে ‘আত্মপরিচয়ে’ যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ব্যাখ্যার ভিতর দিয়েই কবি প্রচ্ছন্নভাবে নিজের জীবনী প্রকাশ করেছেন ।

আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—‘কোন গীতিকাব্যরচয়িতার কোন কবিতা ভালো, কোনটা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিধ কোন বাণীকূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশ শক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

জগতের মধ্যে যাহা অনির্বচনীয় তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন লাভ করিয়া থাকে—জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে—যাহা চোখের সম্মুখে মূর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে—যাহা অশরীর ভাবরূপে নিরাক্রম হইয়া ফিরে তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। এই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।’

### রোম্যান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ—

কারুশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস,

আনি তাঁরি জাহ্নব পরশ।

জানি, তার অনেকটা মায়া,

অনেকটা ছায়া।

আমারে শুধাও যবে ‘এরে কভু বলে বাস্তবিক?’

আমি বলি, ‘কখনো না, আমি রোম্যান্টিক’ (নেবজাতক)।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রোম্যান্টিক কবি। তাই কাব্যগ্রন্থে সৃষ্টি করলেন মানসী কণিকা এবং অশরীরভাবরূপে অথবা ও বাংলা দেশের মেয়ে। শিল্পী ও স্রষ্টা কবি প্রথম যৌবনে অজ্ঞানার ঘেরের মধ্যে অপ্রকাশের পর্দা টেনে রূপ রস ও অমুখ্যগের ধারা দিয়ে অসীমের সীমাকে সৃষ্টি করলেন ‘ভাব কল্পনার মানসীর মধ্যে—‘আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে/গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা।’ কবি-কল্পনার এই অসম্পূর্ণ মানসী প্রতিমা, কবির জীবনে বহু দ্বিধা দ্বন্দ্ব ও বাত

প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শেষ যৌবনে ‘পূজারিণী নারী’ রূপে কণিকাতে সম্পূর্ণ হল (১৩০৭)। কণিকার বিনাশের পর বিরহী কবি কালের আলোতে (বলাকা ১২১৪) মৃত্যুর রূপকে ভেঙে ধানের মাধ্যমে মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় সৃষ্টি করলেন তাঁর অজানা মানসভূমি ‘খানোন্তবা শ্রিয়া’ অধরাকে। কবি অধরাকে সৃষ্টি করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ‘মহয়া’তে প্রেমকে অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তিতে জাগ্রত (উজ্জীবন) করলেন। এবং তার ধানের ধনখানি ও প্রেমের শাখত বাণী বিখের কাছে উৎসর্গ করে সীমার মধ্যে অসীমের আনির্ভাব জানালেন—

জানি না তোমার নাম

তোমায়েই সঁপিলাম

আমার ধানের ধনখানি ॥

**উজ্জীবন** (মহয়া)—মুর্ছা ব’ অট্টোত্তর পর চৈতন্য লাভ। মৃত্যু হতে, ভস্ম-অপমানশয্যা হতে অতত্বকে (প্রেমকে) নীরের তত্বতে ‘উজ্জীবন’ (জাগ্রত) করে ‘অসমাপ্ত’ ‘বরণভালা’ খানি খাবার নূতনভাবে সাজালেন। অগ্নি, অতীত ‘বসন্তে’র শ্রামাসুন্দরীকে (কৃষ্ণকলি—কণিকা) নব পরিচয়ে নব রূপে ‘বোধন’ করে কবি নূতনভাবে যাত্রা শুরু করলেন (২২ ফাল্গুন ১৩৩৭ দোল পূর্ণিমা)।

কবি দিনশেষের ধূসর সন্ধ্যাব স্নান আলোব মধ্যে বসন্তের নবজাগরণের ছবিটি এঁকে অতীত বসন্তকে (কড়ি ও কোমল, কণিকা) নব পরিচয়ে নব রূপে ‘পুনরুজ্জীবিত’ করলেন। তাই মহয়া কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদপটে একদিকে রয়েছে দিনশেষের স্নান আলোর মধ্যে কবির নামটি, অণুদিকে রয়েছে বসন্তের (সবুজ রং) নব জাগরণের মধ্যে (উজ্জীবন) ‘মহয়া’ নামটি—

কানে কানে কহি তোরে

বধূরে যেদিন পাব, ভাকিব মহয়া নাম ধরে ।

কবির শেষ জীবনে এই অধরাই আবার প্রথম যৌবনের ‘বাংলা দেশের মেয়ে’ রূপে দেখা দিল (১৯৩৫, ২৫ বৈশাখ)। কবি প্রথম যৌবনের ভাব কল্পনার মানসী ও পূজারিণী নারী কণিকাকে অশরীরী নারী রূপে রূপান্তরিত করে তাকে নানাভাবে সাজিয়ে কবির কাব্যে অপরূপ নারী মূর্তিতে সম্পূর্ণ করে তুলেছেন।

‘এঁকেছি বুকের রক্তে মানসীর ছবি বার বার

কণিকের পটে ’

**রোম্যান্টিক প্রেমিক**—কল্পনাশ্রবণ, রোম্যান্টিক প্রেমিক (নব-জাতক) শিল্পী রবীন্দ্রনাথ নিজের এই সৃষ্টি কর্মের বিশ্লেষণ করে পশ্চিম-যাত্রীর-ভাষ্যরিতে ৫১১ পৃষ্ঠা লিখেছেন—‘যেয়েদের সৃষ্টির আলো যেমন এই প্রেম তেমনি পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি। পুরুষের চিত্ত আপন ধ্যানের দৃষ্টি দ্বিধে দেখে, আপন ধ্যানের শক্তি দিয়ে গড়ে তোলে। We are the dreamers of dreams—এ কথা পুরুষের কথা। পুরুষের ধ্যানই মানুষ্যের ইতিহাসে নানা কীর্তির মধ্যে নিরন্তর রূপপরিগ্রহ কবছে। এই ধ্যান সমগ্রকে দেখতে চায় বলেই বিশেষের অতিবাহলাকে বর্জন করে; যে-সমস্ত বাজে খুঁটিনাটি নিয়ে বিশেষ, সেইগুলো সমগ্রতাব পথে বাধার মতো জমে ওঠে।’

‘পুরুষের এই সমগ্রতাব পিপাসা তাব প্রেমেও প্রকাশ পায়। সে যখন কোনো মেয়েকে ভালোবাসে তখন তাকে একটি সম্পূর্ণ অখণ্ডতায় দেখতে চায় আপনার চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে, ভাবেব দৃষ্টি দিয়ে। পুরুষের কাব্যে বার বার তার পরিচয় পাওয়া যায়। শেলিব এপিসিকৌডিয়ন্ পড়ে দেখো।’

আবার বহু বৎসব পূর্বে ছিন্নপত্রের (১২৭ পরিচ্ছেদ) কবি একই কথা লিখেছেন—‘সেদিন শঙ্করাচার্যর আনন্দলহরী বলে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম, তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে জ্ঞান মূর্তিতে দেখেছে—চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই জ্ঞান সৌন্দর্যের পরিচয়ান্তর দিয়েছে—অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তরে একটা ধর্মোচ্চাসে পরিণত কবে তুলেছে। বিহারী চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল মংগীতটাও ঐ শ্রেণীর। শেলিব এপিসিকৌডিয়নেরও ঐ অর্থ। কীটসেব অধিকাংশ কবিতা পড়লে মনে ঐ ভাবটার উদ্ভেক হয়।’

কবির গীতিকাব্যেও এই ভাবটাই রয়েছে। তাই শ্রেষ্ঠ প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ চিত্তের দৃষ্টি দিয়ে ভাবের দৃষ্টি দিয়ে অল্পবয়সের ধারা দিয়ে নব যৌবনের শরৎ-পর্যায়ের শরৎ-লক্ষ্মীর বন্দনা করেছেন মানসী মূর্তিতে এবং দুবের শরৎ কালের স্মৃতি বার বার উল্লেখ করেছেন তাঁর ‘পথে ও পথের প্রান্তে’। আর, ক্ষণিকের পরবর্তী অধ্যায়ে শ্রামলী নারীর নৌন্দর্যকে বিগ্ৰহরূপে দিয়ে বিখলস্মারূপে বন্দনাকরেছেন তাঁর কাব্যে সাহিত্যে ও গানে—

**‘গৃহলক্ষ্মী দেখা দাও বিশ্বলক্ষ্মী হয়ে।’**

**রবীন্দ্রকাব্যে অশরীরী নারী ‘অধরা’**—কবির ধ্যানোদ্ভবা

প্রিয়া (শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক)—বৃদ্ধ বয়সের অজানা মানসভূমি।

**উৎপত্তি**—বলাকা কাব্যগ্রন্থে মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় (১২১৪)। কবি  
যুত্মর রূপকে ভেঙে সৃষ্টি করলেন অরূপ নারী অধরাকে—

যুত্মা যে তার পাত্রে বহন করে  
অমৃত রস নিত্য তোমার তরে,  
বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া  
মরণ-ঘোমটা টানি।  
সেই আবরণ দেখে উতারিয়া—

মুগ্ধ সে মুখখানি। (বলাকা ৪৪ সংখ্যক)।  
রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় অধরার পরিচয় পাওয়া যায়। শেষ সপ্তক তেরো  
সংখ্যক, আটত্রিশ সংখ্যক, মাটিতে আলোতে (বীথিকা), শেষ দৃষ্টি (নব জাতক),  
দূরের গান, অধরা (মানাই), দৈত (আমলী), জন্মদিন (সৈঁজুতি), আরোগ্য সাতাশ  
সংখ্যক, জন্মদিন নয় ও এগারো সংখ্যক প্রভৃতি কবিতায় মরণ-ঘোমটার আবৃত  
(মুখ ঢাকা বধু) মানিনী প্রিয়ার কাহিনী (কবিপ্রিয়া-উর্মিলা দাশ ৪৩ পৃষ্ঠা)  
প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে। যাকে কবি নামের বাঁধনে বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন আরোগ্য  
সাতাশ সংখ্যক কবিতায়—

বাক্যের যে ছন্দোজাল শিখেছি গাঁথিতে  
সেই জালে ধরা পড়ে  
অধরা যা চেতনার সতর্কতা ছিল এড়াইয়া  
অগোচরে মনের গহনে।  
নামে বাঁধিবারে চাই, না মানে নামের পরিচয়।  
মূল্য তার থাকে যদি  
দিনে দিনে হয় তাহা জানা  
হাতে হাতে ফিরে।

কণিকার বিনাশের পর কবি ‘ধ্যানোন্মত্তা প্রিয়া’ অধরাকে সৃষ্টি করে বিশ্বের কাছে  
উৎসর্গ করে দিলেন—

ধ্যানোন্মত্তা প্রিয়া  
বন্ধ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে  
বিরহের বীণা হাতে।  
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি  
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ করা।

কবি নিজেকে বিরহী বন্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন—

হে বন্ধ, সেদিন প্রেম তোমাদের

বন্ধ ছিল আপনাতেই

পদ্ম কুঁড়ির মতো

বিরহী বন্ধ যেমন রামগিবিতে নির্ধাসিত হয়েছিল, বিরহী কবিও তেমনি রামগণ্ডে ব্যথার মধ্যে সৃষ্টি করলেন তাঁর ‘খানোস্তবা প্রিয়া অধরাকে’।

এই অধরাই বিচিত্রিতাতে কবির ‘ছায়াসঙ্গিনী’ রূপে বর্ণিত হয়েছে। অশরীর ভাবরূপে স্বপ্ন রুদ্ধ (স্বপ্ন ঘেবা) বাণী নিয়ে এবং অভিমানের অশ্রুজল নিয়ে (স্তুম্ভিত স্থিমিত) যিনি কবির কাব্যে ও জীবনে ছায়ার মতন ফেয়েন তিনিই ছিলেন কবির ‘ছায়াসঙ্গিনী’ (মুখ ঢাকা বধূ) অথবা জীবনের প্রথমা ফাস্তুনী (বসন্তের প্রথমা নারী)। ‘দ্বারে’ কবিতায় লিখেছেন, এই স্বপ্নভাবী (মৌন ভাষা-মানসী) অভিমানী নারীর চোখের জলই অজ্ঞাত কান্দন) স্মৃশ্রুতম আচ্ছাদনের মতো কবির জীবন ও কাব্যকে কঠিন ভাবে বেঁধে রেখেছিল। এই কারণেই পরবর্তী জীবনে মন চাইলেও কবি দূরের ডাকে সাড়া দেন নি (শুধু দেখার স্মৃতি নিয়েই চলে এসেছিলেন)।

‘স্মৃশ্রুতম সেই আচ্ছাদন,

ভাষাহারা অশ্রুহারা অজ্ঞাত কান্দন।

দুর্লভ্য—যে সেই মানা

স্পষ্ট বারে নেই জানা।

সবচেয়ে শুকঠিন অবন্ধ বাঁধন’ (দ্বারে-বিচিত্রিতা)।

আবার বলাকা ৪২, ৪৩, ৪৪ সংখ্যক কবিতায় কবি নিজেরই অন্তরের গভীরতম কথা প্রচ্ছন্ন ভাবে কবিতায় লিখে গেছেন।

‘অধরাতে দেখা দিবে বারেরবারে তারি মুখ নিভ্রাহীন চোখে

রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।

বারে বারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকাবে বাজিবে হৃদয়ে

বারেবারে-ফিরে আসা হয়ে।’

**অধরা**—যাহাকে ধরা যায় নাই। কবিকে যেমন কোনো নারী বেঁধে বা ধরে রাখতে পারেন নি, কবিও তেমনি অধরাকে ধরতে পারেন নি, তিনিও কবির কাছে চিরকাল বিদেশিনীর মতো অপরিচিতা ও অচেনা হয়ে রয়ে গেলেন (ছিন্ন-পত্র ১৩০ সংখ্যক)। কবি বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা (৮০ পৃষ্ঠা) অধরার উদ্দেশ্যে

বলেছেন—‘এই না-ধরা দেওয়া বনের হরিণকে বাঁধতে গিয়ে রামচন্দ্র কম ছুঃখ পান নি। ঘরের লক্ষ্মী হারিয়ে বনে বনে কঁদে বেঁটিয়েছেন। এই সব অধরাকে ধরতে গিয়ে হতভাগ্য কবিদেরও কম দুর্দশা পেতে হয় না। আমার মনের কথা মনেই রইল। Subjective কে Objective করা গেল না। লোহিত সাগরের দিকে যাচ্ছিলাম। অপক্লপ সূর্যাস্ত হলো। মনে হোলো এমন অপক্লপ রমণীয় তাকে তো ধরা গেল না। এই চঞ্চলাকে যে ধরতে পারলাম না সেই বেদনা ক্রমাগত মনকে ব্যথা দিতে লাগল।’

তাই পরবর্তীকালে কবি লোহিত সাগরের এই সূর্যাস্তেব রং ধরে রাখলেন চিত্রকলায়—নিজেব বেদনার্ত প্রতিক্রিয়াতে এবং বিষন্ন নারীমূর্তির মুখের উপরে ‘এই আলো এই শান্তি কেবল চেয়ে দেখবার এবং মুগ্ধ হবার জন্তে নয়, কিন্তু মাহুঘের ভালোবাসার উপরে এই আলো ফেলবার জন্তে’ (য়ুরোপ-যাত্রীর-ভাষারী) এবং অধরাকে ধরে রাখলেন ছন্দের বাঁধনে—

অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে

এ যৌব ছন্দবন্ধনে।

যদিও কবি অধরাকে ছন্দের বাঁধনে ধরে বেঁটিয়েছেন, কিন্তু বিশ্বের কাছে তিনি অখ্যাতি, অনাদৃত্য নারী হগে রয়ে গেলেন। এই অখ্যাতি নারীর দানই কবির সাহিত্যের ‘ভাষা মহাদীপে প্রাণহীন প্রবালের মতো’ রয়ে গেল।

অকস্মাৎ পরিচয়ে বিশ্বয় তাহার’

ভুলায় যদি বা,

লোকালয়ে নাহি পায় স্থান,

মনের সৈকততটে বিকীর্ণ সে রহে কিছুকাল,

লালিত যা গোপনের

প্রকাশের অপমানে

দিনে দিনে মিশায় বালুতে।

পণ্যহাটে অচিহ্নিত পরিত্যক্ত রিক্ত এ জীর্ণতা

যুগে যুগে কিছু কিছু দিয়ে গেছে অখ্যাতির দান

সাহিত্যের ভাষা—মহাদীপে

প্রাণহীন প্রবালের মতো।

**বিশ্বযুদ্ধ**—মহাযুদ্ধের পটভূমিকাতে কবি রামগড়ে সৃষ্টি করলেন অজানা মানসভূমি অধরাকে। বলাকায় তাঁর কাব্যজগতের ধ্বংসপ্রাপ্ত মানসভূমিকে

বিখ্যুতের পটভূমিকায় রেখে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিখ্যুতের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পুরাতন মতবাদ ও প্রাচীন সংস্কার সব পরিত্যাগ করে মানব জাতির নব যুগের অরুণোদয়ের যে আভাস পূর্বাকাশে দেখা দিয়েছিল, সেই যুগসন্ধির বিশ্লেষণের মাধ্যমে কবি তুলনা করেছেন তাঁর কাব্যজগতের বিরহী কাব্যতরঙ্গীকে (বলাকা ৫ নং)।

### বলাকা কাব্যগ্রন্থ—অধরার সূচনা—মহামানব রবীন্দ্রনাথ।

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম

আপনার রূপ,

চিনিলাম আপনারে

আঘাতে আঘাতে

বেদনায় বেদনায় ;

সত্য যে কঠিন

(সত্য প্রেম-মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)

কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,

সে কখনো করে না ঝুঁক।

কণিকার বিনাশের পর কবি শূন্য মন (উৎসর্গ ২৩ সংখ্যক), ও শূন্য কাব্যতরঙ্গী (বিরহী নেয়ে—বলাকা পাঁচ সংখ্যক) নিয়ে একটা ব্যথার মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন। কবি লিখেছেন—‘মীরা ও বোমা আছেন সঙ্গে। আমার মনের মধ্যে একটা দারুণ বেদনা। সে সব কথা তাঁরা জানবেন কেমন করে? তার কিছু খবর জানতেন এণ্ড্রু জ সাহেব। তিনি যখন রামগড়ে আমার কাছে এসে আমার সমস্তের কথা জিজ্ঞাসা করলেন তখন আমি আমার বেদনা তাঁকে জানালাম।’ কবির এই বেদনার মধ্যেই যুদ্ধের বার্তা এসে কবিকে আরও ব্যাধিত করে তুলেছিল। কবির কাব্যজগতের সর্বনাশের সঙ্গে বিখ্যুতের সর্বনাশ ও এফই সঙ্গে উপস্থিত হল। ‘অস্তরে বা বাহিরে যদি সে সর্বনেশে আসে তবে কেমনতরো হবে তার অভ্যর্থনা?’ অস্তরের যত্নাযুক্ত এবং বাইরের বিখ্যুত এই দুই প্রব বেদনার মধ্যেই বলাকা কাব্যগ্রন্থখানির স্রষ্টা। বলাকাতে কবি, কাব্যজগতের ধ্বংসপ্রাপ্ত মানসভূমিকে বিখ্যুতের পটভূমিকায় রেখে বিশ্লেষণ করেছেন। বলাকা-কাব্য-পরিক্রমার গ্রন্থ ভূমিকায় (৬৩ পৃষ্ঠায়) বলেছেন—‘এই কবিতায় আমার কথা, আমার ধ্বনিকে চাপা দিয়ে, তাঁর ধ্বনিই জয়ী হয়েছে। বিশাল পদ্মার কুলভাঙা বিপুল জলরাশি



যেন একটা সংকীর্ণ খালের দুইকূল ভেঙেচুরে তার উপর দিয়ে ভীষণভাবে বয়ে গেল। তেমনি আমার ছোট কথা, আমার সুখদুঃখ, আমার ছোট আয়োজন সব উলট-পালট কবে দিয়ে বিশ্ববিধাতা তাঁব বিশ্ববাণী বাজিয়ে নিলেন।'

বলাকালেই কবি প্রথম মৃত্যুজ্ঞানিত দুঃখ বেদনার মধ্যে আসন্ন নবযুগের রক্তাভ অকণোদয়ের আভাস পেলেন। সেজন্য তাঁর মনের মধ্যে একটা অকারণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছিল। বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা গ্রন্থ-ভূমিকায বলেছেন 'মানবাত্মাব নতুন অভিযান (adventure) যে আসচে তার সূচনা যেন পাচ্ছি। অনেক দুঃখের এই অভিযান, বহু দুঃখ-বেদনা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই অকণোদয়।' হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে দিয়ে এই নবাক্ষরের অর্থা বচনা করতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। এই অর্থা বচনা করতেই হবে। সর্বনেশে যুগ-সন্ধি সমাগত। প্রিয়তম পতিকে গ্রহণ করতে হলে নববধুকে যেমন পিতৃগৃহের সব কিছু অতিপ্রিয় অভ্যস্ত সর্ববিধ আচার-বিচার-আগ্রাম ছেড়ে নবরক্তাট্টাস্বরে অজানা সংসার-যাত্রার জন্ত ঘরের বাইরে প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াতে হয়, তেমনি আমাদেরও আজ শুধু পুরাতন মতামত নয় প্রাচীন সব আচার-বিচার-সংস্কাব ত্যাগ করে যুগ-যুগান্তরের কর্ণধার পতির হাৎ ধরে অজানার পথে যাত্রাব জল প্রস্তুত হয়ে বাইবে এসে দাঁড়াতে হবে।' কবি ২য় নং কবিতায় আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। 'আজ দুঃখের মরণের আফ্রানে নিকন্দ্রেশের ভাক সেই অপরিচিত জরাজীর্ণ অভ্যাসের মূলোচ্ছেদ হল। চিরপরিচিত সংস্কাবের ভিত্তি হল অভ্যস্ত নিদিষ্ট আশ্রয়।'

মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় মানবাত্মার সঙ্গে কবির অন্তরাত্মারও চিবপরিচিত জরাজীর্ণ সংস্কাবের মূলোচ্ছেদ করে নতুন অভিযানের কথা বিশ্লেষণ করেছেন। কবি এই প্রথম তাঁর অন্তরাত্মাকে পরিচিত মানসভূমি (নিদিষ্ট আশ্রয়) থেকে অপরিচিত অজানা মানসভূমির দিকে নিয়ে গেলেন এবং এই আনন্দ যাত্রায় প্রেমের অর্থা দিয়ে তাঁব সূচ কাব্যতরঙ্গীকে (বিবহী নেয়ে বলাকা ৫ নং কবিতা) পূর্ণ করলেন। কবির অন্তরাত্মার পরিচিত মানস ভূমি ত্যাগ করে অপরিচিত অজানা মানসভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রাকে পতিগৃহে যাত্রার সঙ্গে তুলনা করেছেন। একেই তাঁর কাব্য জগতের 'সর্বনেশে যুগ সন্ধি সমাগত' বলে লিখেছেন। এই নতুন সৃষ্টি অজানা মানসভূমি 'অশ্রুদীপ্ত নারী অধরার' জন্ত কবির উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। কাব্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও জীবনে দেখা যায় জীবিত নারীরাই ছিলেন কবির কাব্যলক্ষ্মী ও প্রেরণাদাত্রী। তাই কড়ি ও কোমলে কবি মৃত্যু দুঃখের মধ্যেও পুণাতনকে বিদায় দিয়ে নতনের উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

সে কি চায় শুক বনে গাহিবে বিহঙ্গগণে  
 আগে তারা গাহিত যেমন ?  
 আগেকার মতো করে স্নেহ তার নাম ধরে  
 উচ্চসিবে বসন্ত পবন ?  
 নহে নহে সে কি হয় ! সংসার জীবনময়  
 নাহি হেথা মরণের স্থান ।  
 আয় রে নূতন আয়, সঙ্গে করে নিষে আয়,  
 তোর স্বথ, তোর হাসি গান ।

কিন্তু কবিকার বিনাশের পর কবির কেবল মতামত নয় প্রাচীন সংস্কার প্রভৃতি যা কিছু প্রিয়, সব পিতৃগৃহের মতো ত্যাগ কবে নবরক্তপট্টাধরে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অশরীরী অদেখা দূত অধরাকে গ্রহণ করলেন । এই অধবাই এবার কবির কাব্যলক্ষ্মী ও প্রেবণাদাজী হয়ে ‘সজলনীল-জলদবষণ বসনখানি গায়ে’ দিয়ে (আমলী নারী) ‘মুখ ঢাকা বধু সেজে’ গোপনে দেখা দিলেন । এটাকেই কবি অপরিচিত সর্বনেশে বলে উল্লেখ কবেছেন ; অজানা বলে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ কবেছেন । বলাকার কয়েকটি কবিতা কবি রামগড়ে রচনা করেন । তিনি লিখেছেন ‘এই জ্যৈষ্ঠ হতে ১২ই জ্যৈষ্ঠেব মধ্যে আমার দুই, তিন চার নম্বক কবিতা একে একে এলো । বলাকার মতোই একে একে এরা আমার মানসলোক হতে বেদনাহত হয়ে কোন্ নিকদ্দেশে যাত্রা করেছে । এদের মধ্যেও ভিতরে ভিতরে বলাকার মতোই একটি পংক্তিগত যোগ রয়েছে তাই এই কবিতাগুলির বলাকা নাম সার্থক হয়েছে ।’

চিড্রা এবং বলাকা এই দুই কাব্যগ্রন্থ কবির জীবনে ও কাব্যে তাঁব গতি পরিবর্তনের নির্দেশক রূপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে বয়েছে । চিড্রা কাব্যগ্রন্থটি যেমন মানসীর অন্তর্ভব্দ থেকে বাস্তবের আঘাতে মুক্ত হয়ে সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছিল (আত্মপরিচয় ২০৩, ২০৪ পৃষ্ঠা), তেমনি বলাকা কাব্যগ্রন্থটি কবিকে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়ে অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অধরার উদ্দেশ্যে এবং মৈত্রী ও মানবকল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল । ‘বলাকা’ নামের মধ্যে কবির এই ভাবটি নিহিত রয়েছে, যে, হংস বলাকা তাদের পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন সিন্ধুতীরে অতীত এক বাসার দিকে উড়ে চলেছে, সেই ভাবে কবিও পরিচিত মানসভূমিকে ছেড়ে অশরীরী নারী অধরার উদ্দেশ্যে, অজানা মানসভূমিতে পাড়ি দিলেন । বলাকা-কাব্য-পরিচয় ৩৬ নং কবিতায়

রয়েছে—‘বিয়ের বা কিছু সবই বলাকার মত উড়ে চলেছে, আমার আপন অন্তরের সব আশা আকাঙ্ক্ষাও তখন সেই সঙ্গে উধাও হয়ে চলেছে। এয়া সব কোথায় চলেছে কে জানে? আমি বসে বসে নিখিলের সব পাথার ঝাপটে একই বাণী শুনিচি।’

হেথা নয়, হেথা নয়

আর কোনো খানে।

‘হেথা নয়’ তো বুঝলাম; কিন্তু সেই ‘আর কোনো খান’ যে কোথায় তা কে জানে? (কবির মন্তব্য)।

বলাকার পাথার ঝাপটের শব্দে নিখিলের স্তম্ভতাকে ভেঙে যে গতির বাণী ছুটে চলে গেল, সেই পাথার তরঙ্গাঘাত কবির অন্তরে বেগের সঞ্চারণ করে কবির মনে চলার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিল। রবীন্দ্রনাথ চিরকাল গতির উপাসক, তাই তাঁর কাব্যেও ধরা পড়ে এই গতির বাণী। প্রথমবার এই গতি কিছুটা ব্যহত হয় কল্পনাব ‘ভূ:সময়ে’। সেই সময় কবি লিখেছেন—‘বন্ধ করো না প’খা’। (বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ১২ পৃষ্ঠা)। আবার এই গতি রুদ্ধ হয়ে আসে গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, গীতালি কাব্যগ্রন্থ লেখার পরেই। তাই কবি ব্যথার মধ্য দিয়ে বলাকাতে মৃত্যুর রূপকে ভেঙে তাকে নব নব রূপে রূপান্তরিত করে তাঁর কাব্যের গতিকে প্রবাহিত করে দিলেন। এবং বিশ্ব ও বিশ্বমানবের কল্যাণধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমে উপনীত হলেন।

‘মৃত্যুর মধ্যে ডুব দিয়েই সীমা পায় অসীমত্বের অমৃত আশীর্বাদ। মৃত্যুর ভয়ে রূপ যদি তার গতি ছেড়ে দিয়ে অচল স্থবির হয়, যদি সে তার জীবন-প্রবাহ-তারল্য (fluidity) হারায়, তবেই তার সর্বনাশ। সেইখানেই তার অচল সমাধি। মৃত্যুই অরাজকীর্ণ জীবনকে বার বার মুক্তি দিয়ে নতুন করে দেয়। মানব-ইতিহাসে দেখা যায় গতি বন্ধনই প্রথায় বন্ধ হয় তখনই প্রলয় এসে সেই বন্ধন যুটে দেয়। এরই নাম নবযুগ। সীমা ছাড়া অসীমের প্রকাশ অসম্ভব। অথচ একটি বিশেষ সীমার মধ্যেই অসীম-প্রকাশের চরম সার্থকতা নেই। রূপের মধ্যে বন্ধন সে বন্ধ হয় তখন মৃত্যুই সেই বাধা ভেঙে দিয়ে অসীমের গতিকে নবরূপে সঞ্চালিত করে। সীমার বেড়াভাঙা হল উন্টো (Negative) দিক্। বেড়া ভেঙে নবজীবনের নবীন আনন্দে প্রবাহিত হওয়াই হল তার সোজা (Positive) দিক্’ (বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ১৫১ পৃষ্ঠা, আত্মপরিচয় ১২৬ পৃষ্ঠা, ২০১, ২০২ পৃষ্ঠা)। অর্থাৎ ক্ষণিকাকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অশরীরী নারী অধরাতে রূপান্তরিত করে তাঁর কাব্যের প্রবাহকে

পুনঃ প্রবর্তিত করলেন। এবং মৈত্রী ও মানব কল্যাণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে অসীমে উপনীত হলেন। কবি এভাবেই সীমার বেড়াকে ভেঙে (মৃত্যুর রূপকে ভেঙে) অসীমের গतिकে নব রূপে সঞ্চালিত করে কাব্যের নবযুগের সূচনা করলেন। আর, একেই তাঁর কাব্যের নবযুগ বলে অভিহিত করেন।

বলাকার পঞ্চম কবিতাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই কবিতাটি মহাযুদ্ধের খবর পাবার পরে লেখা। তাই কবি এই কবিতাটি মহাযুদ্ধের পটভূমিকার উপর লিখে তাঁর কাব্যের নব যুগের সূচনা করলেন (৫ ভাদ্র ১৩২১ কলিকাতা)। এই কবিতায় কবি বিরহী নেয়েকে (শৃগ কাব্য তরণী অথবা কাব্যলক্ষ্মীবিহীন কাব্য তরণী) নিয়ে মৃত্যু যুদ্ধের ভিতর দিয়ে পাড়ি দেওয়ায় বিখ্যাতের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবির জীবন যেমন মৃত্যুসঙ্কটের মধ্য দিয়ে নিঃস্বল ও নিঃসহায় অবস্থায় (উৎসর্গ ৪১ সংখ্যক) মৈত্রী ও কল্যাণবর্তার পতাকা বহন করে একাকী পাড়ি দিচ্ছে, তাঁর কাব্যতরণীও ঠিক সেই ভাবেই অকূল সমুদ্রের মৃত্যু ঝটিকার উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়ে দিশাহারা হয়ে একটি অস্পষ্ট স্বাহবানের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কাব্যতরণী এগিয়ে চলেছে সেই অগৌরবার উদ্দেশ্যে যে তারি জগৎ অচেনা আঙ্গিনাতে পূজার বাতি জালিয়ে ভাঙা ঘরে অপেক্ষা করে রয়েছে। কবির কাব্যতরণী এনার রজনীগন্ধার গুচ্ছ নিয়ে আনমনে গান গেয়ে মৃত্যুযুদ্ধের ভিতর দিয়ে 'শোমরা যাহার নাম জ্ঞান ন'²¹ সেই অথাতা²² অগৌরবার উদ্দেশ্যে মত্ত (মৃত্যু) সাগর পাড়ি দিচ্ছে। কবির এই কাব্যতরণী (বিরহী নেয়ে) বহুকাল আগে ক্ষণিকাব আমলে শ্রামলী নারীকে (সজলনীল জলদবরণ) নিয়ে প্রথম যাত্রা স্বরূপ করেছিল (যাত্রী—ক্ষণিকা ১৩০৭ শিলাইদহ)। এখন সে মৃত্যুতরঙ্গের ভিতর দিয়ে অকালে অদিনে সবার অগোচরে গৌরবহীন পূজারিণী নারীর উদ্দেশ্যে প্রেমের পুষ্পমালা নিয়ে আসছেন। তাঁর এই আগমন কেউ জ্ঞানতেই পারবে না কারণ তাতে কোনো সমারোহ হবে না, তার উদ্দেশ্যে কোন তুষধ্বনিও বাজবে না। শুধু সেই পূজারিণী নারীর সব দৈন্য ধন্য হয়ে চিরদিনের সন্দেহ (অভিমান) দূর হয়ে যাবে এবং স্বর্গকান্ধ কেটে গিয়ে তার ঘর আলোতে ভরে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের খেয়া কাব্যগ্রন্থের মধ্যে যে অভাগিনী নারী মলিন বেশে 'প্রচ্ছন্ন'²³ (খেয়া) হয়ে সবার পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, বলাকার সেই 'প্রচ্ছন্ন' নারীর উদ্দেশ্যে কবি প্রেমের পুষ্পহার নিয়ে বেরুলেন (বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ১০৪, ১০৫ পৃষ্ঠা)।

**রবীন্দ্রকাব্যে শ্যামলী নারী—বাংলা দেশের মেয়ে**  
(শেষ সপ্তক, শ্যামলী)।

**উৎপত্তি**—কবি শেষ যৌবনে অশ্বারী নারীমূর্তিকে আবার প্রথম যৌবনের বাস্তব নারীতে রূপান্তরিত করে নূতন নাম দিলেন ‘বাংলা দেশের মেয়ে’ অর্থাৎ গ্রাম বাংলার মেয়ে বার উৎপত্তি ‘শেষ সপ্তক’ কাব্যগ্রন্থে—

অধরা ছিল তোমার দূরে চাওয়া চোখের

দল্লবে,

অদৰা ছিল তোমার কঁপন পবা নিটোল হাতের

মধুবিমায।

ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে

ও গেল চলে,

জানলে না এইগানে তোমাবই কথা।

এই রূপ পরিবর্তিত নারীমূর্তির উদ্দেশ্যে কবি পশ্চিম যাত্রীর-ভাষাবিতে লিখেছেন (৫৪৪ পৃষ্ঠা) ‘এই তারিখে যাওয়ার ভিতর দিয়ে এক যখন আব সেজে এসে হাজির হয় তখন তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ও আলা বৈজ্ঞানিক যদি সওয়াল জবাব করতে শুরু করে, তা হলে মুশকিল। তখন বিশ্লেষণের চোটে বেবিষে পড়তে পাবে যেটাকে নতুন বলছি সেটা পুরোনো, যেটাকে আমার বলছি সেটা আর কাব্যোণ। কিন্তু, সৃষ্টির তো এই লীলা, এই জন্তেই তো তাকে মাঝা বলে।’

**সূচনা**—কবির শেষ সৃষ্টি ‘বাংলা দেশের মেয়ে’ রূপ দিলেন কবির পঁচাত্তবতম জন্মদিনে ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকে ন্নে, তাঁর শেষ বেলাকার মাটিব ঘব ‘শ্যামলীতে’ (শেষ সপ্তক চূড়ান্ত সংখ্যক)। এই ‘বাংলা দেশের মেয়েকেই’ কবি ভালোবেসেছেন অর্থাৎ কবি ভালোবেসেছেন গ্রাম বাংলার শ্যামলী মেয়েকে—

যে দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে

তাতে আছে যেন এই মাটিব শ্যামল অঙ্গন,

ওব কচি ধানের চিকন আভা।

কবি ‘শ্যামলী’ গৃহপ্রবেশের আগেই শ্যামলী সম্বন্ধে কবিতাটি লিখে শেষ সপ্তকে প্রকাশ করলেন। শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রী. ২৫ বৈশাখ কবির ৭১তম জন্মদিনে। কবির ৭৫তম জন্মদিনের কবিতায় (শেষ সপ্তক তেতাল্লিশ সংখ্যক) নিজের জীবন কাহিনী উদ্ভূত করে সাতাশের তরুণ কবির

প্রথম বাসন্তীরঙের জন্মদিনের উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। এবং শেষ সপ্তক চুরাঙ্গিশ সংখ্যকে বাংলা দেশের মেয়েকে সৃষ্টি করে শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের বাঁশিওআলাতে তার পরিচয় দিয়েছেন। পত্রপুট ও শেষ সপ্তক কাব্যগ্রন্থ-৩টি কবির নিজেরই জীবন কাহিনী।

### কাব্যগ্রন্থ—শ্যামলী

কবি ‘শ্যামলী নারী বাংলা দেশের’ মেয়েব রূপকে গড়ে তুলে দুয়ের গ্রন্থিতে বেঁধে দিলেন শ্যামলী কাব্যগ্রন্থের ‘বৈত’ কবিতায়।

আমি তোমাব কাবিগডেব দোসর

কথা ছিল তোমাব রূপেব ‘পরে মনের তুলি

আমিও দেব বুলিষে,

পুরিয়ে তুলব তোমাব গডনটিকে।

কবির প্রথম যৌবনের প্রথম সৃষ্টি অসম্পূর্ণ মানসীকেই কবি শেষ বয়সে নূতন ভাবে বাস্তব নারীতে গড়ে তুলে নাম দিলেন ‘বাংলা দেশের মেয়ে’ এবং পসিচয় দিলেন বাঁশিওআলাতে।

### বাঁশিওআলা—গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ

(১৬ জুন ১৯৩৬)। কবি বাংলা দেশের মেয়েব চবিত্ত্রকে রূপায়িত করে তার পরিচয় দিয়েছেন বাঁশিওআলাতে।

“ওগো বাঁশিওআলা

বাজাও লোমার বাঁশি

শুনি আমার নূতন নাম”

—এই বলে তোমাকে প্রথম চিঠি লিখেছি

মনে আছে তো ?

আমি তোমার বাংল দেশেব মেয়ে।

কবির এই শ্যামলী নারী ‘বাংলা দেশের মেয়ে’ যিনি ঘবে কাজ করেন শান্ত হুবে এবং ‘সবাই বলে ভালো’<sup>২১</sup> তিনিই শব্দবর্তীকালে অঙ্ককার ঘবের কোণ থেকে বেরিয়ে এসে শান্তিনিকেতনেব কাজে যোগ দিলেন।

তোমার ডাক শুনে একদিন

ঘরপোষা নিজীব মেয়ে

অঙ্ককার কোণ থেকে

বেরিয়ে এল ঘোমটা-খসা নারী ।

যেন সে হঠাৎ-গাওয়া নতুন ছন্দ বাগ্মীকির,

চমক লাগল তোমাকেই ।

কবি বাঁশিওআলাতে নিজের ও বাংলা দেশের মেয়ের পরিচয় দিয়েছেন ।

বাঁশিওআলা—রবীন্দ্রনাথ । প্রাণরক্তভূমিতে ছিলুম বাঁশি বাজিয়ে (শেষ সপ্তক ছয়) ।

প্রাণরক্তভূমি—অস্তর লোকের নাট্যশালায় ।

বাঁশি বাজিয়ে—কবি, গীতিকার ও সুরকার ।

কবি নিজের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন । কবি বিশ্বাসীর উদ্দেশ্যে কবিতা গান ও সুর রচনা করেছেন । তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে গানের অংশই বেশী, তাই কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যে সংগীত কথাটা যুক্ত । কবিতাই সংগীতে পরিবর্তিত হয়েছে আবার সংগীতেও কাব্যের রস পাওয়া যায় । দুটো ধাবা একই সঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে এবং তাবই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমের ধারা । এই প্রেম সংগীত (আনন্দ সংগীত ও ব্যথাব সংগীত) বিশ্বমানবের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমের দিকে ধাবিত হয়েছে । এই সংগীতই তিনি বিশ্বাসীর উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন, আব রচনা করেছেন বাংলা দেশের মেয়েস উদ্দেশ্যে—

সে নামবে না গানের আসন থেকে

সে লিখবে তোমাকে চিঠি

রাগিণীর আবছায়ায় বসে ।

ভূমি জানবে না তার ঠিকানা ।

ওগো বাঁশিওআলা,

সে থাকে তোমার বাঁশির সুরের দূরত্বে ।

আবার স্মরণ নয় সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

**‘দাঁড়ায়ছ সংগীতের শতদলদলে ।’**

**সংগীত ও প্রেম—**

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের নামকরণে সংগীত কথাটা যুক্ত এবং এই কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্য দিয়ে কবির জীবনের গতিপ্রকৃতিও নির্ণয় করা যায় । কবির কবিতাই সংগীতে পরিবর্তিত হয়েছে, আবার সংগীতেও কাব্যের রস পাওয়া যায় । তাই কবির সংগীতে সুর এবং কথা দুটোরই সমান প্রাধান্য । কবির

সংগীত, প্রেম ও কাব্য তিনটি ধারা (ত্রিধারা) কবি-মনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত। তাই কাব্যগ্রন্থের শিরোনামার অর্থ (নামকরণের মধ্যে), সূচনা ও উৎসর্গপত্র, কাব্যের প্রথম ও শেষ কবিতাটি এবং কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মর্মার্থ, স্থান, কাল ও পরিবেশের মধ্যে কবির বয়সাহুসারে জীবনের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। এবং শিল্পী শ্রষ্টা ও সুরকার রবীন্দ্রনাথকেও খুঁজে পাওয়া যায়।

কবির সংগীত ও প্রেম (ভালোলাগা-পশ্চিম-বাংলার ডায়ারি ৫৭৭ পৃষ্ঠা) কাব্যগ্রন্থে যুক্ত হয়ে **সঙ্ক্যাসংগীত** প্রথম প্রকাশিত হল। যৌবনের প্রথম উন্মেষে 'হৃদয়ারণ্যে' যে অন্তর্বেদনায় কবি আবদ্ধ হয়ে ছিলেন, সেই বেদনাই প্রকাশ করেছেন সঙ্ক্যার মতোই বিষর অন্তরের গান দিয়ে। **প্রভাত সংগীত** কবির অন্তর প্রকৃতির প্রথম বহিঃস্থ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে প্রভাতের মতোই নির্মল অন্তরের গান গাইলেন। আর বাতায়নবাসী কবির নবযৌবনের সূচনায় সংসারের নানান রূপের ছবিই কবির অন্তরের গান হয়ে **ছবি ও গান** দেখা দিল। তারপরই কবি যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের মধ্যে অন্তরের অন্তঃস্থলের উৎস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নবযৌবনের ও নববসন্তের প্রেমসংগীত (ভালোবাসা) গাইলেন **কড়ি ও কোমল** কাব্যগ্রন্থে—

তরুণ যৌবনের বাউল  
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,  
ডেকে বেড়াল  
নিকৃদ্দেশ মনের মাহুৎসকে  
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।

কবি 'নূতন'কে আহ্বান করে নিলেন—

আয় রে নূতন, আয়, সঙ্গে করে নিয়ে আয়,  
তোর স্বপ্ন তোরা হাসি গান।  
ফোটা নব ফুলচয়, ওঠা নব কিশলয়,  
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।

তারপরই কবির কাব্যগ্রন্থের নামকরণে সংগীত কথাটার সাময়িক ছেদ পড়ে গেল। এবার কবির যৌবনের নূতন দিগন্তে দেখা দিল 'শিল্পী কবির' নূতন স্রষ্টি



তার কল্পনার এবং ভালোবাসার অসম্পূর্ণ **ম্যাবসীত**—‘আশা দিলে, ভাষা দিলে,/তাহে ভালোবাসা দিবে/গড়ে তুলি মানসী-প্রতিমা।’

অথবা—

সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে

প্রাণসমুদ্রের মহাপ্লাবনে

তরঙ্গে তরঙ্গে ছলেছিল এই মন্ত্র-বচন। (মন্ত্র-বচন-প্রথম)

এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে

স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা

আমার বিবহ-গগনে

অন্তসাগরের নির্জন ধ্রুব উপকূলে।

এবার কবির সংগীত ও প্রেম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও দুঃসময়ের নানান ঘাত প্রতিঘাত ও বক্রতার মধ্য দিবে আবাব শেষ যৌবনে **ক্ষণিকায়**, ক্ষণিকের গানে দেখা দিল। তাই কবি আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কৌতুক পরিহাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে অকারণ পুলকে প্রেম সংগীত গাইলেন—

শুধু অকাবণ পুলকে

ক্ষণিকের গান গা বে আজি প্রাণ

ক্ষণিক দিনের আলোকে !

বসন্তের উদ্দেশ্যে গাইলেন—

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়

হিসেব নেইকো পুষ্পে পাতায়।

কবি-হৃদয়ের উদ্দেশ্যে গাইলেন—

হৃদয় আমার নাচে বে আজিকে

ময়ূবেব মশে নাচে রে হৃদয়

নাচে রে।

এবার কবির ‘**নূতন**’ (কড়ি ও কোমল) কাব্যলক্ষী পূজারিণী বেশে দেখা দেওয়াতে তাঁর কাব্যেব ধারাকে পরিবর্তিত করে পূজার অর্ঘ্য রচনা করলেন—  
‘নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থ’।

বাসর-ঘরের দুয়ারে করালে

পূজার অর্ঘ্য বিরচন ;

এ কি রূপে দিলে দরশন !

**প্রেম**—রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের নামকরণে যেমন সংগীত কথাটা যুক্ত, তেমনি অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রেমও যুক্ত হয়ে রয়েছে। কবির কবিতা ও প্রেম দুইই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কাব্যের গতি প্রকৃতির সঙ্গে প্রেমেরও উত্থান পতন হয়েছে। কবির জীবনের ও কাব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রেম, এই প্রেমই কবির জীবন ও কাব্যকে আলোকিত করে অসীমের দিকে প্রসারিত করে দিয়েছে (আত্মপরিচয়-১৭১, ১৭৮, ২০৫, ২১৫ পৃষ্ঠা)। প্রথম যৌবনের আবেগ-প্রবণতা ও অস্থির প্রকৃতির জগত কবির জীবন যেমন ভুল ভ্রান্তি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েও শেষ যৌবনে কল্যাণ কর্মের ‘উদ্বেগোধন’ কবে স্থিতি হয়ে গেল, তেমনি কবির সংশয়াকুল প্রেম (মানসী কাব্যগ্রন্থ-অন্তঃস্বন্দ্র) জীবনের ঘাত প্রতিঘাত ও দুঃসময়ের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে ক্ষণিকাতে পূর্ণতা লাভ করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অসীমে মিলিত হল। ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থটি কবির জীবনে ও কাব্যের মত সন্ধিক্ষেপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই কবি শেষ সপ্তক পয়তাল্লিশ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

দুইদিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,

দুই বিবীট আধখানা,—

তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে

শেষ কথা বলে যাব—

দুঃখ পেয়েছি অনেক,

কিন্তু ভালো লেগেছে,

ভালোবেসেছি।

অর্থাৎ ক্ষণিকার একপারে রয়েছে ভালোলাগার দৌরাঙ্গী (ভোগের তৃপ্তি), অত্ৰপারে রয়েছে ভালোবাসার আমন্ত্রণ (ত্যাগের সাধন-পশ্চিম যাত্রীর-ভাষারি ৫৭৭ পৃষ্ঠা)। এই দুটো ধারার প্রেম নিয়েই কবির জীবন সত্য এবং কাব্যও সম্পূর্ণ হয়েছে। তাই ক্ষণিকার পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থে কখনো ভালোলাগার ধারাটা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে কখনো বা ভালোবাসার ধারাটা। প্রেমের এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে কবির জীবন ও কাব্য চালিত হয়ে শেষ যৌবনে ক্ষণিকাতেই কবির ভালোবাসার ধারাটা প্রবল হয়ে দেখা দিল। এই প্রেম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অসীমের সঙ্গে মিলিত হয়েছে—‘দুঃখবিপদ-বিরোধমৃত্যুর বেগে অসীমের আবির্ভাব’—ক্ষণিকার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে এরই প্রকাশ।

কণিকার পরবর্তীকালের কাব্যগ্রন্থে প্রেম এবং সংগীত ব্যাধার সংগীতে (ক্ষুভিত হ্রের বর্ণা ত্রিদিন-পত্রপুট ১৫ সংখ্যক) পরিবর্তিত হয়ে পূজার অর্ঘ্য রচনা করলেন (স্মরণ হুই নং)। কবি এবার ব্যাধার প্রেম সংগীতকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পূজার খালায় অঙ্গলি দিলেন—**গীতাঞ্জলি, গীতিমালা, গীতালি কাব্যগ্রন্থ**। তাই কবির কবিতার মধ্যে যে ব্যাধার ধারা চলছে তা তাঁর সংগীতেও ধরা পড়েছে (ক্ষুভিত হ্র) এবং চিত্রকলাতেও (বিষন্ন মুখ)। **বলাকায়** নিঃসঙ্গ বেদনার্ত কবি অধরার স্রষ্টা করে প্রেমের ধারা, কাব্যের ও সংগীতের ধারাকে নব নব রূপে পুনঃ প্রবর্তিত করলেন এবং দুঃখের মধ্যে আনন্দকে খুঁজে পেলেন। **পূরবী** কাব্যগ্রন্থে অতীত বসন্তের নারী ‘আনন্দের হারাণো কণিকা ক্ষণিকাকে’ শেষ বারের মতো ‘আস্থান’ করে পূরবী রাগিণীতে অতীত বসন্তের শেষ গান করে ‘শেষ বসন্তের’ কাছে বিদায় নিলেন।

ফেলে দিয়ে ভোবে-গাঁথা স্নান মল্লিকার ম’লাখানি।

সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

পূরবী কাব্যগ্রন্থই কবির শেষ সাতাশের শেষ সংগীত। এরপরই কবির শেষ দ্বিগন্তে (মহুয়া) দেখা দিল অদেখা দূত অধরা ও অসীম। কবির শেষ কবিতাগুলি ও শেষ গান এই অধরা ও অসীমের উদ্দেশ্যে গাইলেন, কিন্তু কাব্যগ্রন্থের নামকরণে সংগীত অথবা গীত (রাগিণী) কথাটা আর রইল না।

### কবির ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া ও কবির বিরহী সত্তা—

বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি

চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি।

সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে

মুহূর্ত বাজিয়াছিল; তার পরে শব্দহীন রাতে

বেদনা পদ্মের বীণাপানি

সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-বাওয়া বাণী।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ রোম্যান্টিক (নবজাতক) এবং বিরহী কবি। শৈশব থেকেই তিনি কাল্পনিক বিরহের কবিতা লিখতে শুরু করেন। অবশেষে কবির ‘জীবন দেবতা নানা ভাঙা গড়া জয়পরাজয়, বাধা বিরোধ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিরহী কবিতা পরিণত করে দিল। তাই ‘রূপকারে’ লিখেছেন—জীবন দিয়ে গড়িছে গুণী স্বপন দিয়ে নয়’ (বীথিকা)। কবি নিজের এই বিরহী সত্তার পরিচয়

দিয়েছেন উৎসর্গ দশ সংখ্যক কবিতায় এবং উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থে । তিনি লিখেছেন তাঁর সস্তার মধোই রয়েছে বিরহিণী নারী—

আমার মাঝারে য আছে কে গো স

কোন বিরহিণী নারী ?

আপন করিতে চাহিলু তাহারে,

কিছুতে নাহি পারি ।

রমণীরে কে বা জানে—

মন তার কোনখানে ।

কবি এট বিরহী সত্তা পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যেও জাগ্রত হয়ে রয়েছেন, লিপিকায় তার বর্ণনা দিয়েছেন । ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যকে এবং পশ্চিম যাত্রীব ডায়ারিতে (৪৪৮ ৫৫৪ পৃষ্ঠা, পূর্ণতা-পূবদী তিনি বিস্তারিতভাবে প্রেম ও বিরহ মিলনের কথা বিশ্লেষণ করেছেন - ‘বিয়াজিচে দাস্তের কল্লনাকে যেখানে তরঙ্গিত করে তুলেছে সেখানে বসন্ত একটি অনাম বিরহ । দাস্তেব হৃদয় আপনার পূর্ণচন্দ্রকে পেয়েছিল বিচ্ছেদের দুঃ আকাশে ।’ রবীন্দ্রনাথও যৌবনের রাসোচ্ছ্বাসের মধ্যে এবং পরিপূর্ণ মিলনের মধ্যেও ক্ষণিক মিলন) যার সঙ্গে মিলন হল না তাঁকেই কবি খুঁজে পেলেন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিচ্ছেদের দূর আকাশে ধ্যানের মাধ্যমে ‘ধ্যানোন্তবা প্রিয়ার’ মধ্যে—

ধ্যানোন্তবা প্রিয়া

বন্ধ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে

বিরহের বোনা হাতে ।

আবার পত্রপুট পনেবো সংখ্যকে কবি একই কথা লিখেছেন—

সে এসেছে অপরিমীয় ধ্যানরূপে

আমার সর্ব দেহে মনে,

পূর্ণতর কবেছে আমাকে, আমার বাণীকে ।

জ্বলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে

চিহ্ন বিরহের প্রদীপশিখা ।

## কবির আধ্যাত্মিক সস্তার বিকাশ—

ক্ষণিকায় প্রেমের কল্যাণরূপকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার পরই কবির আধ্যাত্মিক সস্তার বিকাশ হলো । এই আধ্যাত্মিক সস্তার প্রথম প্রকাশ তাঁর ক. কা. ৮

নৈবেদ্য কাবাগ্রহে । তাই কবি নৈবেদ্য কাবাগ্রহে পাখির ভৎশূন্য চিত্তের উন্নত শিরের ছবিট এঁকে আত্মার কল্যাণ রূপকে প্রকাশ কবলেন । কবিকার পরবর্তীকালের বহু কবিতায় উপনিষদের বাণী ও আধ্যাত্মিক সন্তাব বিশ্লেষণ রয়েছে । ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ (১৩৭ পৃষ্ঠা) বইতে কবি এই আধ্যাত্মিক সন্তাব সহজ বিশ্লেষণ করে দিচ্ছেন—‘যখন কষ্ট অসহ্য হয়েছে তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, কাকে বিচে ক’মডাল, কার ওই পা, কার ওই আত্মা, সে কি আমি ? কে এই দেহধারী রবীন্দ্রনাথ ? আমি, আর আমাব যন্ত্রণা কাতর দেহ, একতো নয় । তিনি একাগ্র হয়ে নিজের দেহ থেকে পৃথক কবে দেখতে চেষ্টা কবলেন । যে দেহধারী কষ্ট পাচ্ছে সে ‘আমি’ নয়, এই ভাবনাটা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল হঠাৎ তাঁর মনে হল যেন কী বকম একটা যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল । বন্ধ হয়ে গেল সেই মুহূর্তে যত যাতনা । নিজেব সঙ্গে নিজেব বিচ্ছেদ হয়ে গেল ।’

দেহ থেকে আত্মাকে বিমুক্ত করবাব এঃ আধ্যাত্মিক চেতনা (ধ্যান) এবং তার বিশ্লেষণ প্রাপ্তিকের বহু কবিতায় ধরা পড়ে । কবি পত্রপুট দশ ও প্রাপ্তিক নয় সংখ্যক কবিতায় দেহ এবং দেহমুক্ত আত্মাব স্বরূপ বিশ্লেষণ কবেছেন । কবি ধ্যান দৃষ্টিতে তাঁর ‘জটিল মলিন জালে বিজড়িত দেহকে’ মন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলেন, যে, কবির অতীতের স্মৃতিব সঞ্চয় এবং বিচিত্র বেদনাব অল্পভূতিপুঞ্জ ও কবি সন্তাকে নিয়ে (বীশিখানি) কবির নখব দেহখানি অজানা নদীর স্রোতে দূরে ভেসে চলে গেল ।

দেখিলাম—অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়  
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি  
নিষে অল্পভূতিপুঞ্জ, নিষে তার বিচিত্র বেদনা,  
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আচ্ছন্ন স্মৃতির সঞ্চয়,  
নিষে তার বীশিখানি ।

কবি আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দিচ্ছেন—‘হে সখিতা, তোমার কল্যাণতম রূপই আমার আত্মার মাধ্য প্রকাশিত হউক ।’

হে পুষ্প, সংহরণ করিষাহ তব রশ্মিজাল,  
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,  
দেখি তাহে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক ।

কবি আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—‘দুঃখ-বিপদ—বিরোধমূর্ত্যুর বেণে অসীমের

আবির্ভাব—মৃত্যুর মধ্য দিয়েই প্রেমের সত্য রূপ এবং কল্যাণরূপ দর্শনই কবির জীবন দর্শন। প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির মধ্যোই কবির আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশ। কবির সমস্ত কাব্যের মধ্যে প্রেমের কল্যাণরূপ এবং অসীমের প্রকাশ রয়েছে (আত্মপরিচয়—২০৫ পৃষ্ঠা)। আবার রোগশয্যায় বাইশ সংখ্যক কবিতায় একই কথা লিখেছেন। কবি অর্ধজাগরণের মধ্যে দেখলেন—

মধ্যদিনে আধো ঘুম আধো জাগরণে  
বোধ করি স্বপ্নে দেখেছিহু—  
আমার সত্তার আবরণ  
থমে পড়ে গেল  
অজানা নদীর স্রোতে।  
লয়ে যোব নাম, মোর খ্যাতি,  
রূপণেব সঞ্চয় যা কিছু,  
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি  
মধুব ক্ষণেব স্বাক্ষরিত ;  
গৌরব ও অগৌরব  
চেউয়ে চেউয়ে হেসে যায,  
তারে আর পারি না ফিরাতে।

### কালের পটভূমিকায় কবি সত্তা।

কবি কালের পরিপ্রেক্ষিতে বহু কবিতা লিখেছেন। কালের পরিপ্রেক্ষিতে ও ক্ষণিকের পটে জন্মদিন এগারো সংখ্যক কবিতায় নিজের জীবনের কাহিনী প্রকাশ করেছেন। নদীর স্রোতের মত যে অসীম কাল প্রবাহ বয়ে চলেছে তার মধ্যে ক্ষণিকের জন্য বৃদ্ধদেব (ফেনপুঞ্জের) মতো পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জড়বস্তুগুলো ভেসে উঠেছে তারই সঙ্গে কবি নিজ সত্তাকে এবং কবিকাকে (সীমা, নারী, দেহ) বিশ্লেষণ করেছেন। ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যকে এই বিশ্লেষণ পাওয়া যায়—‘এই যে আমরা গুটি কতক সচেতন প্রাণী জড়মহাসমুদ্রের মধ্যে মাথা তুলে বৃদ্ধদেব মতো ভেসে উঠেছি এবং কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ একটা আকস্মিক সংযোগ—এই সংযোগটুকুর মধ্যে যত বিষয় যত প্রেম যত আনন্দ তা আবার অনন্তকালের মধ্যে গড়ে উঠবে কি না সন্দেহ। বসন্ত রায়ের কবিতায় এক জায়গায় একটা লাইন আছে—নিমেষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি। বাস্তবিক মাহুষের এক নিমেষের

মধ্যে শতযুগের সংযোগ বিয়োগ ঘটতে পাবে। সেই জন্য নিমেষগুলোকে দুর্মূল্য মনে হয়।’ কবি জয়দীন এগারো সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

কালের প্রলম্ব আবর্তে প্রতিহত  
ফেনপুঞ্জের মতো,  
আলোকে আধারে বঞ্জিত এই মাথা,  
অদেহ ধাবল কায়া।  
সত্তা আঁমাব, জানি না সে কোথা হতে  
হল উত্থিত নিত্য ধাবিত স্রোতে।

কালের প্রলম্ব আবর্তেব মধ্যে ক্ষণিকের জন্য কবি সত্তা উত্থিত হ'ল, ফেনপুঞ্জের মতো ধাবমান স্রোতের মধ্যে ভেসে উঠে কাণ্ড ধারণ করে কবির জীবনকে প্রকাশিত করল। কবির জীবনের আবস্ত মাঝে বিগ্নসত্তাব আকস্মিক সংযোগে সীমাকে (ক্ষণিকা, নাবী, কায়া) নিয়ে অসীমের বিচিত্র লীলা আবস্ত হল। ক্ষণিকাব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যখন তাঁর বিনাশ হল (১৩০০—১৩০২), তখন কালের আলোতে (বলাকা ১২১৪—১৬) মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই ক্ষণিকাই রূপান্তরিত হয়ে ‘মুখ ঢাকা বধু শেজে’ (অশবাবী নাবী—অধবা), কবিকে গোপনে দেখা দিল। এবং কবির কাব্যে স্থায়ী আসন লাভ করে সীমাব মধ্যে অসীমের আবির্ভাব জানালে। ‘বিবাত অসীম বিগ্নসত্তা এতটুকু কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে বেঁধে সীমাতে (নাবী, কায়া) প্রকাশ হল’—মংপুতে রবীন্দ্রনাথ।

### ‘সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধাবের পালা’—

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবং জীবনে রয়েছে তাঁর দুই সত্তা।<sup>২৭</sup> সন্ন্যাসী ও গৃহী সত্তা। এক সত্তা বিগ্ন ও বিগ্নমানবকে নিয়ে অসীমের দিকে ধাবিত; আর এক সত্তা তাঁর বাস্তব জীবনের স্তম্ভ-দুঃখ, ব্যথা বেদনাকে নিয়ে পৃথিবীর (সংসার) দিকে প্রবাহিত। আবার অত্যন্ত অল্পভূতি প্রবণ, সংবেদনশীল ও রসলোলুপ মনোব জন্ম তাঁর বাস্তব জীবনের স্তম্ভ দুঃখ, আনন্দ বেদনাগুলিও বহু ধারায় বয়ে চলেছে। এই বিরুদ্ধ সত্তা (আদর্শ ও বাস্তব সত্তা) তাঁর কাব্যে ও জীবনে পাওয়া যায় (পথে ও পথের প্রান্তে ১৩ সংখ্যক, ছিন্নপত্র ৭৮, ১৫৪ সংখ্যক, চিত্রা কাব্যগ্রন্থ)। তাই তাঁর কাব্যে রয়েছে অসংখ্য বৈচিত্র্যের স্বর (পত্রপুট ১৬ সংখ্যক), সেই স্বর বহু ধারায় প্রবাহিত হয়ে এক অথগু আত্মরূপে বিগ্নের দিকে ধাবিত। আবার এই বহুধা বিভক্ত কবির জীবন ও কাব্যের মধ্যে একটি ধারা (অনুরাগ)

অন্তঃসলিলা ক্ষুদ্র মতো প্রচ্ছন্নভাবে বসে চলেছে। সেই অচরাগেব ধারাটী স্রুপ্ত প্রেম বা প্রচ্ছন্ন প্রেম তাঁকে শেষ যৌবনে বৈরাগ্যের দিকে (কল্যাণকর্ম) টেনে নিয়ে গেল। কবি অচরাগেব ধারাকে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে নূনভাবে প্রবাহিত কবে সীমার বেড়াকে ভেঙে দিয়ে তাঁর কাব্যের প্রবাহকে পুনঃ প্রবর্তিত করলেন (বলাকা কাব্যগ্রন্থ ১২১৪-১৬)। এবং মানব কল্যাণের পশ্চাৎ বহন কবে বিশ্ব ও বিশ্বমানবের সঙ্গ যুক্ত হয়ে অসীমকে (অকণ প্রেম) উপলব্ধি করলেন। কবি আত্মশ্রুতি (২১৫ পৃষ্ঠা) লিখেছেন ‘কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ এমন কিছু থাকা চাই যাব ইঙ্গিত প্রদানের দিকে সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অচরাগকেই বোধশান ও বিশ্বাস কবে।’ এই অচরাগেবই একটি ধাবায় রয়েছে স্বেচ্ছাধা ও সংগীতের ধারা—

আমাব গানের মধ্যে সঞ্চিত রয়েছে দিনে দিনে

সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,

আর সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত।

আর এক ধাবায় রয়েছে সীমার কাষা নারী-গৃহী সত্তা) মনো অসীমের (শূন্য-সন্ন্যাসী সত্তা) মিলন সাধনের কথা। সেই কথা কবি নানাভাবে নানা রূপে কবিতায় ও গানে প্রকাশ করেছেন এবং বলাকা-কাব্য-পবিত্রমাব গ্রন্থ ভূমিকা (২২ পৃষ্ঠা-২৬ পৃষ্ঠা) তাব বিশ্লেষণ করেছেন। সীমা কপিণী এই সংসারকে সত্যভাবে গ্রহণ করে তার স্বপ্ন চাঞ্চল্য আনন্দ বেদনা এবং মৃত্যুক অন্তিম কবে অমৃত আনন্দ প্রেমে পৌঁছবার কথাই বাব বাব লিখেছেন। কবি আত্মশ্রুতি লিখেছেন (১৭৮ পৃষ্ঠা)—‘জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদের টানতেছেন—আর কাহাবও টানিবাব ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া। জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপকল্পকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কবা ইহাকেই তো মুক্তির সাধনা বলি।’ কবির মনে সীমা অসীমের প্রথম ভাবরূপ অঙ্কুরিত হয়েছিল ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাট্যকাব্যে (আত্মপরিচয়-১৭৮ পৃষ্ঠা, বলাকা কাব্য পবিত্রমাব গ্রন্থ পরিচয়—২৪ পৃষ্ঠা, জীবনস্মৃতি—১০২ পৃষ্ঠা)। এই নাট্য কাব্যে এবং পরবর্তীকালের বহু কবিতায় রয়েছে কবির নিজেরই আত্মকথা। এই আত্মকথায় নিজেকে বহুবার সন্ন্যাসীর, (তপোভঙ্গ) সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবির এই সন্ন্যাসী সত্তা (শূন্যতা) অসীমের সঙ্গে নারীসত্তা সীমার মিলন সাধনই কবির জীবনে একটি মাত্র পালা বা সমস্ত কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত। কবির পরবর্তীকালের সমস্ত কাব্য রচনার



ইহাই ভূমিকা। সীমার মধ্যে অসীমের মিলন সাধনের পালা। কবির জীবন নাট্যই কাব্যনাট্যে রূপায়িত হয়েছে আর এই নাট্য কাব্য [বিশ্বরণধম্মী জীবন—(নাট্যাংশ) কড়ি ও কোমল-থেকে স্মরণ] তিনি লিখে গেছেন অজ্ঞানার ঘেঁৱের মধ্যে ও অপ্ৰকাশের পৰ্শ টেনে।

বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।

বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেই স্থানে,

সেই স্তম্ভেরে রূপে

সে সংগীতে অনিৰ্বচনীয়।

### রাগ রাগিণী—

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি যেমন একটার সঙ্গে একটা যুক্ত হয়ে একটি বিশেষ অৰ্থে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বাগ রাগিণীর মধ্যেও একটা সুসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়, বিশেষভাবে ক্ষণিকার পরবর্তী কবিতাগুলিতে। বাগ রাগিণীগুলি কবির জীবনের সময় নির্ধারক। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে বাগ রাগিণীগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

বীরোহা—জ্যোতিৰ্বিন্দনাথ ঠাকুরের বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সুর বাজান হয়—কবির শৈশব।

যোগিয়া—কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি বিজড়িত সুর। যৌবনের সন্ধিকাল (ছবি ও গান)।

শাহানা (বসন্ত পঞ্চম রাগ) কবির বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সুর বাজান হয়—কবির নব যৌবন (শেষ লেখা ৮ সংখ্যক)।

ভৈরবী—প্রথম প্রহরের রাগিণী—কবির প্রথম বসন্তের রাগিণী—কবির নব বসন্ত। শরৎকাল—‘সানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূব প্রসাদের সিংহদ্বার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে (জীবনস্মৃতি বর্ষা ও শরৎ)।

মূলতান রাগিণী—বেলাংশের রাগিণী। অপরাহ্ন—‘তখন ঝিকিমিকি বেলা’ (পত্রপুট বারো)। কবির শেষ যৌবনের রাগিণী, অকাল বসন্ত (পত্রপুট ১২ সংখ্যক, রোগশয্যায় ১০ সংখ্যক)।

পূরবী—শ্রোতৃ বয়সের রাগিণী—পূরবী কাব্যগ্রন্থ ১৯২৪ (অতীত বসন্তের সমাপ্তি সংগীত)।

কানাড়া—শেষ বয়সের রাগিণী—শেষ লেখা ৮ সংখ্যক।

কড়ি ও কোমলের বহু কবিতা পরিবর্তিত হয়ে অল্প কাব্যগ্রন্থে লিখিত হয়েছে।

তুমি—কড়ি ও কোমল, পবিশেষ।

ক্ষণিক মিলন—কড়ি ও কোমল। মানসী।

ক্ষণ মিলন—চৈতালি।

হঠাৎ মিলন—সানাই।

পূর্ণ মিলন—কড়ি ও কোমল।

দেহের মিলন—কড়ি ও কোমল।

মিলন—পূববী, মজ্জা, পবিশেষ।

শেষ কথা—কড়ি ও কোমল চৈতালি, নবজাগ্রত, সানাই।

নিম্নিতার চিত্র—কড়ি ও কোমল।

নিম্নিতা স্পষ্টোচ্ছিতা—সোনাব তবী।

অকাল ঘুম—ভ্রামসী।

হাসি—কড়ি ও কোমল, শেষ সপ্তক দুই সংখ্যক।

খেলা—কড়ি ও কোমল।

কাঠ বিড়ালি—বৌথিকা।

মোহ—কড়ি ও কোমল।

ভুলভাঙ্গা—মানসী।

মানসী কাব্যগ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ দুটি কবিতা পরিবর্তিত হয়ে অল্প কাব্যগ্রন্থে লেখা হয়েছে।

বধু—মানসী।

বধু—আকাশ প্রদীপ।

বালিকা বধু—খেয়া। মানসীর ‘বধু’ কবিতাটির ১৭ বৎসর পর খেয়াতেই প্রথম

‘বালিকা বধু’ কবিতাটি লেখা হয়েছে।

ধান—মানসী চৈতালি, বৌথিকা।

ক্ষণিক কাব্যগ্রন্থের পাঁচটি কবিতা পরিবর্তিত হয়েছে।

অচেনা—ক্ষণিকা, মজ্জা, বিচিত্রিতা, ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক। অপবিচিতা—পূববী।

উদাসীন—ক্ষণিকা, বৌথিকা।

সমাপ্তি—ক্ষণিকা খেয়া।

উদ্‌বোধন—ক্ষণিকা নবজাগ্রত।

বোধন—মজ্জা।

কুসার্থ—ক্ষণিকা।

কৃতজ্ঞ—পূববী।

ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থের ক্ষণিকার পবিচয় পূববীর ক্ষণিকা কবিতায়। ক্ষণিকা

কাব্যগ্রন্থের নামানুসারে ক্ষণিকা (পূববী) কবিতাটি লিখিত হয়েছে।

অনেক সময় কবিতাখণ্ড খণ্ড অবস্থায় পাঠকের নিকট অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু পুঞ্জীভূত আকারে বচনাগুলি পৰস্পরের সাহায্যে স্মৃতিতর হইয়া দেখা দেয়, লেখকের মর্মরূপটি পাঠকের নিকট সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া উঠে। একবার লেখকের সমস্ত বচনাব সহিত সঙ্গীত বৃত্ত্যভাবে পরিচয় হইয়া গেলে, তখন, প্রত্যেক স্বল্প লেখা তাহার সমস্ত বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকা—১৩০৩ বঙ্গাব্দ

**রবীন্দ্রনাথ**

## স্মৃতির ভূমিকায়

আমার কেবল একটি নিমেষ

তারি তরে ধ্যেয় আসি (উচ্ছ্বল-মানস)।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ডায়ারি ও সাহিত্যে কবির অতীত স্মৃতিগুলি বার বার লিখেছেন। যৌবনের বহু স্মৃতি যা তিনি কোথাও বলেন নি সেই মুহূর্তের স্মৃতিগুলিকে কবিতায় ধরে রেখেছেন।

১। মুহূর্তের হাসি—হাসি (কড়ি ও কোমল), শেষ সপ্তক দুই সংখ্যক, হঠাৎ মিলন (সানাই), শেষ অর্ধ্য (পুরবী)।

২। নিমেষের দৃষ্টি—চিষ্টপত্র ৮ম খণ্ড—‘সোমার আকাজক্ষাদীপ্ত অতৃপ্ত আখিণ্ডে/যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে।’ ক্ষণেক দেখা (ক্ষণিকা), একটি চাউনি (লিপিকা)।

৩। ক্ষণকালের মিলন—দোঁহা শানে চাহিল দুজনে চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।’ অর্ধ্য ৯ গুরু চতুর্থীর চাঁদের আলোতে কবির সঙ্গে যে নারীর মুহূর্তের জন্ম শুভদৃষ্টি (ক্ষণিক মিলন) হয়েছিল তারই কথা কবি ‘ক্ষণিক মিলন’ কবিতায় উল্লেখ করেছেন। কবি-জীবনের কোন বিশিষ্ট ক্ষণের (মাংস্রে ক্ষণ) স্মরণে তিনি তিথি ব্যবহার করেছেন, তিথির কথা উল্লেখ করে সেই নির্দিষ্ট সময়ের কথা প্রকাশ করেছেন। ‘ক্ষণিক মিলন’ কবিতারই পরিবর্তিত রূপ ক্ষণ মিলন (চৈতালি), হঠাৎ মিলন (সানাই) ছিন্নপত্র ১৩০ নং, স্মরণ ২২ সংখ্যক কবিতায়। কবি-মনের উত্থান পতনের মধ্যেই এই কবিতাগুলি পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে লিখিত হয়েছে। তাই এই কবিতাগুলিতে কবি-মনের পরিবর্তন ও গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। প্রথম যৌবনের লেখা ‘ক্ষণিক মিলন’ এবং ‘শেষ কথা’ (কড়ি ও কোমল), আর শেষ যৌবনের লেখা ‘আবির্ভাব’ এবং ‘ভীকৃত্য’ (ক্ষণিকা) এই কবিতাগুলির মর্মার্থের মধ্যেই কবি-জীবনের গূঢ় রহস্য ধরা পড়ে।

৪। সমুদ্রের উপর সূর্যাস্তের দৃশ্য—মুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি, ৩৮৬, ৩৮৭, ৪২২ পৃষ্ঠা, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা (৮০ পৃষ্ঠা), ছিন্নপত্র ৫৫ নং।

৫। গজাবক্ষে তরুণ কণ্ঠের গান—কবির শৈশব (আরোগ্য ৪ নং কবিতা ছিন্নপত্র ৩২ সংখ্যক)।

৬। মহানিমের ঝিল্লিঝংকৃত স্তম্ভ বাত—গাজীপুর, কবির যৌবন (শেষ সপ্তক ১৪ নং)।

৭। গ্রামেব পথে সর্ষেফুলের গন্ধের সঙ্গে প্রেমের স্মৃতি। নব যৌবনে (সর্ষেফুল যে সময় ফোটে) কোন এক সময়ে কবি গ্রামে গিয়েছিলেন। সর্ষে খেত—সময়, কাল নির্দ্ভাবক।

তখন ছিল সর্ষে খেতে

ফুলেব আগুন লাগ।

তখন আঁমি মালা গেঁথে

পদ্মপাতায় ঢেকে

পথে বাঁধিব হয়েছিলাম

রুদ্ধ কুটিব থেকে। বিলম্বিত—কর্ণিকা)।

পদ্মপাতায় ঢেকে—পবিত্রতার চিহ্ন। কবি প্রথম যৌবনে অক্লিষ্ট অমলিন প্রেমমালা নিয়ে গ্রামে গিয়েছিলেন (হিন্নপত্র ২৪২ সংখ্যক, প্রান্তিক সাত সংখ্যক, বিলম্বিত—কর্ণিকা)।

৮। কৈলাশ মুখজোব ছড়াব স্মৃতি—জীবনস্মৃতি ৭ পৃষ্ঠা, বধু (আকাশ প্রদীপ), জাগ্রত স্বপ্ন (৩বি ও গান)।

৯। পেনেটির বাগান—শৈশবেব স্মৃতি—জীবনস্মৃতি, হিন্নপত্র ২১৮ নং

১০। সংশয়িত প্রেমের স্মৃতি } —সংশয়েব আবেগ (মানসী, যুঁষাপ-  
অথবা কবির ভীক প্রেম }

বাত্মীয় ডায়ারী ৪৫৬ পৃষ্ঠা), ভীকতা (কর্ণিকা), ভীক. নীহাবিকা (পবিশেষ, বিচিক্রিতা), পঞ্চমৌ (আকাশ প্রদীপ), গান (মানাই) অসময় (কল্পনা)।

১১। ঘণ্টা বাজে দূর—হাজাবি বাগেব ঘণ্টার স্মৃতি (১২২২ বঙ্গাব্দ আষাঢ়) পথে ও পথেব প্রান্তে ২৪ নং, আরোগ্য ৪ নং।

১২। পাটের বোঝাই ভবা / একে একে বস্তা টেনে উঠাষের চলেছে ওজন/ আডতের আড়িনায (আবোগ্য ৪ নং কবিতা)। নদীর ধাবে হাট ও পাটের আডত যা কবির যৌবনের ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত (হিন্নপত্র—২৩১ নং) কুষ্ঠিয়ার ব্যবসা।

১৩। জন্মদিন ১৫ নং কবিতা—ম'পুব স্মৃতি।

১৪। জন্মদিন ১২ নং কবিতা—বালক বয়সেব শিলাইদহেব স্মৃতি।

১৫। আমের বোলের গন্ধ—যৌবনের শিলাইদহেব স্মৃতি।

১৬। সেই চাঁপা সেই বেলফুল—মাষের ও নতুন বোঠানের মৃত্যুর স্মৃতি আবদর উৎসবেরও স্মৃতি।

১৭। কবির প্রথম জন্মদিন ও উপহারের স্মৃতি—‘মিষ্টি স্বপ্নের দাম’—  
উপহার (জন্মদিন—সৈঁজুতি ৬৬২ পৃষ্ঠা), শেষ সপ্তক তেতাল্লিশ সংখ্যক ছিন্নপত্র  
২৭ জুলাই ১৮৭৭ সালে শ্রীশ মজুমদারকে লেখা চিঠি যার বিবরণ রয়েছে ৩৪৪ পৃষ্ঠা  
ষাদশ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলীতে।

১৮। বিদায় ক্ষণেব কান্নার স্মৃতি—‘বদায় বীতি (ক্ষণিকা), প্রথম চিঠি  
(লিপিকা), যেতে নাহি দিব (সোনার তরী)।

১৯। ‘অনেক কালের একটি মাত্র দিন’—কবির বিবাহেব দিনের স্মৃতি—  
শেষ সপ্তক উনত্রিশ শেষ লেখা ৮ সংখ্যক, হঠাৎ মিলন (সানাই)।

২০। ভজিয়ার ষাঁতা ভাঙাব স্মৃতি—গাজীপুরেব স্মৃতি (স্মৃতি—পুনশ্চ,  
আবোগ্য ৪ নং কবিতা)। নিজের তৃণ্য বনমালীব চবিত্রট তাঁব কবিতায় কিছু  
স্থান দিলেও, রবীন্দ্র সাহিত্যে ঘাটলিনী দেবীর দাসী ভজিয়ার চবিত্রট তাঁর  
কবিতায় এবং ছিন্নপত্র ৩৩ সংখ্যকে একটি বিশিষ্ট স্থান অবিকাব করে রয়েছে।  
এই দাসীটির স্মৃতিব পশ্চাতে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে কবির প্রথম যৌবনের গাজীপুর  
ও শিলাইদহেব স্মৃতিব সঙ্গে (ছিন্নপত্র ৩৩নং। কবি পত্রাব ‘স্মৃতি’ (পুনশ্চ) যা’ মৃত্যুর  
পূর্বেও কবি উল্লখ করে গেছেন—‘আমাব প্রথম যৌবন খুঁজে বেডায় বিদেশী  
ভাষাব মধ্যে আপন ভাষা/প্রজাপাত যেমন ঘুরে বেডায়/বিলিতি মোহুমি ফুলের  
কোষাবিতে/নাঁনা বর্ণের ভিড়ে।’

২১। ‘শূন্য হৃদয়া চৌকির’ স্মৃতি—‘আমাব ‘শূন্য হৃদয়া চৌকি দিনবাত্রি  
তার দুই বাহু বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু এখন তার এই নীরব আত্মন কেউ  
গ্রাহ্য করেনা।’ (রবীন্দ্র—বচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ড ১৫০, ১৫৫ পৃষ্ঠা, ছিন্নপত্র ১৮৮৫,  
১৮৮৭ অক্টোবর)।

‘সেই ফুল কাটা ঢাকাওয়াল/পুবানো খালি চৌকিটা পেয়েছে কার  
খবর’—শেষ সপ্তক ৩১ নং কবিতা।

‘শূন্য চৌকির পানে চাহি/সেখা সাঙ্গনা লেশ নাহি’ (শেষ লেখা ৪ নং)  
কবির অতীত দাম্পত্য জীবনেব চৌকির স্মৃতি।

২২। শিখিল চুলের অস্পষ্ট গন্ধ বা স্পর্শেব স্মৃতি—যৌবনের স্মৃতি।  
শেষ সপ্তক ৩১ নং, নাট্য শেষ—বীথিকা, মায়া—সানাই।

২৩। বাঁতাবি গাছেব চারার স্মৃতি—শেষ যৌবনের শিলাইদহ কিংবা  
শান্তিনিকেতনের স্মৃতি—শেষ সপ্তক ৩ নং কবিতা।

২৪। কবির শৈশবেব স্মৃতি—কাঁচা আম, শ্রামা, কাঠের দিকি, আতার  
বিচি, সাথী (পরিশেষ), বালক (পরিশেষ)।

২৫। প্রাণের স্মৃতি—কবির শৈশব। ‘যখন দেখা হল তার সঙ্গে চোখে  
চোখে তখন আমার প্রথম বয়েস’ (শেষ সপ্তক ত্রিংশ সংখ্যক)। ‘মনেব মধ্যে  
তখনো/অসংশয় হয় নি পাখির কাকলি’ (মিল ভাঙা—শায়রলী)। সাহিত্যের সঙ্গী  
—কাব্যসঙ্গিনী নতুন বোষ্ঠানের স্মৃতি।

২৬। বাতের স্মৃতি—কবির বসন্ত বাত (বসন্ত—কল্পনা, কডি ও কোমল  
—শবৎকালের স্মৃতি)। ‘তেলালাব ছাতের গুটি কতক বাত্রি’—ছিন্নশত্রু ৫।  
নং কবির যৌবন। ‘অর্ধ বাৎসর্যে দেখা দিবে তাপি মুগ নিদ্রাহীন চোখে’ (বলাকা  
৪২ নং কবিতা)। ‘বাত্রি যাব আভিনায বসে প্রাণেব ছিন্নশত্রুগুলি বাবে বাবে  
জুড়ে তোলে, ওই লুকিয়ে—থাকা ছোট ফলগুলি সেই মহাদুঃখাবেবই বহুশগুণ  
থেকে বস পেয়ে ফলে উঠে ছ সেই অন্ধকাব—যশ্র ছায়ামুগং যশ্র মুত্যা (পশ্চিম-  
যাত্রার ডায়ারি ৫৭৭ পৃষ্ঠা)। বনস্কবে নাবা ম্যালিনী দৌব স্মৃতি।

ছোট ফলগুলি—আঙ্গুর ফল কবির যৌবন। আজি মোব দ্রাক্ষাকুঞ্জবনে/  
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিগাছে ফল (উৎসর্গ—চৈতালি—১৫০০)। মৃষ্টিব মাঝে শুকিয়ে  
আছে/একটি আঙ্গুর ফল (একটি মাত্র—ক্লনিকা—১৩০৭)। কবির যৌবন

২৭। ভোলাব স্মৃতি—শমীন্দ্রনাথের বন্ধু ভোলা (ববীন্দ্রনাথের পরলোক  
চর্চা—অমিতাভ চৌধুরী) শমীন্দ্রনাথ (বিজু) ও তাঁর বন্ধুর উদ্দেশ্যে লেখা  
(পলাতকা)।

২৮। নীতিজ্ঞানাথের উদ্দেশ্যে—নূতন শ্রোতা (পরিশেষ) নূতন কাল,  
বিশ্বশোক (পুনশ্চ)।

২৯। বেণুজার স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

অমলাব মা যখন গেলেন মাঝ

তখন ওর বস ছিল সাত বছর।

কেমন একটা ভয় লাগল মনে

ও বুঝি বাঁচবে না বেশিদিন।

কেমনা ব ডা করুণ ছিল ওং মুখ,

যেন অকাল বিচ্ছেদের ছায়া

ভাবীকাল থেকে উন্টে এসে পড়ছিল

ওর বড়ো বড়ো কাল চোখের উপরে।

শেষ চিঠি পুনশ্চ।

মং‌পু‌তে র‌বী‌ন্দ্র‌না‌থ এ‌ই ক‌থ‌া‌গু‌লি‌ব‌ই পুন‌রু‌ক্তি ক‌রে‌ছি‌ল‌েন। উ‌র্মি‌লা দা‌শ ‘ক‌বি প্রি‌যা’‌তে লি‌খ‌ে‌ছ‌েন—‘চো‌খ দু‌টি‌র ম‌ধ‌্যে এ‌মন এ‌ক‌টা ভা‌ব ছি‌ল যে তা থ‌েকে চো‌খ ফ‌ের‌ান‌ো যে‌ত না।’

৩০। মাধুবীলতার উদ্দেশ্যে—যেতে নাহি দিব (সোনার তবী)। শেষ প্রতিষ্ঠা (পলাতকা)।

৩১। মুগালিনী দেবী‌র উদ্দেশ্যে—মুক্তি পলাতকা)।

৩২। তাস্কাব আত্মহত্যা—জ্যোতির্ময় তীব্র হতে আঁধার সাগরে/ ঝাঁপিয়ে পড়িল এক তাবা—কাদম্বিনী দেবী‌র জীবন কাহিনী‌র স্মৃ‌তি।

৩৩। তাবাব স্মৃ‌তি—যুগল জীবনের জোয়াব জল/কত সন্ধ্যায় ঢুলেছে ঐ তাবাব ছায়া (শেষ সপ্তক একত্রিশ সংখ্যক)। কবি‌র দাম্প‌ত্য জীব‌নে‌র তা‌রা‌র স্মৃ‌তি।

মিলন বাহে সাক্ষী ছিল যাবা/আজো জলে আকাশ সেই তাবা (আকাশ প্রদী-২৭।২।৩৮)। কবি‌র দাম্প‌ত্য জীব‌নে‌র তা‌বা‌র স্মৃ‌তি।

তাবা—আকাশ ভা‌য়া তা‌বা‌র মা‌ঝে যা‌মা‌র তা‌বা ক‌ই? (তা‌বা-পূ‌ব‌ব‌ী)।

তা‌বা—তুমি কোন কাননে‌র ফুল/তুমি কেন গগনে‌র তা‌বা (তুমি‌ক‌ডি ও কো‌মল, ‘যে তা‌বা’ ম‌হেন্‌দ্র‌ক‌ণে প্র‌ভা‌স বে‌না‌য় প্র‌থম গু‌না‌ল‌ো মো‌বে নি‌শা‌স্ত‌ের বা‌ণী’ (শেষ অ‌র্ঘ্য -পূ‌ব‌ব‌ী)।

নিশাস্তের বাণী—বহুশ্রম যৌবনে‌র বা‌ণী।

প্রথম যৌবনে‌র প্রথম বসন্তে‌র দুর্ল‌ভ মুহূ‌র্তে (ম‌হেন্‌দ্র‌ক‌ণ) যিনি কবি‌র বহুশ্রম যৌব‌নে‌র ছা‌ব উ‌ন্‌ব‌াট‌ন ক‌রে‌ছি‌ল‌েন সে‌ই ‘তুমি’‌না ‘তা‌রা‌র’ (তুমি‌ক‌ডি ও কো‌মল, তা‌রা-পূ‌ব‌ব‌ী) স্মৃ‌তি।

### কবি‌র অ‌তী‌ত দি‌ব‌ের স্মৃ‌তি—‘পা‌থ ও পা‌থ‌র প্র‌ান্ত’।

পথে ও পথে‌র প্র‌ান্তে আ‌ছে স‌হ প্র‌ত্য‌ক্ষ পথে‌র চল‌্‌তি ঘট‌না নিয়ে আ‌লাপ প্র‌তি‌লাপ, কবি‌র জীব‌না‌দর্শ‌ে‌ব ক‌থ‌া, আ‌ব‌ব‌ণ মো‌চ‌নে‌ব সা‌ব‌না ও শ‌ষ্টি‌নি‌ক‌ে‌ত‌নে‌র ক‌থ‌া, থা‌ব আ‌ছে কবি‌র অ‌তী‌ত দি‌ব‌ের স্মৃ‌তি। এ‌ই স্মৃ‌তি‌চা‌ব‌ণে‌র বৈ‌শি‌ষ্ট‌্য ধ‌রে‌ শ‌ব্দ‌ক‌ালে‌ব স‌ক‌াল কিং‌বা দু‌পূ‌ব কিং‌বা অ‌প‌া‌টে‌র স্নি‌গ্ধ ম‌য়া‌হ কি‌না যে‌ক‌োন এ‌ক‌টি স‌ন্দ‌র দি‌ন‌কে তিনি অ‌তী‌তে‌র স্মৃ‌তি‌ব ম‌ধ‌্যে নিয়ে গে‌ছে‌ন, য‌ে‌ন অ‌তী‌ত কা‌ল‌ব স‌াজ‌ নিয়ে ব‌র্ত‌মা‌ন দি‌ন‌টি অ‌প‌রূ‌প হ‌য়ে দে‌খ‌া দি‌ল। এ‌ই ভা‌বে তিনি শৈ‌শ‌ব যৌব‌নে‌র দি‌ন‌গু‌লি‌র ক‌থ‌া প্র‌কাশ ক‌রে‌ছে‌ন।



পথে ও পথের প্রান্তে ১৮ নং লেখাতে কবি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আরম্ভের স্মৃতি ও অতীত সংকল্পের কথা প্রকাশ করেছেন।

২৪ নং লেখাতে কবি প্রথম যৌবনে ১২২২ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসে যখন হাজারিবাগে যান, সেই সময়কার ঘটনা ধ্বনির কথা প্রকাশ করেছেন (আরোগ্য ৪ নং)।

২৮ নং লেখাতে কবি ‘বলাকার কবি’কে (বাগগড়) স্মরণ করেছেন। বলাকাতেই কবি মৃত্যুর রূপকে ভেঙে নব নবরূপে পুনরুজ্জীবিত করে তাঁর কাব্যের গতিকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন এবং বিধ্বস্তমানবের কল্যাণের জন্ত আত্মোৎসর্গ করে মহামানব ববীন্দ্রনাথে পরিণত হয়েছিল। কবি নিজের এই বিশুদ্ধ স্বরূপকে এই দিনটির মধ্যে উপলব্ধি করলেন।

৩২ নং লেখায় কবির দুব শৈশবের শীতের সকালের চিস্তা চাকরের গুণগুণরবে মধুকানের গান এবং কবির জ্যেদার ও নতুন বোঠানের সংসারের পূর্ণ জীবনের সুখস্বস্তির ছবির সঙ্গে শৈশবের ‘অনাদৃত কবির’ নিজের কথাই মনে জেগে উঠল—‘সেদিনের সেই কুটিতোস স্তগন্ধি সকাল বেলা যে পূর্ণ জীবনের রূপক ছিল সেদিন আমার সমস্ত জীবনে তার সমতুল্য কিছুই ছিল না।’

৩৬ নং লেখায় বর্তমান আষাঢ় মাসের স্নাননির্মল স্নিগ্ধ মধ্যাহ্নটির মধ্যে শেষ যৌবনের মুলতান রাগিণীর আলাপের সঙ্গে অতীত আষাঢ়ের ‘নববর্ষাব’ স্নিগ্ধ মধ্যাহ্ন ও ‘প্রায়শী নিকরমাণ’ স্মৃতিটিও কবির চিন্তা পটে ধরা দিল, যা’ পুনশ্চের ‘সুন্দর’ কবিতাটির মধ্যে সেই অতীত দিনটির স্মৃতির কথা প্রকাশিত—(অবিনয়—কণিকা, ১লা আষাঢ় ১৩০৭ শিলাইদহের স্মৃতি)। ৩৮ নং লেখায় ‘বিচ্ছেদ’ কবিতাটির ভাবার্থ রয়েছে।

৪৬ নং লেখায় কবির জগতে সবচেয়ে বড়ো স্থান নিয়ে রয়েছে শীতের ছপুঁব বেলা। জীবনস্মৃতিতে ‘বর্ষা ও শবৎ’ এ শীতের তপ্তরের বর্ণনা দিয়েছেন—‘শরৎ মধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙে মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা শহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মতো আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে।’

৫০ নং এ লিখেছেন, ‘মাতৃংগের মন দুই বাসার পাখি, একটা কালের বাসা, একটা দূরের। শরৎকালটা (কড়ি ও কোমল), হচ্ছে, দূরের কাল। কবি মুলতান রাগিণীর আলাপের সঙ্গে সেই দূরের শরৎকালের কথা ও ব্যক্ত করেছেন—‘যা রোদ্‌দুয়ে সোনার রঙ ধরেছে। এই রঙটাতে মন ভোলায়—অনির্দিষ্ট কোন

সুদূৰেৰ জন্তু মন কেমন করে।' শব্দকাল—কড়ি ও কোমল। কবির নবযৌবনের স্মৃতি (১২২১ বঙ্গাব্দ-শব্দকাল)।

৪৮ ও ৫৪ নং এ লিখেছেন, শিলাইদহেৰ কুঠিও তেতালার নিভৃত ঘরটির কথা কবির মনে পড়ছে। আর মনে পড়ছে 'বীণবনের ছায়া, চলছে জলভরা কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘু ঘু ডাকছে আমগাছের ডালে আর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে মাঝিদের সারিগান—মন উতলা করে দেয়, চোখটা ঝাপসা করে দেয় একটুখানি অকারণ চোখের জলে।' 'পথে ও পথের প্রান্তে' কবির শৈশবের ও যৌবনের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির কথা, বিশেষ ভাবে প্রথম যৌবনের দূরের শব্দ কালের স্মৃতি ও শিলাইদহেৰ স্মৃতি বর্তমান দিনগুলির মধ্যে ফিরে ফিরে এসেছে।

### চিত্রকলা—

কাব্যগ্রন্থে অশরীরী নারীস্মৃতি ছাড়া, সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কবিতাও দেখা যায়, যার কিছু কিছু প্রভাব চিত্রকলায় প্রতিফলিত হয়েছে। কবি যে কথা কবিতায় প্রকাশ করতে পারেন নি বা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাই তিনি চিত্রকলায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কবি-মনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে যেমন কাব্য, প্রেম, সংগীত, আধ্যাত্মিক ও বিবাহী সত্তা যুক্ত হয়ে রয়েছে, তেমনি চিত্রকলাও যুক্ত। কবি নব বসন্তের ও নব যৌবনের রসোচ্ছ্বাসেব আনন্দের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শব্দকালে ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন (বর্ষা ও শব্দ-জীবনস্মৃতি), সেই চিত্রলিপি শেষ বয়সে পুনরায় শুরু করেন। শেষ সাতাশের নিঃসঙ্গ কবির অন্তর্বেদনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ হতে লাগল গানে ও চিত্রকলায় (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি-৭ অক্টোবর, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, ২৫ সাল)।

অমিতার আনন্দ সম্পদ

ডালিতে সাক্ষিয়ে নিয়ে চলেছে স্মৃতি,

সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয়,

শুধু রূপ আলো দিয়ে গড়া (শেষ সপ্তক পনেরো)।

অমিতা—কবিতা, স্মৃতি—চিত্রকলা।

তাই কবিতার মানন্দসম্পদ ভাবলোক থেকে রূপলোকে (চিত্রকলা) পরিণত হল। এতদিন কবি ভাব দিয়ে অমুরাগ দিয়ে কবিতায় গানে ও সাহিত্যের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু—

আমার ভাষা যেন

কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত

হেমস্বর বেলা।

তার স্বর পড়েছে চাপা।

(শেষ সপ্তক ছাৰিশ)।

কবি সেই অদৃশ্য চঞ্চল লীলা যা ভাব্য অঙ্কলিতে পোয়াতে পারলেন না বা ধরা গেল না, সেই অদৃশ্য চঞ্চল লীলাই তিনি ‘ভাব্য জগৎ’ ছেঁড় ‘দেখার জগতে’, এক নিভৃত থেকে আবার এক নিভৃত এসে মনেব আনন্দে চিত্রকলায় প্রকাশ করতে লাগলেন। ‘আর্টিষ্ট প্রমাণ করেছে আর্টের সাধনা’। আমি বলি ‘দেখা’, তবেই দেখতে পাবো। সত্তার প্রবাহিনী ঝাব পড়েছে, তাইই স্রোতের জলে মনেব অভিষেক হোক, ছোট্টা বড় স্তম্ভব অন্ধুর সব নিয়ে তাব নৃত্য’ (পশ্চিম-যাত্রী ভাষাবি ৫২০ পৃষ্ঠা)। আবার ‘পথে ও পথে প্রান্তে’ ২৭ সংখ্যাকে লিখেছেন—‘এব আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে স্বর আসত, কথা শুনে পেত, অজ্ঞান মে আছে চোখ মেনে রূপেব বাঞ্ছ্যে, রেখাব ভিড়েব মর্যে।’ কবি শেষ সপ্তক পনেরো সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি।

দূরকে নিয়ে সেই আম’ব খেলা ;

দূরকে সাজাই নানা সাজে,

আকাশের কবি যে দিগন্তকে সাজায়

সকালে সন্ধ্যায়।

কবি চিত্রকলায় দূরকে নিয়ে খেলা করেছেন ; দূরকে নানা সাজে সাজিয়েছেন এবং দূরবে মাস্তেব গান কবে (দূরবে গান—সানাই), দূর অজ্ঞানাব পাবে তাঁর নিকটতমকে চেয়ে দেখেছেন—

চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমকে

অজ্ঞানাব অতিদূর পারে।

‘দূর বলে একটা পদার্থ আছে, সে ব’ড়া স্তম্ভব। বস্তুত স্তম্ভবেব মধ্য একটি দূরত্ব আছে নিকট তাব দুল হস্ত নিয়ে তাকে মেন নাগাল পায না। স্তম্ভব আমাদের সমস্ত দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়, তাই সে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও আমাদের প্রয়োজনেব অতীত। আমাদের নিজেব ব্যক্তিগত জীবনেও এই দূর পদার্থকে যদি না রাখতে পারি তা হলে আমাদের ছুটি নেই, তা হলে সমস্ত অস্তম্বর হয়ে পড়ে। যাবা শিগগরে অতান্ত নিবিষ্ট তাদের জীবনে নিকট আদৃছে ব নেই। কেননা স্বার্থাজনিষ্টা মাস্তেব অতান্ত বেশি কাছের জিনিষ,

তার আসক্তি দেখালের মতো। আপন দেয়ালকে মাছুষ ভালোবাসে, কেননা দেয়াল আমারই, আর কারো নয়। সেই ভালোবাসা যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন মাছুষ ভুলে যায় যে যা আমার অতীত তা কত আনন্দময় হতে পারে, তার প্রতি ভালোবাসার আর তুলনা হয় না।

কর্ম যখন বিষয়কর্ম না হয়, তখন সেই কর্ম মাতৃষকে দূরের স্বাদ দেয়, দূরের বাঁশি বাজায় (দূরবর্তিনী—সানাই)। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি, তার মধ্যে প্রয়োজনের অতীত দূরের আকাশ আছে বলেই এত ভালোবাসি, তাতে এমন মগ্ন হতে পারি' (পথে ও পথের প্রান্তে ২৬ সংখ্যক)।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান ও সুরের ধারা, গল্প উপন্যাস, ছবি এবং জীবন সবই একই রক্তস্রুত্রে গাঁথা। সবগুলি মিলিয়েই কবির জীবনের বৃত্ত রচিত হয়েছে। তাঁর আনন্দ-বেদনা, কামনা-বাসনা, ভয়-ভাবনা, দুঃখ-দুঃখ আধ্যাত্মিক চেতনা, প্রেম ও ভালোলাগা এবং বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বর্য যা' তিনি বিপুল আকারে কবিতায় প্রকাশ করেছেন, তারই কিছু কিছু অংশ চিত্রকলায় এঁকেছেন। যে সব নারীদের (আকাশবিহারীদের) ভাব দিয়ে রূপ দিয়ে এবং অন্তরঙ্গের ধারা দিয়ে কবিতায় প্রকাশ করেছেন, সেই সব আকাশবিহারীদেরই তিনি চিত্রকলায় ধরে রেখেছেন—কবিব কবিতাই আকাশের মধ্য দিয়ে ছবিতে পরিণত হয়েছে।

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,  
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,  
অজানা থেকে বেরিয়ে আগছে জানার দ্বারে।  
সে প্রতিরূপ নয়।

মনের মধ্যে ভাঙাগড়া কত, কতই জোড়া তাড়া,  
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে,  
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে ;

এতদিন এই সব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে।

কথার ফাঁদ—কবিতায়। আকাশবিহারীদের—‘তারা মন্ত বড়ো কিছুই নয় ; তারা দেখা দিয়েছে কেউ বা বনের ছায়ায়, কেউ বা নদীর ধারে, কেউ বা ঘরের কোণে, কেউ বা পথের বাঁকে’ (পশ্চিম-বাড়ীর-ভাষায়ি ৫৬১ পৃষ্ঠা)।

কবি প্রথম যৌবনেই ছবি আঁকা উল্লেখযোগ্যভাবে স্বক করেন, এবং বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ছবি পরিণতি লাভ করে। কবি জীবনস্মৃতিতে ‘বর্ষা ও শরৎ’ এ লিখেছেন—‘মনে পড়ে দুপুর বেলায় জাজিম বিছানো কোণের ধরে একটি ছবি আঁকার ক. কা. ২

খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলায় কঠোর সাধনা তাহা নহে সে কেবল ছবি আঁকাই ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ।’ কবির সেই প্রথম যৌবনের শরৎকালে (কাড়ি ও কোমল), অকারণ পুলকে যে ছবি আঁকা শুরু কবেছিলেন, সেই ছবির প্রধান অংশের শেষ পরিণতি হিসাবে, শেষ বয়সের চিত্রকলায় দেখা যায়—‘বিষন্ন নারীমূর্তি’ এবং কবির ‘বেদনার্ত মুখ’—

আমি বৈবেছি তোমাকে দুয়ের গ্রন্থিতে,

তোমাব সৃষ্টি আজ তোমাতে আব আমাতে,

তোমার বেদনায় আব আমার বেদনায়।

বৈত—শ্রামনী।

কবি যৌবনে ১৮২০ সালে, বিলাত যাবার পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে অলৌকিক স্রষ্টাস্তর দৃশ্য দেখেছিলেন সেই স্রষ্টাস্তর উজ্জল স্নান সন্ধ্যাব রংই কবির জীবনে বয়ে গেছে। এবং সেই রঙ তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর চিত্রকলায়। ছিন্নপত্র ৫৫ নং এ লিখেছেন—‘সেই বিলাত যাবার পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে অলৌকিক স্রষ্টাস্তর দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে বার্থ হয়ে যায়নি—অনন্ত দিন রাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য স্রষ্টাস্তর আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখেনি। আমার জীবনে তার রঙ বয়ে গেছে।’

এই উজ্জল স্নান সন্ধ্যাব রঙই কবির চিত্রকলায় দেখা যায়, বিশেষভাবে নারীমূর্তিগুলিতে ও নিজের প্রতিকৃতিতে এবং কিছু কিছু কবির স্মৃতি বিজড়িত প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলির মধ্যে। কবি এই রঙ সম্বন্ধে যুবোপ-যাত্রীব-ভায়াবীর ৩৮৭, ৪২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—‘কিন্তু তবু সমুদ্র এবং আকাশের মাঝখানটি থেকে এই ছলিত সন্ধ্যাতুকুকে পারিজাতপুষ্পটির মতো তুল নিয়ে যদি আর একজনের হাতে না দ্বিতে পারি তা হলে মনে হয় যেন সমস্ত নিশ্বাস হল। এই আলো এই শান্তি কেবল একা বসে চেয়ে দেখবার এবং মুগ্ধ হবার স্তম্ভ নয়, মাহুয়ের উপর নিষ্কণ করে তাকে আচ্ছন্ন কবে তাকে সুন্দর কবাব জগে। ঘরেব মধ্যে আনবার জগে, লোকালয়ের উপরে বিস্তৃত কবাব জগে, ভালোবাসার লোকের মুখের উপরে ধরে তাকে নূতন এবং সুন্দর আলোকে দেখবার জগে।’ তাই পরবর্তীকালে নিঃসঙ্গ কবি এই রং ভালোবাসার লোকের মুখের উপরে ধরে তাকে নূতন এবং সুন্দর

আলোকে দেখলেন (বিষন্ন নারীমূর্তি), এবং নিজের প্রতিকৃতিতেও এই রং দিছেন (কবির বেদনার্ত মুখ)।

আবার কবির বহু বৈচিত্র্যময় চিত্রকলার পাশেই রয়েছে কাল্পনিক আতঙ্কজনক জন্তু জানোয়ারের নানা রকম মূর্তি, আর স্বন্দর ও অন্তর্দর মাছুষ মূর্তি। কবির যৌবনের কাল্পনিক চিন্তা, ভাবনা, আশঙ্কা, নৈরাশ্র ও দুঃখ-বেদনার অভিব্যক্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভিন্ন আকৃতিতে কবি-মনে দেখা দিবেছিল; যৌবনের সেই কাল্পনিক ভয়ই কবি চিত্রকলাতে এবং কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। এই কাল্পনিক ভয় ভাবনাগুলি ‘আতঙ্ক’ (পরিশেষ), শেখ সপ্তক নয় সংখ্যক কবিতা, শেষ লেখা ১৪ নং কবিতা, ভীক (পরিশেষ, বিচিত্রতা), ভাঙ্গতা (ক্ষণিকা), ও পঞ্চমী (আকাশ প্রদীপ) কবিতায় ভালভাবেই ব্যক্ত করেছেন। ‘আতঙ্ক’ কবিতায় রয়েছে—

জীবনের ভিত্তিটাব গায়ে

পড়েছে বিস্তর কালো দাগ

মুঢ় অতীতের মশীলেখা,

ভাঙা গাঁথুনিতে

ভীক কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহ্নগুলো।

দীর্ঘ ছাদে তার জীর্ণ ভিতে

নামহীন অবসাদ,—

অনির্দিষ্ট শঙ্কাগুলো নিদ্রাহীন পেঁচা,

নৈরাশ্রের অলীক অতুষ্কিত যত,

দুর্বলের স্বরচিত শত্রুর চেহারা।

ধিক্ রে ভাঙন লাগা ঘন,

চিন্তায় চিন্তায় তোর কত মিথ্যা আঁচর কেটেছে।

দুইগ্রহ সেজে ভয়

কালো চিহ্নে মুখভঙ্গী করে।

কাঁটা আগাছার মতো

অমঙ্গল নাম নিয়ে

আতঙ্কের জঙ্কল উঠেছে।

চারিদিকে সারি সারি জীর্ণ ভিতে

ভেঙে পড়া অতীতের বিকল্প বিকৃতি

কাপুরুষ করিছে বিক্রপ।

শৈশবে বাগানের জীর্ণ পাঁচিলের গায়ে সাদা কালো দাগ দেখে কবি যেমন কাল্পনিক আতঙ্কে আতঙ্কগ্রস্ত হতেন, তেমনি যৌবনেও নানা রকম চিন্তা ভাবনা যেমন নৈরাশ্রের অলীক অত্যাঙ্ক, নামহীন অবসাদ, অনিদিষ্ট শঙ্কা, অনিত্রা, উৎবেগ, উৎকর্ষা, কাল্পনিক শত্রু, অমঙ্গলের ভয়, দুঃখগ্রহের ভয় প্রভৃতি দ্বারা আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেন। এমন কি কবি সংশয়ের জন্ম ভালোবাসার কথাও ব্যক্ত করতে পারেন নি—হায়, সে যে পায় নাই আপন নিশ্চিত পরিচয়, বন্দী তারে রেখেছে সংশয় (ভীক-বিচিহ্নিতা, শেষ সপ্তক ২৬ সংখ্যক, সংশয়ের আবেগ-মানসী)। তাই ‘পঞ্চমী’কে (দৌণদী অমাবস্তার পর পঞ্চম তিথি, আলো আধারি অথবা সিকি ঠাট্টানীর আলো—শ্রামলা রং) উদ্দেশ্য করে তাঁর যৌবনের দিনগুলির কথা উল্লেখ করেছেন।

দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে  
উঠে গেছে আজ কবি  
সেপা হতে তার ভূতভবিষ্য  
সব দেখে যেন ছবি  
ভয়ের মূর্তি যেন যাত্রার সঙ,  
মেখেছে কুশ্লী রঙ।  
দিনগুলি যেন পশুদলে চলে  
ঘণ্টা বাজায়ে গলে।  
কেবল ভিন্ন ভিন্ন  
সাদা কালো যত চিহ্ন।

আবার শেষ লেখা ১৪ সংখ্যক কবিতায় আত্মসমালোচনা করে লিখেছেন—

যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস  
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।  
এই হার-জিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কুহক,  
শিশুকাল হতে বিজড়িত পদে পদে এই বিভীষিকা,  
দুঃখের পরিহাসে ভরা।  
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—  
মৃত্যুর নিপুন শিল্প বিকীর্ণ আধারে।

কবি এই সব কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থকে জন্তু জানোয়ারের মূর্তিতে চিত্রকলায় রূপ দিয়ে আরও ভালো ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। কবি যে সব

আতঙ্কজনক অস্ত্র জানোয়ারের ছবি এঁকেছেন বা ভয়ের কথা কবিতায় লিখেছেন  
তাও মানব মনেরই আর একটা দিক। সংসার জীবনে এই কাল্পনিক ভয়, শঙ্কা,  
অবসাদ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, বিধা-দ্বন্দ্ব, চিন্তা-ভাবনা দ্বারা আমরা সবাই আক্রান্ত।  
কবির কাব্যগ্রন্থে মানব মনের যত রকম অভিব্যক্তি আছে সবই তাঁর কবিতায় ও  
চিত্রকলায় প্রকাশ পেয়েছে এমন কি আমাদের ভালোবাসার মধ্যেও হারাবার ভয়  
রয়েছে, তাই ‘উৎসবের দিনে’ (পূর্বদী) লিখেছেন—

ভয় নিতা জেগে আছে প্রেমের শির-কাছে,

মিলন স্রুথের বক্ষা মাঝে।

আবার ‘বিরহীর পত্রে’ও সেই একই কথা লিখেছেন—

ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি

ছাড়া পেলে কে আর কাহার।

কবি নিজেও সংসার রচনা করেছিলেন—

কত দিনে কত রাত্রে কত লজ্জাভয়ে

কত ক্ষতি লাভে কত জয়ে পরাজয়ে।

কবি আতঙ্কজনক অস্ত্র জানোয়ারের মূর্তিতে যেমন ভয়ের অভিব্যক্তি বোঝাতে  
চেষ্টা করেছেন, তেমনি মনের বাধা বেদনা ও ভালোবাসাকে সুন্দর ও অসুন্দর মানুষ  
মূর্তিতে দেখেছেন—

খর মধ্যাহ্নের তাপে

ছুটেতে হল

জয় পরাজয়ের আর্বতনের মধ্যে

পায়ে বিধে কাঁটা,

ক্ষত বক্ষে পড়ছে প্রজ্জ্বলা।

নির্মম কঠোরতা মেয়েছে চেউ

আমার নৌকার ডাইনে বায়ে,

জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে

নিন্দার তলায় পক্ষের মধ্যে।

বিদ্বেষে অতুরাগে

ঈর্ষায় মৈত্রীতে,

সংগীতে পুরুষ কোলাহলে

আলোড়িত তপ্ত বাষ্প নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে



আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে

(শেষ সপ্তক তেতাল্লিশ)।

আবার স্মৃতির মূর্তিতে দেখেছেন—

অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে

অমরাবতীর মর্ত্য প্রতিমা ;

সেবাকে তারা স্মরণ করে,

তপঃক্লান্তের জগত তাবা

আনে স্বধার পাত্ৰ.

কবি আত্মপরিচয়ে ২১০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—‘খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে যে মানি এসে পড়ে আমার ভাগ্যে অগ্ৰদের চেয়ে তা অনেক বেশী ঘাবিল হয়ে উঠেছিল। এমন অনবরত, এমন অকুণ্ঠিত, এমন অকরণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মান আমার মতো আর কোন সাহিত্যিককেই সহিতে হয় নি। এও আমার খ্যাতি পরিমাপের বৃহৎ মাপকাঠি। একথা বলার স্বযোগ পেয়েছি যে প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাক্ষিক কবেছে কিন্তু পবিত্রবেব অগোববে লজ্জিত করে নি। এ ছাড়া আমার দুর্গ্ৰহ কালো বর্ণের এই-যে পটটি কুলিয়েছেন এরই উপরে আমার বন্ধুদের অশ্রুস্রব মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।’ আবার পথে ও পথের প্রান্তে ১১ সংখ্যক ও ৪৬ সংখ্যকে লিখেছেন—‘আমাব সহচরদের বাক্য বা ব্যবহারে যত কিছু মচুশ প্রকাশ পায় আমার জীবনচবিতের অধ্যায়ে লোকে সেগুলো যোজন কবে আমার নাগেব উপর কালিমা নেশন কবে। যেমন ঝড়েব উপব মারীর উপর মানব রাগ করে ন’, তেমনি এই-সমস্ত আঘাতকে স্বীকাব করে নিয়ে আমি যেন রাগ না কবি, যেন শাস্ত থাকি—প্রতিদিনই নিজেকে এই কথাই বলছি এবং মনের ভিতর থেকে এর সাথ পাচ্ছি।’

রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও ‘স্বল্প’ ‘স্বল্প’রূপে বিশ্লেষণ করেছেন শেষ সপ্তক তেতাল্লিশ সংখ্যক কবিতায়, ছিন্নমুদ্রে ও সাহিত্যে। তাঁব চেহেন ও অবচেতন মনের অভিব্যক্তিগুলিই কবি চিত্রকলায় এঁকেছেন এবং কবিতায় লিখেছেন। মানব মনের এমন কোন দিক নেই যা তাঁব কাবা গ্রন্থে প্রকাশ করেন নি। মানব মনের বাস্তব সত্তাব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দিক, যা আমাদের মনের গভীরে স্তম্ভ রয়েছে তারও যেমন প্রকাশ রয়েছে তাঁব কবিতায়, আবার আধ্যাত্মিক সত্তাব সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ যা তিনি নিজ অভিজ্ঞতার দ্বাৰা অর্জন করেছেন তারও প্রকাশ রয়েছে। তাই তাঁব কবিতায় রয়েছে বহু বৈচিত্র্যের ধারা, এবং তারই সঙ্গে

যুক্ত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত ঐশ্বৰ্য। কবির এই কবিতাগুলিই আকাবের  
ৰূপ নিয়ে চিত্ৰকলায় পরিবর্তিত হয়েছে।

বহু বিচিত্ৰে কাককলাষ চিত্ৰিত  
এই আমার সমগ্র সত্তা  
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে  
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে  
পরিপূর্ণ অব্যাহত হবে ?  
তার সকল তপস্শায় সে চেয়েছে  
গোচরতাকে ;  
বলেছে, যেমন বলে গোধূলির অশ্রুট তার।  
বলেছে, যেমন বলে নিশাস্তের অৰুণ আভাস,—  
“এস প্রকাশ, এস।”  
কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,  
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে  
বধু যেমন সত্য করে জানে আপনাকে,  
সত্য করে জানায়,  
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,  
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হাব করতে,  
যখন দৈনকে দেয় সে মহিমা ;  
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি।

### যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি

‘আশ্রমের কাজে আত্মসমর্পণ করব ভাবলাম। তখন আমার আতীত  
স্বজন সবাই প্রতিকূল। সকলকে এড়িয়ে চলে এলাম শান্তিনিকেতনে। সঙ্গে  
এল দৈন্ত ও অর্থাতাব। সেবা ও উপযুক্ত পথের অভাবে আমরা অনেকে অস্থায়  
হয়ে পড়লাম। আমার পত্নী তখন তাঁর গায়ের-গয়না-বিক্রয় করা অর্থ নিয়ে  
এখানে এলেন ও ঐকান্তিক সেবায় আমাদের সারিয়ে তুললেন। কিন্তু কয়েকদিন  
পরে তিনি যারা গেলেন। আশ্রমের জন্ত এই প্রথম বলি। নারীর এই বলিকে  
একদিন স্বীকার করতেই হবে। কাজেই এই দাবি একদিন এখানে স্বীকৃত হবেই।  
হয়তো একদিন নারীদের জন্তই এই আশ্রম উৎসর্গীকৃত হবে।’

(ক্ষিতিমোহন সেন—স্মৃতিকথা)।

## নিবেদ'শিকা

১, ৩, ৪। দূরের বঁধু—

‘প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের স্বগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে’ (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৬ পৃষ্ঠা)।

‘সেই কৈলাস মুখজো আমার শিশুকালে অতি দ্রুতবেগে মস্ত একটা ছড়ার মতো বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছড়াটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটা ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বল ভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুগ্ন মোহিনী বধুট ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল, ছড়া গুনিতে গুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎসুক হইয়া উঠিত’ (জীবনস্মৃতি ৭ পৃষ্ঠা)।

কবি প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে এই (ছড়ার বধু) দূরের বঁধুর ‘স্বপ্ন স্বপ্ন’ ও ‘জাগ্রত স্বপ্ন’ দেখলেন অনাগত ‘কে’ কবিতাটির মধ্যে।

বাতায়নবাসী কবি—ছবি ও গান কাব্যগ্রন্থের ‘স্মৃতি’, জীবনস্মৃতি ১১০ পৃষ্ঠা।

২। বাসন্তী রঙ এর বসনখানি—সোঁজানুজি (কণিকা)।

বাসন্তী-রঙ বসনখানি

নেশার মতো চক্ষে ধরে।

হেমলতা ঠাকুর ‘রবীন্দ্রনাথের বিবাহ বাসরে’ লিখেছেন, ‘বাসন্তী রঙের জমিতে লাল ফিতের উপর জরিব কাজ করা পাড় বসানো! শাড়ি পরেছেন কাকিম। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে।’ কবি পত্রপুট বার সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

বুকে উঠল জাফরাণি রঙের আঁচল

তখন ঝিকিমিকি বেলা।

কবির নব যৌবনের ফাগুন মাসের জগতে সবচেয়ে প্রিয় রঙ ছিল বাসন্তী রঙ অথবা জাফরাণি রঙের বসন। শেষ যৌবনে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে এই রঙ বদল হয়ে নীল রঙে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

নীল ও জাফরাণি রং—তাই কবির সবচেয়ে প্রিয় রঙ নীল। নববর্ষার মেঘের বন অথবা ‘সজলনীল-জলদবরণ বসনখানি’ কবির প্রিয় রঙ (যাত্রী-কণিকা, বলাকা ৩৮ নং কবিতা), তারপরেই ধানী, বাদামী ও ফলসার রঙের বসন।

ঝিকিমিকি বেলা—অপরাক্ষ, কবির শেষ যৌবন (যবনিকা ১৩০৭)।

৫। অতিথি—কবির আদিরসাত্মক কবিতাগুলির মধ্যে একমাত্র শেষ লেখা ৮ নং কবিতা ও ছায়াশঙ্কিনীতে (বিচিঞ্জিত) এই অতিথি কথাটা যুক্ত।  
আগন্তুক, অত্যাগত। যুত্যা (স্বরূপ ৩ সংখ্যক)।

৬। সাতাশ—‘এখন ভারনা ধরিয়ে দিলে, আমার আসল পরিচয় কোন দিকটায়। সেই আরম্ভ বেলাকার সাতাশের দিকে না, শেষ বেলাকার? পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৬০, ৫৬১ পৃষ্ঠা।

আরম্ভ বেলাকার সাতাশ—আরম্ভ বেলাকার সাতাশের ‘কবি রবীন্দ্রনাথের’ প্রথম জন্মদিনেব উৎসব উদ্‌যাপিত করে যুগলিনী দেবী কবিকে প্রথম অর্ঘ্য দিলেন। রবীন্দ্র রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে ‘জন্মোৎসব’ (৩১৪ পৃষ্ঠা) প্রবন্ধে এই উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। আবার ২৭ জুলাই ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ মজুমদারকে একই কথা কবি লিখেছেন—‘হঠাৎ একদিন বৈশাখের প্রভাতে নববর্ষের নূতন পত্রপুষ্প আলোক ও সমীরণের মধ্যে জেগে উঠে যখন শুনলুম আমার বয়স সাতাশ’—  
ছিন্নপত্র ১৮৮৭, খৃষ্টাব্দ শেষ সপ্তক তেতাল্লিশ সংখ্যক, জন্মদিন (সৈঁজ্জতি) কবিতায় সাতাশের কবির প্রথম জন্মদিনের কথা প্রকাশ করে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

ছুটির যজ্ঞে পুষ্পহোমে জাগল বকুলশাখা,

ছুটিব শূন্যে ফাগুনবেলা মেলল সোনার পাখা।

ছুটিব কোণে গোপনে তার নাম

আচম্ভক সেই পেয়েছিল মিষ্টি স্বপ্নের দাম, (উপহার)

কানে কানে সে নাম ডাকার বাখা উদাস করে

চৈত্রদিনের স্তব্ধ দুই প্রহরে (জন্মদিন)।

শেষ বেলাকার সাতাশ—চৈত্রালি থেকে পূর্ববী (১৮৯৭-১৯২০)। শেষ সাতাশের ঋণগ্রস্ত কবি যখন কল্যাণকর্মের উদ্‌বোধন করলেন তখন একমাত্র যুগলিনী দেবীই তাঁর কল্যাণকর্মের প্রেরণাদাত্রী হয়ে কবিকে ‘একটুখানি আলোর টিপ’ পরিচয় দিয়ে কবির নবজীবনের ‘উদ্‌বোধন’ করলেন (১০০৭ শিলাইদহ, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি ৫ অক্টোবর ১৯২৪, ক্ষণিকা—পূর্ববী)। অনাদৃত কবিকে (পত্রপুট ১৫ সংখ্যক) আরম্ভ বেলাকার সাতাশে এবং শেষ বেলাকার সাতাশে, এই দুই সাতাশে প্রথম অর্ঘ্য দিলেন যুগলিনী দেবী। তাই পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারিতে নিতান্ত কাঁচা, জন্ম-গরিব, একেবারে অস্থিতে-মজ্জাতে বেহিসাবি রবীন্দ্রনাথ সাতাশের উপর এত জোর দিয়েছেন, এবং দুই সাতাশের এবং দুই বসন্তের নারী ‘ক্ষণিকা’কে স্মরণ করেছেন এবং পূর্ববীতে ক্ষণিকার পরিচয় দিয়েছেন।

একটুখানি আলোর টিপ’—(পশ্চিম-যাত্ৰীৰ ডায়াবি ৫৬১ পৃষ্ঠা,) অমৃতরস-  
স্বরণ । ভালোবাসা ।

ব্যক্তি বিশেষকে সে ডাক দিয়ে বলে, তুমি কা’বার চেয়ে কম নও, তোমার  
মধ্যে এমন মূল্য আছে যাব জন্ত প্রাণ দেওয়া চলে ।’ মাৰ্গৰ যেষানে আপন সীমা  
টেনে নিষে নিজেকে সাধাবণেব সামিল কৰে অলস হয়ে বসে থাকে প্রেম ব্যক্তি  
বিশেষেব সেই সাধাবণ সীমাকে মানে না, তাকে অৰ্থা দিয়ে বলে, তোমার  
কপালে আমি তিলক দি যছি, তুমি অসাধাবণ । স্তব্ধেৰ আলো বৃষ্টিব জল যেমন  
নিৰ্বিচাবে সৰ্বজ্ঞই মাটিৰ জড়তা ও দৈন্ত অস্বীকাৰ কৰে, মৰুকে বাব বাব স্পৰ্শ  
কৰে, তাকে জ্বলন্তায় পুলকিত ক’ব তোলে যে ভূমি রিক্ত তাবও সফলতাৰ  
দাবি, মাৰ্গৰেব সমাজে প্রেম তেমনি সব জাবগাতেই অসীম প্রত্যাশা জাগিয়ে  
রাখে । ব্যক্তিকে সে যে মূল্য দেয় সে মহিমাৰ মূল্য । অন্তৰ্নিহিত এই মহিমাৰ  
আশাসে মাৰ্গৰেব সৃষ্টি শক্তি নানাদিকে পূৰ্ণ হগে ওঠে, তাৰ কৰ্মেৰ ক্লাস্তি  
দূৰ হয়ে যায়’ পশ্চিা যাত্ৰীৰ ডায়াবি ৫৭৭ ৫৭৮ পৃষ্ঠা) । অৰ্থাৎ সাতাশেৰ  
আবেগপ্রবণ অবৈধবপ্রকৃতিব খেয়ালি উদাসীন, সবল কল্পনাপ্রবণ ও আদৰ্শবাদী,  
গৃহপ্ৰিয় ‘কবি ববীন্দ্রনাথকে’, তাঁব জীবনদেবতা দ্বিব-দ্বন্দ্ব ভুল ভ্রান্তি, বাস্তবেৰ  
ঘাত প্রতিঘাত, জয় পবাজয়, বাধা-বিরোধ ও চরম দুঃসমস্বেব মধ্য দিয়ে নিযতই  
গাঁথিয়া জুড়িয়া শেষ সাতাশেৰ ‘মহামানব, বিশ্বপ্ৰেমিক ও প্ৰেমক ববীন্দ্রনাথে’  
পৰিণত কৰে দিল ।

৭। অচেনা—কেউ যে কা’বে চিনি নাকে’/সেটা মন্ত বাচন—কণিকা, বিচিত্রিতা,  
ছিন্নপত্র ১৩০ নং ।

৮। জামলা—বিচিত্রিতা ।

৯। জামলী—জামলী ।

১০, ১৭। স্পৰ্শ—‘প্ৰিয়াৰ স্পৰ্শ থেকে’ (পত্রপুট ১৩ নং কবিতা) ।

ৱেখে গেলেম সকল প্ৰিয় াতে

এক নিমেষেৰ ছুঁয়া ।

নীহারিকা—বিচিত্রিতা ।

১১। বেহিসাবি—‘একেবারে অস্থিতে-মজ্জাতে বেহিসাবি ।’ পশ্চিম-যাত্ৰীৰ-  
ডায়াবি—৫৬১ পৃষ্ঠা) ।

১২। বিচ্ছেদ-মিলনে—সাথী পবিশেষ) ।

১৩। দুঃখ স্নেহে—বিচিত্রা (পৰিশেষ) ।

১৪। আনন্দ ও বিষাদে—নাট্যশেষ (বীথিকা)।

১৫। জীবনমৃত্যুর হরণেপুরণে—জীবনমৃত্তি ১১০ পৃষ্ঠা।

১৬। বিরহানন্দ—মানসী।

১৮। জীবন দেবতা—দেহস্থ আত্মা, স্থখ দুঃখ ভোক্তা। অন্তরস্থ পরম জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা আমরা স্থখ দুঃখ, বাধা বিপত্তি, ভুল ভ্রান্তি উত্থান পতনের মধ্যেও জীবনকে স্পষ্টভাবে পরিচালিত করিয়া জীবনের অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলি সেই পরম জ্ঞানই অন্তরস্থ জীবন দেবতা।

১৯। রাজা (১৯১০), অরূপ রতন (১৯২০)।

‘রাজা’ নাটকের পরিবর্তিত রূপ ‘অরূপ রতন’।

অরূপ—মূর্তিশূন্য, নিরাকার, রূপহীন।

রতন (রত্নমালা, রত্নহার)—প্রেম। শেষ সপ্তক এক, বোঁগশয্যায় ২৭ নং।

অরূপ রতন—কবি রূপহীনের মধ্যে রূপকে, অহন্দবের মধ্যে হন্দরকে, এবং কঠিনের মধ্যে প্রেমকে (রতন) খুঁজে পেলেন।

আঘাতে আঘাতে

বেদনায় বেদনায়

সত্য যে কঠিন, (সত্য-প্রেম-মংপুতে রবীন্দ্রনাথ)।

কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,

সে কখনো করে না বঞ্চনা।

রাজা—অরূপ প্রেম, মৃত্যু দেবতা (আত্মপরিচয় ১২৭, ১২৯ পৃষ্ঠা)। কবি মৃত্যুর (অন্ধকার, ভয়ঙ্কর) মধ্য দিয়ে অরূপ প্রেমকে উপলব্ধি করলেন। এই প্রেম বিশ্ব ও বিশ্বমানবের কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসীমে উপনীত হল। ‘রাজা’ নাটকটি কবির সংশয়িত প্রেমেরই দ্বিধা-হন্দের রূপক কাহিনী। যে নাটকগুলি কবির জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়েছে সেই নাটকগুলিই কবি বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন তাঁর আত্মপরিচয়ে ১২৯ পৃষ্ঠা (রাজা), ও পশ্চিম যাত্রীর ভাগ্যরিতে (রক্ত কবী—৪৭৬ পৃষ্ঠা) এবং বলাকা কাব্য-পরিক্রমায় ঋণ শোধ—১২৪ পৃষ্ঠা)।

কবি আত্মপরিচয়ে লিখেছেন—রাজা নাটকে হৃদর্শন। আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা, তারপরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে, পাপের মধ্য দিয়ে, যে অগ্নিগাহ ঘটালে যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে, তাতেই তো

তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। ভুল রাজা—ভুল প্রেম, ভালোলাগা, ভোগের তৃপ্তি বা রূপের মোহ। সত্য মিলন—অরূপ-প্রেম, তাগের সাধন।

প্রথম যৌবনে কবি প্রেমের স্বরূপকে উপলব্ধি করতে চাইলেন (শেষ কথা-কড়ি ও কোমল)। প্রেমকে তিনি বাইরে মিথ্যা; রূপের মধ্যেই খুঁজেছিলেন। তারপর কবির সংশ্লিষ্ট প্রেম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভুল ভ্রান্তি, ও সাংসারিক দুঃখোগের চরম দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে (আশুনলাগা-হঃসময়-চিত্রা, কল্পনা। ঋণগ্রস্ত কবি, অন্ধকারে অন্ধবের মধ্যে স্বন্দরকে, অরূপের মধ্যে রূপকে এবং কবির বহু আকাঙ্ক্ষিত ‘দুর্লভ ভালোবাসাকে’ এবং তাই সঙ্গে ‘একাগ্র গভীর ভালোবাসাপূর্ণ একটি হৃদয়’কে তিনি খুঁজে পেলেন (যুবোপ-যাত্রীর ডায়ারী ৪৫৬, ৪৫৭ পৃষ্ঠা, চিঠিপত্র ৮ম খণ্ড, ১০ আগষ্ট ১৮৯৯ কবিতা কাব্যগ্রন্থ)। প্রেমের এই সত্য রূপকে (কল্যাণ রূপ) কবি অন্তরের আনন্দরসে উপলব্ধি করলেন। এবং মৃত্যু (ভগ্নকর, কঠিন, অন্ধকার) মধ্য দিয়ে এই প্রেমকে মানব কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে (বলাকা কাব্যগ্রন্থ-১৯১৪-১৬) ‘অরূপ বতনের’ সন্ধান পেলেন।

২০। পাখি—হৃদয়, আত্মা, মন

লাজুক পাখি—লাজুক হৃদয় (চাবি-পূরবী)।

২১। দীপশিখা—প্রিয়া (চৈতালি)।

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,

তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তবে।

যিনি ‘ভীকুদীপশিখা’ নিয়ে কবির বসন্ত রাতে কবিতার জন্ম এনেছিলেন তিনিই কবি প্রিয়া।

ভীকু, কম্পিত—বৃত্তিতা নাবী।

গোধূলি-বেলাব পাছ জনশ্রুতি এ মোর প্রান্তরে

লয়ে তাব ভীকু দীপশিখা।

দিগন্তেব কোন পাবে চলে গেল আমার কবিতা।

আবার গীতালির ১০০ নং কবিতায় লিখেছেন—

কেহ বা কম্পিত দীপশিখা এনেছিলে মোর ঘরে।

২২। বসন্ত রাত—বসন্ত (কল্পনা)।

আমার বসন্তবাতে চারি চক্রে জেগে উঠেছিল

যে কয়টা কথা।

ছিন্নপত্র ৫৫ সংখ্যাকে লিখেছেন—‘তেতালার ছাতের গুটি কতক রাত্রি। আবার

গীতালির ১০৮ নং কবিতায় লিখেছেন ‘কেহ রাতে, বসন্তে’।

- ২৩। ‘তোমরা যাহার নাম জান না’—অথাতা (বলাকা ৫ নং) অগৌরবা নারী।  
অথবা ‘আমরা যাহার খোজ পাই নাই (রোগ শয্যায় ১০ নং কবিতা)।
- ২৪। অগৌরবা—গৌরবহীনা নারী (বলাকা ৫ নং)।
- ২৫। প্রচ্ছন্ন—যে নারী মলিন বেশে সবার পিছনে দাঁড়িয়ে ‘প্রচ্ছন্ন’ হয়ে  
রয়েছেন (খেয়া, বলাকা-কাণ্য-পরিক্রমা, ক্ষতিমোহন সেন ১০৪, ১০৫  
পৃষ্ঠা)। প্রচ্ছন্ন বোধিকা—দৃষ্টির অগোচরে যে নারী। অশরীরী নারী  
(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ৫৪ পৃষ্ঠা)।  
হে চির প্রচ্ছন্ন—যে নারী চিরদিন প্রচ্ছন্ন হয়ে কবির জীবনে ও কাব্যে রয়ে  
গেছেন (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৭৫ পৃষ্ঠা)।
- ২৬। ভালো—ঘরে কাজ করি শান্ত হয়ে ;/সবাই বলে ‘ভালো’ (বাঁশিওআলা-  
ভ্রামলী)। সবাই আমায় বলল লক্ষ্মী সত্য/ভালোমাহুৰ অতি! (মুক্তি-  
পলাতক)। আপনার ভাষাটি ‘ভালো’ (চিঠিপত্র প্রথম খণ্ড)। কবি  
‘বাংলা দেশের মেয়ের’ পরিচয় দিয়েছেন গৃহকর্মনিপুণা ও ‘ভালো’ (সবল)  
কথাটি উল্লেখ করে।
- ২৭। সত্য—  
রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যময় জীবন ও কানোর মধ্যে তাঁর যে আসল পরিচয়টুকু  
পাওয়া যায় তা হচ্ছে তিনি শ্রেষ্ঠ বোম্যান্টিক (নব জাতক) ও বিরহী কবি  
(উৎসর্গ) এবং শ্রেষ্ঠ প্রেমিক (আত্মপরিচয় ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২১৫ পৃষ্ঠা)। তাঁর  
কবি সত্য—

সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমৃতের কণা

ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে,

প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে,

আত্মনিবেদনের অঙ্গ গদ্য গদ্য থেকে,

মাধুর্যের কত স্মৃতিরূপ কত বিস্মৃত রূপ

দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ,

আমার নাড়ীতে নাড়ীতে। পত্রপুট তেরো।

আর কবির প্রেমিক সত্য—

আমার ভালোবাসার আর—একটা ধারা

মহাসমুদ্রের বিরাট ইন্ধিত-বাহিনী।



মহীয়সী নারী জ্ঞান করে উঠেছে

তারই অঙ্গ থেকে ।

সেএসেছে 'অপবিনয়ী ধ্যান রূপে (ধ্যানোদ্ভব) শ্রীষা—অধরা)

আমাব সর্ব দেহে মনে,

পূর্ণতর কবেছে আমাকে আমার বাণীকে ।

জেল রেখেছে আমার চেতনাব নিভৃত গভীরে

চিব বিরহের প্রদীপ লিখা (পত্রপুট পনেবো) ।

কবি সৈজুতির 'জন্মদিনে' তাঁর ভালোবাসাব কথা প্রকাশ করে লিখেছেন—

সেই ভালোবাসা মোবে তুলছে স্বর্গেব কাছাকাছি

ছাড়ায তোমাব অধিকাব । আমাব সে ভালোবাসা

সব ক্ষয়ক্ষতি শেষে অবশিষ্ট রবে, তার ভাষা

হযতো তাবাবে দীপ্তি অভ্যাসেব জ্ঞান স্পর্শ লেগে

তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গ রবে যদি উঠি জেগে

মৃত্যু পবপাবে ।

আর কবি পশ্চাতে রেখে যাবেন—

আব রবে পশ্চাতে আমাব নাগকেশরের চাবা

ফুল যার ধবে নাই, আব রবে খেযানবী হাবা

এ পারেব ভালোবাস ---বিবহ স্মৃতির অভিমানে

ক্লান্ত হয়ে বাত্রি শেষ ফিরবে সে পশ্চাতেব টানে

কবির এই দুই প্রধান সত্তার পারই বয়েছে অগাধ বিভিন্ন সত্তা—প্রকৃতি প্রেম (সোনার বদী, ছিন্নপত্র), বাৎসল্য প্রেম (প্রভাক সংগীত, শিশু কাব্যগ্রন্থ) শিল্পী সত্তা (স্বজন ধর্মী কবি-মন—মানসী, ক্ষণিকা, অধরা) ও বাংলা দেশের মেয়ে), প্রেমিক সত্তা (ক্ষণিকা, কডি ও কোমল) শিশু সত্তা (শিশু ভালোনাথ কাব্যগ্রন্থ), চিত্র শিল্পী (শেষ সপ্তক ষোলো, পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী), বিরহী মন (ইৎসর্গ) সংগীত সত্তা (বৈশ্য সংগীত, গীতাঞ্জলি, গীতমালা, গীতালি), নারী সত্তা (অমৃত্তি প্রবণ মন), কর্মী ও আদর্শ সত্তা (বলাকা কাব্যগ্রন্থ—কল্যাণ ধর্মী কবি-মন), আধ্যাত্মিক সত্তা (প্রান্তিক, বাগশয্যা), দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রকৃতিব সমস্ত ঐক্য । তাই কবি পত্রপুট তেরো সংখ্যক কবিতায় তাঁর সমস্ত সত্তাকে প্রকাশ করে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

জীবনের অলক্ষ্য গভীরে

আমার এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনবাত্রির যে সঞ্চয়

অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়

বা অথ গু ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে,

যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,

তাকে বেথে দিয়ে যাব কোন গুণীর কোন বসজ্জের

দৃষ্টির সম্মুখে,

কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়

অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বাকার করে ।

আর এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে—

দুই প্রকৃতির নারী—একাকিনী (সনাতনী) ও বিচিত্র রূপিণী (আধুনিকা) ।

দুই প্রকারের প্রেম—ভালোলাগা ও ভালোবাসা (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি) ।

মৃত্যুর দুই রূপ—উদ্ভাস্ত রূপ (জীবনস্মৃতি ১১৮, ১১৯ পৃষ্ঠা) ও কল্যাণ রূপ (চিঠিপত্র দশম খণ্ড ১১ পরিচ্ছেদ, স্মরণ ১৩, আরোগ্যা ১২) ।

কবির দুই সাংসারিক সন্তা—গৃহী (সীমা) ও সন্ন্যাসী সন্তা (অসীম) । (ছিন্নপত্র ৭০, ১৫৪ সংখ্যক, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ) ও বিরহী মন (উৎসর্গ) কবির সমগ্র জীবন ও কাব্যকে প্রভাবান্বিত করেছে ।

## বসন্ত—

‘বসন্ত বারে বারেই তার ফুলের সমারোহ ভুলে গিয়ে শূন্য সাজি হাতে অগ্নমনস্ক হয়ে উত্তরের দিকে চলে যায়, সেই ভুলের ফাঁকা রাস্তা দিয়েই ফুলের দল তাদের নবজন্মের সিংহদ্বার খোলা পায়’ (পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৫৪৪ পৃষ্ঠা, আত্মপরিচয়—২০১ পৃষ্ঠা) । রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ বসন্তের সঙ্গে জড়িত রয়েছে । নবযৌবনের ‘বাতায়নবাসী কবি’ (ভূমিকা—ছবি ও গান, জীবনস্মৃতি) **বসন্তের সূচনা** করছেন ছবি ও গান কাব্যগ্রন্থের অনাগত ‘কে’ কবিতা দিয়ে, এবং **নব বসন্তের** ‘গীতাঙ্কুশ’ রয়েছে ‘নুশনে’র উদ্দেশ্যে কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে । তারপর **বসন্তের সমাপ্তি** সংগীত গাইলেন চিত্রায় ‘শ্রোতৃ’ কবিতায় ৭ ফাল্গুন ১৩০২ বঙ্গাব্দে । অকাল বসন্তের পূর্বাভাব রয়েছে চৈতালিতে (১৩০২ চৈত্র, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা ৮৮ পৃষ্ঠা) । কল্পনাতে অকাল বসন্তের আগমন ‘বসন্ত’ কবিতায় । ক্ষণিকাতে শেষ যৌবনের শেষ বসন্ত বা **অকাল বসন্ত** ! উৎসর্গ কাব্যগ্রন্থে অকাল বসন্তের অবসান ‘উৎসর্গ আট সংখ্যক’ (সংযোজন) কবিতায়,—বিরহী কবি । পূর্ববীতে শেষ সাতাশের

**শেষ বসন্ত** । এবং মহাঘাতে কবি 'ধ্যানের ধনধানি' বিশ্বের কাছে সঁপে 'প্রথম বসন্তক' বোধন করে নব পরিচয়ে নব রূপে 'উজ্জীবন' করে নূতন ভাবে যাত্রা শুরু করলেন (২২ ফাল্গুন ১৩৩৫ দোল পূর্ণিমা) ।

**প্রথম বসন্ত**—কাব্যগ্রন্থের প্রথম ভাগ অথবা 'শূণ্য ঘোষের সৈকত তীব'—

'কবিতা যে লেখে কবিতাগুলি অস্তরের ইতিহাস তাব কাছে স্পষ্ট । বাইরে প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জল হয়েছে কি না হয়তো সেটা তাব পক্ষে নিশ্চিত বোঝা কোনো কোনো স্থলে সহজ হয় না । কিন্তু, এই সংকলন উপলক্ষে একটি কথা বলবার সুযোগ পাব প্রত্যাশা কবে এ কাজে হাত দিয়েছি । যারা আমার কবিতা প্রকাশ কবেন অনেক দিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অল্পভব কবছি যে, আমার অল্প বয়সেব যে সকল রচনা স্থলিত পদে চলতে আবদ্ধ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমাব মধ্যে এসে পৌঁছয় নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার । সঙ্কাসংগীত, প্রভাত সংগীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই আকাবে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ-দোষ । এই তিনটি কবিতাগ্রন্থে আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপবাধ লেখাগুলি কবিতাব রূপ পায় নি । ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখি হয়ে ওঠে নি—এটাতে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু তাকে পাখি বললে দোষ দিতেই হবে । এই তিনটি বইয়ের যে-কয়টা লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর-কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না । ভাঙ্গুসিংহের পলাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা । কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিষ আছে, কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে' (সঞ্চয়িতাব ভূমিকা-পৌষ ১৩৩৮) ।

'এই আমার প্রথম কবিতাব বই যাব মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং বহির্দৃষ্টি-প্রবণতা দেখা দিয়েছে । যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেবণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে । কড়ি ও কোমল আমার সেই নব যৌবনের বচনা । আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন বেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম । আপনাদের মধ্য থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও নূতন এবং আন্তরিক' (কড়ি ও কোমলের ভূমিকা) ।

কবি জীবনশ্রুতিতে লিখেছেন, 'মানব জীবনের বিচিত্র রঙ্গলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই কড়ি ও কোমলের কবিতার

ভিত্তর দিয়া নানা প্রকায়ে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য এটি অপরিহার্য আকাঙ্ক্ষা, এই কবিতাগুলির মূল কথা।' তাই কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থটি কবির জীবনের নূতন পর্ব—নব যৌবনের নব বসন্ত এবং 'শূন্য স্বপ্নের (বিশ্বরণধরী জীবন) সৈকত তীর' ও কাব্যগ্রন্থের 'প্রথম ডাঙা'।

এই বসন্ত কবিতাগুলির মধ্যে কবি-মনের গতি প্রকৃতি অনায়াসে নির্ণয় করা যায় এবং কবির যৌবনের আনন্দ বেধনার ও সংশ্লিষ্ট প্রেমের ছবি এই কবিতাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে।

আবার কবির বিভিন্ন বয়সের আলোকচিত্র ও পোষাকের পরিবর্তনও কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে সমভাবে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে বিশেষভাবে কনিকার পরবর্তীকালের আলোক চিত্রগুলিতে। 'কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু থাকে চাই, যার ইঙ্গিত প্রবেশ দিকে সেই বৈরাগ্যের দিকে বা অস্থিরাগকেই বোধবান ও বিমুগ্ধ করে।' 'আত্মপরিচয়ে' কবির এই বিখ্যাত উক্তিটি তাঁর জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য তেমনি তাঁর আলোকচিত্র ও পোষাক সম্বন্ধেও সমান ভাবে প্রযোজ্য, দুইই একই বিন্দুতে এসে মিলেছে।

### উৎসর্গ পত্র

স্বীকৃতিপ্রার্থে উৎসর্গপত্রগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অর্থপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। এই উৎসর্গপত্রগুলির মধ্যেই কবি-মনের গতি প্রকৃতি নিহিত রয়েছে এবং এর সঠিক অর্থের মধ্যেই রয়েছে কার উদ্দেশ্যে কাব্য গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত। কবির প্রথম যুগের কাব্যগ্রন্থে যে সকল উৎসর্গপত্র কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন তা হেয়ালিপূর্ণ হলেও অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং সংখ্যায়ও অধিক। কিন্তু স্বল্প কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রের ভাষা ও ভাব অত্যন্ত জটিল এবং সহজ বোধ্য নয় এবং উপহার দিয়েছেন প্রচ্ছন্নভাবে। মানসী এবং গীতালি কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্র এই শ্রেণী ভুক্ত। আবার কতকগুলি কাব্যগ্রন্থে শুধু কবিতার মনের ভাব প্রকাশ করেছেন (চৈতালি, মহয়া) দুয়োপ-দাজীর ডারারী এবং কনিকা কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রের মধ্যে রয়েছে একটি অদৃশ্য যোগাযোগ, যেখানে কবি কনিকা কাব্যগ্রন্থের সূচনা ও মূল অর্থের আভাস পরিহাসছলে কবিতার উৎসর্গপত্রের মাধ্যমে লোকেন পালিতকে দিয়ে গেছেন। থেরা কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে ক. কা. ১০

গয়েছে লজ্জাবতী লতায় পাতায় ভাঁজে লুকিয়ে থাকা কবির লাজুক হৃদয়ের সত্য, ক্ষুদ্র ও গোপন মৰ্মকথা বা' জীবনমৃত্যুর রৌদ্রছায়ায় মধ্যে দোহুলায়মান। কবির লুকিয়ে থাকা গোপন হৃদয়ের এই সত্য ক্ষুদ্র মৰ্মকথাটি খেয়া কাব্যগ্রন্থের কবিতায় মধ্যে 'প্রচ্ছন্ন' হয়ে রয়েছে বা' জীবনমৃত্যুর রৌদ্রছায়ায় মধ্যে লিখিত। আর সেই লাজুক হৃদয়ের গোপন কথাটি, কবি, খেয়া কাব্যগ্রন্থের কবিতায় মধ্যে বহু অগদীশ চন্দ্র বহুকে যত্ন ভাৱ খুঁজে নিতে বলেছেন।

### উৎসৰ্গপত্ৰ বিহীন ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ 'স্মরণ' কবিতায় পরে লিখেছেন উৎসৰ্গ ও খেয়া কাব্যগ্রন্থ। তারপরেই আছে উৎসৰ্গপত্ৰ বিহীন ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি ও গীতিমালা। কিন্তু গীতাঞ্জলি উৎসৰ্গপত্ৰে প্রচ্ছন্নভাবে উপহার দিয়ে কবি হৃদয়ের মৰ্মকথাটি বিশ্লেষণ করেছেন—আমাব বলে যাদের উদ্দেশ্যে কবি অতীতে যে প্রদীপ খানি জালিয়ে ছিলেন সেই প্রদীপ খানি এবার ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভেঙে দিলেন। এবং পরবর্তী অধ্যায়ে এই আলো বিশ্বের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের হউক বলে কবি নূতনভাবে যাত্রা শুরু করলেন।

যে প্রদীপ জ্বলছিল মিলন—শয্যার পাশে

সেই প্রদীপ এনেছিলেন হাতে করে।

তার লিখা নিবল আজ,

নেটা ভাসিয়ে দিবে হবে স্রোতে।

## পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে কয়েকটি কবিতা এবং শব্দ বিচ্ছিন্নভাবে লিখিত হলেও তাদের মধ্যে একটা সুসমন্বিতভাবে একই অর্থ দেখা যায়। যেমন দৈবক্রমে, বিদেশিনী, তিকা, অতিমান, আত্মর কল ইত্যাদি শব্দ।

দৈবক্রমে অথবা দৈবে—দৈবক্রমে তুমি আমার কাছে এসে পড়েছ এমো (ইরোপ-রাজীর ডায়ারী ৪৫৬ পৃষ্ঠা, আমার সুখ-মানসী)।

সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল—শেষ সপ্তক ছয় সংখ্যক।

এ একটা আকস্মিক সংযোগ (ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক)।

সে কি অকস্মাৎ? (শ্রবণ ১৫ সংখ্যক)।

যিনি দৈবক্রমে কবির জীবনে এসেছিলেন, বার প্রথম উল্লেখ ইরোপ-রাজীর-ডায়ারীতে ও মানসীতে)।

বিদেশিনী—ভিন্নদেশীয় নারী।

বিদেশিনী—‘আমার কাছে রহিলে বিদেশিনী/লইলে শুধু নয়ন মম জিনি’ (অচেনা-বিচিজিতা)। বিদেশিনীর মতোই অচেনা।

‘তুনে বাও বিদেশিনী’ (অধরা-সানাই)। অপরী নারী অথবা বিদেশিনী।

‘হে বধুবেনিনী, ওগো বিদেশিনী’ (নব-বধু) অচেনা-নারী নববধুও বিদেশিনী।

‘বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।/যখন শুধাই ওগো বিদেশিনী’ (নিকূটেশ যাত্রা—সোনার তরী, ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০)। অল্পবয়সী কবিতার কবিতার সুন্দরী প্রেরণী কবিতাও বিদেশিনী রূপে সঞ্চারিত। রবীন্দ্রনাথ অচেনা নারী, প্রেরণী কবিতা, অধরা, নববধুবেনিনী কিংবা প্রেরণী নারীকেও বিদেশিনীরূপে উল্লেখ করেছেন।

মুঠনা :—

তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিল (জীবনস্মৃতি—২৫ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ চেনা মানুষের মধ্যেই রয়েছে অচিন মানুষ, বার বিশ্লেষণ রয়েছে জীবনস্মৃতিতে, ছেলেবেলা—১৬১ পৃষ্ঠায়, ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যকের প্রথম, কয়েকটি লাইনে, লিপিকায়, বাউলের গানে এবং কবিতায় রূপ দিয়েছেন ‘শেষ সপ্তক তেরো’

সংখ্যাকে' কণিকা ও বিচিজ্জিতার 'অচেনা' কবিতাগুলিতে ।

আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী ।

কবির চেনা প্রায়শীকে সিদ্ধপারের 'অচেনা' বিদেশিনী রূপে সাজানেন । এই কবিতাটি লিখেছেন ১১ অক্টোবর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লিলাইদহে । সেই সময়কার মনের ভাব ৬ অক্টোবর ছিন্নপত্র ২৩৭ নং থেকে ১৬ অক্টোবর ছিন্নপত্র ২৪০ নং এর মধ্যে প্রকাশিত । অর্থাৎ কবির চেনা মাহুসই বিদেশিনীর সাজে অচেনা মাহুসের রূপ নিয়ে অপরূপ স্মৃতিতে কবির মনের মধ্যে আনাগোনা করে — বিদেশিনীর এই একটি অর্থ ই রবীন্দ্রনাথ করেছেন । কণিকার পরবর্তীকালে এই বিদেশিনীকে কখনো 'অচেনা' (কণিকা, বিচিজ্জিতা) কখনো 'অপরিত্তা' (ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক, পূর্ববর্তী) কখনো নববধুবেশিনী (নববধু—মহা) রূপে সাজিয়ে বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনী 'অধরা মাদুরাতে' (সানাই) পরিবর্তিত করে ছন্দের বন্ধনে 'শেষ সপ্তক তেরো সংখ্যাকে বেঁধে দিলেন—

অচিন পাখি তুমি,

মিলনের খাঁচায় থাক,

নানা সাজের খাঁচা ।

সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,

হৃকিত ওড়ার মধ্যে ।

যা'শা'স্তিনিকেতনে বাউলের গানে শুনেছিলেন—

খাঁচার মাঝে অচিন পাখি কেমনে

আসে যায়,

ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম'

পাখির পায় ।

শেষ সপ্তক তেরো সংখ্যক কবিতাটি এই বাউলের গানকে অবলম্বন করে 'ধ্যানোদ্ভাব প্রসার' (শেষ সপ্তক আটত্রিশ সংখ্যক) পরিচয় দিয়ে বিশ্ববিমোহিনী বিদেশিনী নারী 'অধরা'র (সানাই) উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের

পল্লবে,

অধরা ছিল তোমার কান-পর্য্য নিটোল ছাত্তের

হৃদয়মাঝ ।

ওকে ভিলে দিলে পাঠিয়ে,

ও গেল চলে ;

আনলে না এইগানে তোমারই কথা ।

‘বাকে মাকে বড় খাঁচাৰ মধ্য আসিয়া অচিন পাখি বন্ধনহীন অচেনাৰ কথা  
বলিয়া বায়, মন তাহাকে চিরন্তন করিয়া ধৰিয়া রাখিতে চায়, কিন্তু পাবে না, এই  
অচিন পাখিব নিঃশব্দ বাওয়া-আসাৰ খবৰ গানের স্বৰ ছাড়া কে দিতে পারে।’

‘জীবন স্মৃতি—২৫, ২৬ পৃষ্ঠা, ডেলেবেলা—১৬১ পৃষ্ঠা) ।

সত্য—অমিত্যা, বখাৰ্খ, প্রতিজ্ঞা, শপথ ।

সত্য—প্রেম—মংপুতে ববীজনাথ ।

ভিক্ষা—ভিক্ষা ভিক্ষা সব ঠাই/তবে আর কোথা বাই ভিখারিনী হল যদি  
কহল আসনা (পুকুৰেৰ উক্তি-মানসী) ।

সেখানে গিয়ে কবেছ চুপ /ভিক্ষা গেল থামি (অন্তহিতা-পরিণেব) ।

অতিথ হয়ে দিই নি ঘাৰে সাড়া, ভিক্ষাপাত্র নিই নি কাতর করে  
(জগন্না—কণিকা) ।

প্রেম ভিক্ষা করা ।

অভিমান—কপ কেন বাহুগন্ত মানে অভিমানে (পুকুৰেৰ উক্তি—মানসী) ।

তোমার অভিমান/আধাৰ করে আছে আমার সমস্ত জগৎ (অদেয়-মানসী) ।  
প্রেমের জন্ত অভিমান ।

সজ্জননীল-জগদ-বরণ বসন ধানি গান্ধে—নীল বসন পরিহিতা নারী—  
জামলী নারী (বাঁজী-কণিকা) । কবির শেষ কাব্যলক্ষ্যী । কবির প্রিয় বঙ নীল  
কাৰণ তাঁর প্রেমের বঙও নীল । তাই বলাকা কাব্য-পৰিক্রমা ৩৮ সংখ্যকে  
কলেছেন—‘অসীম প্রেমের নীলধারা যেন সংগীত বসন হয়ে ছেয়ে ফেলেছে।’  
কবির প্রেমের সঙ্গে সংগীতও যুক্ত । ‘মোর প্রেম এল গান গেছে’—কবি থাকে  
একই যৌবনে গান দিয়ে বরণ করে নিয়েছিলেন ।

সঙ্গীত শতদল—‘কাঁড়ারেছ সংগীতের শতদলদলে’ (বরণ নয় সংখ্যক) ।  
‘মানস-তরল-তলে বাগীর সংগীত শতদল’ (আত্মান-পূর্ববী) ।

যিনি সংগীতের শতদলদলে কাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকেই কবি পূর্ববীতে  
‘আত্মান’ করলেন । কবির যৌবনের প্রেমের গান ‘এই জামলী বাংলা দেশের



র উদ্দেশ্যেই রচিত—‘সে নামবে ‘না গানের আসন থেকে/সে লিখেবে তোমাকে চিঠি/রাগিণীর আবছারায় বসে ।’

বাঁশিওআলা—রবীন্দ্রনাথ। ভ্রামলী কাব্যগ্রন্থের ‘বাঁশিওআলা’। স্বরকার ও গীতিকার রবীন্দ্রনাথ—প্রাণরক্তভূমিতে ছিলুম বাঁশি বাজিয়ে (শেষ সপ্তক ছয়)।

অচেনা—‘কেউ যে পারে চিনি নাকো/সেটা যন্ত বাঁচন’ (কণিকা)।

‘অনেকদিন দিয়েছ তুমি দেখা./বসেছ পাশে তবুও আমি একা’ (বিচিজ্জিতা)।

‘যতটুকু লেশমাত্র চিনি ছজনায়./তাহার অনন্তগুণ চিনি নাকো হয় (কণ-বিলন-চৈতালি)।

‘তুমি চেন না আমাকে./তোমাকে চিনি নে আমি/আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হল তাই আমি ভাবি’ (পত্রপুট ১৫ সংখ্যক)।

ছজনে কেহ করে বুঝিতে নাহি পারে./বুঝাতে নারে আপনার (নয় নারী—সোনার তরী)।

অচেনা চরিত্র, অমিল চরিত্র, কবির বিপর্যয় চরিত্রের নারী, তাই তিনি অচেনা ছিলেন—‘সেই কথা ভেবে দেখলে সবাইকে অপরিচিত বলে বোধহয়’ (ছিন্নপত্র ১৩০ সংখ্যক)।

‘খেয়া’ শব্দটি কবি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন কবিতায় লিখেছেন। খেয়া শব্দের ভিন্ন অর্থের প্রথম উৎপত্তি ও তার বিশ্লেষণ ‘গোড়ায় গলদ’ গল্প নাটকে (১৮২২)। পরবর্তীকালে বিচিজ্জিতার ‘বববধু’ কবিতায় ও তার বিশ্লেষণ করেছেন।

খেয়া—নৌকা। খেয়া পারাপার বন্ধ হবেছে আজিরে (আবাচ-কণিকা)।

খেয়া দেওয়া—যোগাযোগ স্থাপন করা। দুই জন্মের বাক্য সংযোগ স্থাপন কারি নৌকা—‘এই সংসার সমুদ্রে দ্বিবি একটি খেয়া জমিয়েছি—একে একে তোদের ডুকিকে আইবুড়ো—কুল থেকে বিবাহ কুলে পার করে দিয়েছি।’ গোড়ায় গলদ (১৮২২)।

বর বধু—‘বিরহ নদী জলে খেয়ার তরী চলে/যায় সে মিলনেরই ঘাটে’ (বিচিজ্জিতা)—বর এবং বধুর সংযোগ স্থাপন কারি নৌকা। দুই জন্মের মিলন।

নারী, বধু—‘আমি তোমার খেয়াল মোতে তরী/প্রথম দেওয়া খেয়া’—খেয়ালি পুরুষের প্রথম নারী (নীহারিকা...বিচিজ্জিতা)।

‘ভোর বেলাকার পাখির ডাকে প্রথম খেয়া এসে/ঐকল বধন দব প্রথমের চেনাশোনার দেশে’ (জন্মদিন—সৌভূতি)। প্রথম নারী অথবা বধু।

‘আৰু ববে খেয়াতৰী হাৱা—এ পাৱেৰ ভালোবাসা’ (জন্মদিন—সৈন্ধুতি)।

খেয়া কাব্যগ্ৰন্থ—এ যে আমাৰ লজ্জাবতী লতা। খেয়া কাব্যগ্ৰন্থেৰ উৎসৰ্গ পত্ৰ—কবির লাভুক হৃদয়ের গোপন কথা, বা ‘শেৰ খেয়া’ কবিতাৰ ‘প্ৰচ্ছন্ন’ (খেয়া)ভাবে উল্লেখিত। লজ্জাবতী লতা (ক্লপক)—কবির লাভুক হৃদয়ের গোপন কথা বা ‘প্ৰচ্ছন্ন’ চয়ে লজ্জাবতী লতাৰ পাতায় ভাঁজের মধ্যো নীৰবে লুকিয়ে রয়েছে। কবির এই জীবনমৃত্যুৰ বোদ্দ ছায়াৰ হোহুলায়মান হৃদয়ের নীৰব ক্ষুদ্ৰ, সত্য এবং গোপন কথাটি বন্ধু জগদীশচন্দ্ৰ বসু যেন খেয়া কাব্যগ্ৰন্থেৰ কবিতাৰ মধ্যো বস্তুভাৱ খুঁজে নেন।

দেহ—‘জন্ম মোৰ বহি বৰে/খেয়াৰ তৰী এল ভবে’ (নব পৰিচয়—বীথিকা)।  
‘খেয়া ছাডিবাৰ আগে তীৰেৰ বিদায় স্পৰ্শ দিতে’ (রোগশয্যা)।

‘ভাসিবে ববে খেয়াৰ তৰী কেহ কি উপকূলে/বচিবে তালি নাগকেশৱেৰ ফুলে’ (আবেদন—বীথিকা)।

কাব্য তৰী—‘যেদিন খেয়া ধৰেছিলাম ছায়া বটের ধাৱে/ভোৱেৰ স্তবে ভেকেছিলাম কে বাৰি আৰু পাৱে’ (মৌবন বিদায়—কণিকা)।

মৃত্যু তৰী—‘গিয়েছে তাৰ ছায়া মূৰ্তি কালেৰ খেয়া পাৱে (ছায়াছবি—বীথিকা)।

‘আমাৰ মেলা ভাঙবে যখন দেব খেয়াৰ পাড়ি’ (নূতন স্রোতা—পৰিশেষ)।  
খেয়া লব্ধি কবি নানা অৰ্থে প্ৰয়োগ কৰেছেন—

ওগো সন্ধ্যা শেৰ প্ৰহৰেৰ নেয়ে,/ভাসাও খেয়া ভাটাৰ গঙ্গা বেয়ে।

খেয়া—অন্তৰ খেয়া (নামকৰণ—আকাশ প্ৰদীপ), উজানেৰ খেয়া (বিমূৰ্খতা নানাই), পানেৰ খেয়া (রোগশয্যাৰ তিন সংখ্যক)। পাৱেৰ খেয়া (শেৰ লেখা ১০ সংখ্যক) প্ৰদীপেৰ খেয়া (আকাশ প্ৰদীপ—ছড়াৰ ছবি)। ঘৰেৰ খেয়া (ছড়াৰ ছবি)।

তৰী—নৌকা। গান গেয়ে তৰী বেয়ে কে আসে পাৱে (সোনাৰ তৰী)।

সোনাৰ তৰী—স্বপ্নময় কাব্যতৰণী—‘ঠাই নাঈ, ঠাই নাঈ—ছোট সে তৰী/আমাৰি সোনাৰ ধানে গিয়েছে ভৱি’ (সোনাৰ ধান—কাব্যেৰ ফসল)।

এই সময়কাৰ প্ৰথম কাব্যেৰ ফসল ভৱা হয়েছিল সোনাৰ তৰীতে’ অৰ্থাৎ স্বপ্নময় কাব্য তৰণীতে। ৰাজাৰ ছেলে, ৰাজাৰ মেয়ে, বিশ্ববতী, মানসসুন্দৰী, ‘নৱকেশ

বাক্স প্রভৃতি কবিতায় স্বপ্নময় মনের আভাস পাওয়া যায়, যা' ছিন্নপত্রের মধ্যে ধরে রেখেছেন ১১, ২২ সংখ্যকে। রূপকথার জগৎ।

গানের তরী—‘বুল থেকে মোর গানের তরী দিলে খুলে।’

দেহ—‘আমি তোমার খেয়াল স্রোতে তরী’ (নৌহারিকা—বিচিজ্জিতা)। মনে পড়ে কবে ছিলেম একা বিজন চরে, তোমার নৌকা ভরা পালের ভরে/স্বপ্ন পারের হতে/কোন অবেলায় এল উজান স্রোতে’ (হঠাৎ মিলন—সানাই)।

কাব্য তরী—‘সে ছিল আরেকদিন এই তরী ‘পরে’ (স্মৃতি—চৈতালি)। “তুমি ওগো কণেক তরে এসবে আমার তরী ‘পরে’ (বাত্তী-কনিকা—১২০০)।

বিরহী কাব্যতরী—বিরহী নেয়ে। অগৌরবাব বাড়িয়ে গরব/করবে আপন সাথী/বিরহী মোর নেয়ে’ (বলাকা পাঁচ সংখ্যক, ১২১৪)।

সীমা—অন্ত, শেষ, কাষা, নারী, বালিকা রূপিণী সীমা। বলাকা—কাব্য—পরিক্রমা ২২-২৬ পৃষ্ঠা। (স্নেহ, প্রেম প্রভৃতির প্রতিশোধ)। সীমা এবং কনিকা একটি কবি ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করেছেন। বিবাহ পূর্ব কতি কল্পনার বালিকা রূপিণী সীমা (স্নেহ, প্রেম, গৃহসন্তা) ও সন্ন্যাসী রূপী অসীমের (শূন্যতা, সন্ন্যাসী সন্তা) যে মিলন সাধনের ভাব রূপ কবির মনে প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাট্য কাব্যে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল সেই ভাবরূপই পরবর্তীকালে কবির জীবনে ও কাব্যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই নাট্য কাব্যে সীমা অসীমের বিলম্বণ রয়েছে—

‘প্রেমের সেতুতে যখন এই দুই পক্ষের ভেদ ঘুচিল, গৃহীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর যখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমার অসীমে মিলিত হইয়া সীমার মিথ্যা তুচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল।’ ‘আত্মপরিত্যগ’ লিখেছেন,—

‘পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সফল উপলব্ধিই ধর্মবোধ যে প্রেমের একদিকে ঈশ্বর আর একদিকে অঈশ্বর, একদিকে বিচ্ছেদ আর—একদিকে মিলন, একদিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি।’

পশ্চিম বাতীর ভাষারিতেও সীমা অসীমের বিলম্বণ পাওয়া যায়—  
জী পুরুষের মাঝে বিধাতা একটি দূরত্ব রেখে দিবেছেন। এই দূরত্বের ঠিকটাই কবলই সেবার ক্ষমায় বীধে সৌন্দর্যে কল্যাণে ভরে ওঠে, এইখানেই সীমার অসীমে চতুর্দৃষ্টি।’

কবি ভগ্নদিন ১১ সংখ্যক কবিতায় নিজেই বিশ্বরণধরী জীবন কাহিনী

প্রকাশ করে সীমাকে নিয়ে অসীমের বিচিত্র লীলার কথা বিশ্লেষণ করেছেন।  
যার কিছু কিছু ভাবার্থ নব জীবনরস্তের সূচনায় লিখিত ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’  
নাট্যকাব্যে পাওয়া যায়। ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাট্যকাব্যটি কবির জীবন  
নাট্যের সূচনা এবং ‘স্ববণ’ কাব্যগ্রন্থটি ‘নাট্য-শেষের’ পালা। এই সীমা ও  
অসীমকে নিয়ে কবির জীবননাট্যের যে বিচিত্র লীলা (কডি ও কোমল থেকে  
স্ববণ) তারই প্রকাশ রয়েছে জন্মদিন ১১ সংখ্যক কবিতা, কাব্যে, সাহিত্যে  
গানে ও উপজ্ঞাসে। যংপুতে কবি সীমা ও বিশ্বসত্তার অর্থ বলে গেছেন।  
‘বিরাট অসীম বিশ্বসত্তা একটুকু কেন্দ্রের মধ্যে (কাব্যের মধ্যে—জন্মদিন ১১ নং)  
কণ্ঠে কণ্ঠে নিজেকে বেঁধে সীমাতে (দেহ, নাবী, কবিক)’ প্রকাশ হল।’

দূতী, স্বর্গদূতী—লক্ষ্মীর প্রতিনিধি, গৃহলক্ষ্মী।

‘সেই শুনে কোনো কোনো দিন বা/বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,/তিনি  
পাঠিয়ে ছিলেন তাঁর কোনো কোনো দূতীকে’ (শেষ সপ্তক ৪০)।

‘তুমি সে আকাশ ভেঁই প্রবাসী খালোক হে কলাগী/সেবতার দূতী’  
(অ’স্বান পুরবী), কলাগী নাবী।

‘হে প্রেমসী স্বর্গদূতী,/আমার যত কাব্য পু’নি/তোমার পায়ে পড়ে স্তব্ধ,  
তোমারি নাম বেড়াব রটি’ (অতিবাদ কবিতা)। কবি প্রেমসী।

‘ইচ্ছিতে জানিয়েছিল “আমি নাবি দূত,”। সে বয়েছে সব প্রত্যক্ষের  
পিছে,/নিত্যকাল সে শুধু আসিছে’ বধু—আকাশ প্রদীপ)।

দূত—প্রতিনিধি, বধু। রূপকথার বধুর প্রতিনিধি।

আসন পাতি—‘ভোগে উঠে পাওনি তানি স্ব’জ্ঞে/দাঁওনি আসন পাতি’  
(নৌহারিকা—বিচিজ্জিতা)।

‘তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে, দ্বিইনি আসন বসিবার (আসা যাওয়া মানাই)।  
ভালোবাসার সমাধর করেননি।

বিদেশ—ভিন্ন দেশ।

বিদেশ— সাগর পারের লীলালোকের আকাশপথ।

বিদেশের ভালোবাসা (শেষ লেখা ৫ নং)—অন্ত দেশের ভালোবাসা।  
প্রথম বয়সের লীলালোকের লীলাক্ষেত্র—শিলাইদহ (১৩০৭)

শেষ বয়সের লীলালোক—‘শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোখুলিলাগের

রাজা আলোতে তোমার সেই দূরের ঝুর সন্ধানে চলে যাও। সেইদিকেই তান্না  
মলে দাঁও সাগর পাঁবের লীলালোকের আকাশপথে ।’

জীবনের প্রভাত বির পৈশব। সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে/এ  
বিধের বাণী স্মৃতিস্বতী—কান্দে দেবীর স্মৃতি ।

যৌবনের প্রভাত—নব জীবন ও নব কল্পন। ‘বে-তারা মহেন্দ্রকণ্ঠে  
প্রভাববেলায়/প্রথম স্তন্যাল যোরে নিশাস্তেব বাণী’—নব যৌবনের পঞ্চদশী নারী  
মিনি কবির স্তম্ভ যৌবনকে প্রথম জাগ্রত করেছিলেন। মুগালিনী দেবী ।

জীবন মধ্যাহ্ন—যৌবন। ‘প্রভাতের নবীন আলোর মধ্যাহ্নের বাণী নেই,  
কিন্তু সায়াহ্নের পূর্ণতা গুচভাবে মধ্যাহ্নকে নিয়ে ।’

যৌবন মধ্যাহ্ন—পূর্ণ যৌবন অথবা বসন্ত। ‘সার্থকতা ছিল যেইখানে/কনিক  
পরশি তারে চলে গেছি জনতার টানে/সেই যৌবনমধ্যাহ্নের অজ্ঞানের পালা/সে  
হয়ে গেছে আজি, সন্ধ্যার প্রদীপ চল জালা’ (অবশেষে-মানাই) ।

জীবন সায়াহ্ন—শ্রোচ অথবা শেষ জীবন ।

যৌবন সায়াহ্ন—শেষ যৌবন অথবা শেষ বসন্ত। ‘সায়াহ্নে তুমি চলে  
গেলে অবারকের অনালোকে’ । মুগালিনী দেবী ।

### বচাকা ৪২ সংখ্যক

ভোর বেলা—তুমি আমার স্তম্ভ যৌবনকে জাগ্রত করেছিলে বলে চেলা  
মেরেছিলাম। অর্থাৎ প্রথম যৌবনে মানসীতে অন্তর্দ্বন্দ্বের অস্ত্র আঘাত  
করেছিলেন (১৮২০-আমার স্বপ্ন-মানসী, যুরোপ যাত্রীর ডায়ারী ২. অক্টোবর  
১৮২০) ।

মধ্যাহ্নে—মধ্য যৌবনে কাজের অস্ত্র বাস্তব ছিলেন ছিন্নপত্র ১৮২০-১১ ২৫) ।

সন্ধ্যা বেলা—শেষ যৌবনে ‘ভীকতার’ অস্ত্র উল্টো। কথা বলে  
ভালোবাসাকে কষ্ট করে মনের সব দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন, যেন কৃত্য হৃত  
হয়ে কবির জীবনে এসেছেন (ভীকতা-কনিকা) ।

দস্যু বলে শত্রু বলে—উল্টো কথা—পরম মিত্র। ভীকতা-কনিকা ।

যারে নাহি চিনি—অচেনা (কনিকা, বিচিজিতা, ছিন্নপত্র ১৩০নং, পত্রপুট  
১৫ নং, কপ মিলন—চৈতালি, কনিক মিলন—কড়ি ও কোমল) ।

কায় ভাষা বুদ্ধিত পারি নি—বল্লভাবী নারী (যৌন ভাষা-মানসী) ।

ভাবা বার জানা ছিল নাকো (শেষ লেখা ৫ সংখ্যক) ।

‘ভাবা বিহীন বধু’ (অন্তর্হিতা পরিণেব) ।

রবীন্দ্রনাথ ‘বধু’ কথাটি বিভিন্ন অর্থে, কাব্যে ও গানে প্রকাশ করেছেন ।

বধু—প্রেরণী কবিতা । কবিতা যে, বধুটি আমার, ছুটি শুধু পড়িবে নিখাস ।  
ছুটি শুধু বাতিরিবে বাঈ, বাহু ছুটি হৃদয়ে জড়ারে/ মরমে রাখিবি সুখখানি’  
(গান আরম্ভ—সন্ধ্যা সংগীত) ।

বধু—প্রিয়া । ‘এস এস বধু এস,/আখেক আচারে বসো,/অবাক অধরে  
হাসো/ভূলাও সকল তব’ (শ্রীতে ও বসন্তে-চিত্রা) ।

পরান-বধু—মৃত্যু । ‘আমার পরান—বধু ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া । বহু ভালাবেসে/  
ধরিবে তোমার বাহু’ (প্রতীক্ষা—সোনার তরী) ।

পরান বধু—পরান সখা, ঈশ্বর । ‘হে মোর পরান বধু হে,/কখন যে তুমি দ্বিগে  
চলে বাও পরানে পরশ বধু হে’ (মুক্তিপাশ-খেয়া) ।

বধু—জীবন দেবতা ।

‘কী দেখিছ, বধু, মরম মাঝারে/রাখিয়া নয়ন ছুটি’ (চিত্রা) ।

পাদপীঠ’ পরে চরণ প্রসারি শযনে বসিলা বধু—/আমি কহিলাম, ‘সব  
দেখিলাম, তোমারে দেখিনি শুধু’ (সিন্ধুপারে-চিত্রা) ।

অজানিত বধু—অচেনা বধু (জীবন দেবতা) ।

চির কিশোর বধু—রবীন্দ্রনাথ । সেই আমার চিরকিশোর বধু/তাকে তো  
আর পাইনে দেখতে এই ঘরে’ (শেষ সপ্তক ৩১ সংখ্যক) ।

বধু (শিরোনাম)—কবির শৈশবের মানসপটে যে বধুর ছবি আঁকা ছিল  
তারই বাস্তব প্রকাশ ‘বধু’ কবিতাগুলিতে—‘ঠাকুরমা জুততালে ছড়া যেত পড়ে/  
ভাবখানা মনে আছে—বউ আসে চতুর্দোলা চড়ে/আম-কাঁঠালের ছারে,/  
পলার মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পারে’ (আকাশ প্রদীপ) । জীবন-  
স্মৃতির ৭ পৃষ্ঠায় এই কবিতার প্রথম অংশের বিবরণ পাওয়া যায়, এবং শেষ  
অংশ এই নায়কেরই (কবির) নব বয়বনের রহস্তময় কাহিনী । বধু (মানসী)  
বালিকা বধু (খেয়া) এই কবিতা দুটি গ্রাম্য নব বধুর অন্তর কাহিনী (মানসী)  
বা ‘হুঃখ দিনের ঝড়ের’ মধ্যে প্রবাহিত (বালিকা বধু) ।

‘সুখ ঢাকা বধু—‘গোপনে কণিকা দেখা দিতে আসে/সুখ ঢাকা বধু সেজে’  
(অন্নদিন ১১ নং) । কণিকার বিনাশের পর (১৩০২), কণিকাই অপরীক্ষিত নারী  
রূপে দেখা দিলেন । অপরীক্ষিত নারী ‘অপরী’ ।

মাহেন্দ্র কণ—দুৰ্লভ মুহূৰ্ত (শেষ অৰ্ঘ্য-পূৰ্ববী)। ‘অনেক কালের একটি মাত্র দিন।’.....আমাব সেই আটকে-পড়া দিনটির গারে/কোনো স্বত্ব কোন কুলির/চিহ্ন লাগে নি। একদা ছিলাম ঐ দিনটির মাঝখানেই (শেষ সপ্তক উল্লিখিত)—কবির বিবাহের দিন।

রহস্য আভাসে, রহস্যের তীব্রতায়, অভাবিত রহস্যের ভাষা, গোপন রহস্যভরে—যৌবন রহস্য অথবা রহস্যময় যৌবন।

রহস্য আভাসে—চিস্তা ভরি দিলে সেই-রহস্য-আভাসে। (শব্দ ২২ সংখ্যক)। রহস্যময় যৌবন।

রহস্যের তীব্রতায়—অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ/রহস্যের তীব্রতায়—সেহেনে জাগাল হয়ব। (বধু—আকাশ প্রদীপ)। বধুর পরশে নূতন চেতনার স্বেপে উঠল কবির সপ্ত যৌবন। রহস্যের তীব্রতায়—রহস্যময় যৌবনের আনন্দ।

অভাবিত রহস্যের ভাষা—পরিচয় ধারা মাঝে তব ক্রিয়া অপরিচয়ের/অভাবিত রহস্যের ভাষা/চাৰিদ্ভিকে স্থির বাহা পরিমিত নিত্য প্রত্যাশিত/তারি মধ্যে মুক্ত কবি ধাবমান বিজ্ঞোহের ধারা (আবোধ্য ১৩ সংখ্যক)।

অভাবিত রহস্যের ভাষা—যৌবন রহস্যের ভাষা বা’ আদিরসাত্মক কবিতার পরিণত। ধাবমান বিজ্ঞোহের ধারা—এই আত্মবিস্মৃত বেআইনৌ প্রমত্ততা কড়ি ও কোমলের কবিতার অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল। ‘কবির নব যৌবনের প্রেমই হঠাৎ ‘ধাবমান বিজ্ঞোহের ধারার’ মতো কবির জীবনে ও কাব্যগ্রন্থে (কড়ি ও কোমল) প্রকাশ পেল।

গোপন রহস্যভরে—বিবাহের পঞ্চম বরষে/যৌবনের নিবিড় পরশে/গোপন রহস্যভরে/পরিণত রসপুঞ্জ অন্তরে অন্তরে (শেষ লেখা ৮ সংখ্যক)।

রহস্যময় যৌবনের স্পর্শে অন্তরে অন্তরে যে রসের সঞ্চার হল। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে বহু আদিরসাত্মক কবিতা পাওয়া যায়, যার উৎপত্তি কড়ি ও কোমল কাব্যগ্রন্থে। এই কাব্যগ্রন্থে কবি পুন্ডরীকপুন্ডরীকপে আদিরসের বর্ণনা দিয়েছেন যা’ পরবর্তীকালে বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে বিভিন্নরূপে ‘অভাবিত রহস্যের ভাষার’ প্রকাশ করেছেন। ‘শেষ লেখা ৮ সংখ্যক’ কবিতাই কবির শেষ আদিরসাত্মক কবিতা। আদিরসের কবিতাগুলির মধ্যে ‘ছায়াসন্ধিনী’ ও ‘শেষ লেখা ৮ সংখ্যক’ কবিতার তিনি ‘অভিষি’ কথাটি ব্যবহার করেছেন।

হে দেব, হে দেবীগণ—পূণ্যবল হল স্বৰ্গ, আজি মোৰ স্বৰ্গ হতে বিদায়ের দিন (স্বৰ্গ হইতে বিদায়-চিত্ৰ)। স্বৰ্গের দেব দেবী গণ। কবির বৈভব সস্তার স্বৰ্গের জগৎ স্বৰ্গ থেকে বিদায় নিলেন (ক্লপক কবিতা)।

তুমি দেবতা পাড়ায় বেদের মেয়ে—‘পথের ধারে গাছতলাতে তোমার বাসা। জামলী/তুমি দেবতা পাড়ায় বেদেব মেয়ে’—(জামলী)।

দেবশাস্ত্রের পাড়ায় মধ্যে তুমি বেদের মেয়ের মতো সংসার কর এবং মুহূর্তের মধ্যে তুমি গরীব হয়ে যাও। তুমি যাকে ভালোবেসেছ তার প্রতি কোন অধিকার (গাঁঠছড়ার বাঁধন) দাবি কর না। কবির নিজের সংসার।

মহেন্দ্র, ইন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রকাব্যের বহু কবিতায় রয়েছে কবির নিজেরই আত্মকথা। এই আত্মকথাও নিজেকে মহেন্দ্র অথবা ইন্দ্র সঙ্গ তুলনা করেছেন। স্বৰ্গ হইতে বিদায় (চিত্ৰ) ও পাঠিকা (বৌদ্ধিকা) কবিতায় কবির জমিকায় মহেন্দ্রের উল্লেখ রয়েছে। আবার ‘তপোভঙ্গ’ (পূর্ববী) কবিতায় লিখেছেন—‘তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের—অর্থাৎ কবির সন্ন্যাসী সস্তার (শিব, শূন্যতা, অনীম) সঙ্গ গৃহী সস্তার (উমা, নারী, সীমা) মিলন কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন ‘তপোভঙ্গ’ কবিতায় যার প্রথম আভাস পাই ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাট্য কাণ্ড ও ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যগ্রন্থে।

শচী—(পাঠিকা) কবি প্রেমসী।

শ্যামা (আকাশ প্রদীপ)—উজ্জল শ্যামল বর্ণ—কামধরী দেবী।

শ্যামা মেয়ে—(কৃষ্ণকলি—কণিকা) } কালো রং, কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী।

শ্যামা সুন্দরী—(বোধন—মহুগা) } কালী, অধিকা।

কবি ‘শ্যামা’ ও ‘শ্যামা মেয়ে’ কথাটির দুই বকম অর্থ করেছেন। একটির অর্থ উজ্জল শ্যামল বর্ণ (আকাশ প্রদীপ) অত্ৰটির অর্থ কালো অথবা কৃষ্ণবর্ণ (কৃষ্ণকলি—কণিকা)।

পঞ্চমী (আকাশ প্রদীপ)—অমাবস্তার পর পঞ্চম তিথি—‘শিকি চাঁদনীর আলো’ অর্থাৎ আলো আঁধারি। বর্ণ—শ্যাম বা কালো রং (শ্যামলা)—মৃণালিনী দেবী। দ্বৈপদী—বহন পটয়সী নারী।

শ্যামলা (বিচিত্রিতা, বৌদ্ধিকা)—‘প্রাণে অপবাজিতা চেয়ে দেখি তারে আঁধি ডুব যায় একেবারে’ নীল বা কালো রং।

শ্যামা (শ্যামলী, শেষ সপ্তক—মাটির শ্যামল অঙ্গন অথবা সজলনীল-জলদ-বরণ (যাত্ৰী-কণিকা) মেটে সবুজ, নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ (কালো, শ্যামা মেয়ে—



কক্কলি কণিকা)। যুগলিনী দেবী। কবি ভাস্করী নারীকে বিশ্বশ্রুতিৰ স্তম্ভ  
দ্বিধে বন্দনা করেছেন ‘শ্রবণ’ কাব্যগ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়ে (শ্রবণ ৩নং)।

চঞ্চলের লীলা সহচর—আত্মপরিচয় ২০৬ পৃষ্ঠা। হালুকা আবার স্বভাব  
(শেষ সপ্তক ৪১ সংখ্যক)।

কবি (কণিকা) অস্থির প্রকৃতির।

রবীন্দ্রনাথ নিজের চরিত্র নিজেই বিশ্লেষণ করেছেন।

রোম্যান্টিক (নব জাতক)—কাকশালা হতে তাঁর চুরি করে আনি রঙ-রস,  
আনি তাঁরি আত্মর পরশ।/জানি, তার অনেকটা মায়া,/অনেকটা ছায়া। আমায়ে  
ভাণ্ডাও হবে ‘এবে কভু বলে বাস্তবিক?’ আমি বলি ‘কখনো না, আমি  
রোম্যান্টিক।’

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রোম্যান্টিক কবি, তাই তিনি মানসী, কণিকা এবং  
অশ্রুসী নারী অথবা ও বাংলা দেশের মেয়েকে সৃষ্টি করেছেন।

বরের চাৰি—অন্তরের চাৰি (অন্তঃ-সানাই)।

চাৰি—তালা খুলিবার যন্ত্ৰ। পরিচয়। কণিক কাব্যগ্রন্থখানি কবির  
প্রিয় গ্রন্থ, তাই কণিকা কাব্যগ্রন্থের এবং অন্তরের চাৰি (পরিচয়) রেখে গেছেন  
পূর্ববর্তী ‘কণিকা’র। এবং বিশ্লেষণ করেছেন পশ্চিম-বাজার ডায়ারিতে ৫ অক্টোবর  
১৯২৪ খৃষ্টাব্দে।

চাৰি (পূর্ববর্তী)—

বিধাতা কবির হৃদয়কে বহু কক্ষে ভাগ করা প্রাসাদের মতো সৃষ্টি করে  
অন্তঃপুৱের গুপ্ত কক্ষে তালা দিয়ে চাৰিখানি দূৰে ফেলে দিলেন। তাই তাঁর  
অন্তঃপুৱের গুপ্ত কক্ষটি চিরকাল বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই কারণেই তাঁর গোপন  
হৃদয়ের ভালোবাসার কথা তিনি কখনো কোথাও বলেন নি, শুধু সংকোচে নীরব  
হয়ে গোপন করে গেছেন (শেষ সপ্তক ছাব্বিশ সংখ্যক)। এই গুপ্তকক্ষের ফুল  
ছড়ানো, গন্ধে বিভোর, অন্তরতম প্রেমের নির্জন প্রান্তরের ছায়াবন শাখায়  
বসে কবির লাজুক হৃদয় (লাজুক পাখি, লজ্জাবতী নতা) প্রেমসীর উদ্দেশে  
প্রেমের কবিতা রচনা করেন। যদি কোন পখিক এই হারিয়ে যাওয়া গুপ্তকক্ষের  
চাৰিখানি (কণিকার পরিচয়) খুঁজে পায় তবেই কবির অন্তরতম প্রেমের গুপ্ত  
ঘর খুলে অনাদি কালের স্বাধীন প্রেমের বাণী শুনতে পাবে—

অবশেষে

মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে

যাত্রা তার হবে অবসান ;

খুলিবে সে গুপ্ত দ্বার কেহ দ্বার পার্যনি সন্ধান ।

মানসী—

‘অধেক মানবী তুমি অধেক কল্পনা’ (চৈতালি) ।

ঈশ্বরের গড়া অধেক (অসম্পূর্ণ) মানবী (প্রতিমা), এবং Artist এর (শিল্পী কবির) হাতে রচিত অধেক কল্পনা । অর্থাৎ সৃষ্টি কর্তার (ঈশ্বরের) গড়া আধাআধি (অসম্পূর্ণ) মানবীকে (প্রতিমা) শিল্পী কবি রবীন্দ্রনাথ অধেক কল্পনা দিয়ে রচনা করেছেন মানসীকে ।

চিঠি পত্র পঞ্চম খণ্ডে রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছন্নভাবে মানসীর পরিচয় দিয়ে প্রথম চৌধুরীকে লিখেছেন—

‘সে Artist এর হাতে রচিত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা, ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কী ?’

নব যৌবনের নববসন্তে যিনি কবির মানসেই ছিলেন, সেই ঈশ্বরের গড়া বাস্তবের অসম্পূর্ণ প্রতিমাকেই শিল্পী কবি রবীন্দ্রনাথ অধেক কল্পনা দিয়ে রচনা করেছেন অর্ধ মানবী মানসীকে (গাজীপুর ১৮৮৮) । যা’ পরবর্তীকালে কবিকাব্যে (শিলাইদহ ১৩০৭-১৩০৯) ‘বাংলা দেশের মেয়ে’ রূপে কল্যাণকর্মে যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ হলেন (১৩০৯—শান্তিনিকেতন) ।

বাংলা দেশের মেয়ে—

কবি বাংলা দেশের মেয়ের পরিচয় দিয়েছেন শ্রামলী কাব্যগ্রন্থের ‘বাঁশিওয়ালা’তে-আমি তোমার বাংলা দেশের মেয়ে ।

সৃষ্টি কর্তা পুরো সময় দেননি

আমাকে মানুষ ক’রে গড়তে

রেখেছেন আধাআধি করে ।

‘বিধাতা অক্ষর মিলিয়ে তাকে ঊঁঠরি করেননি, কলমে বা এসেছে তাই বসিয়ে গেছেন’—(গোড়ায় গলদ) । সৃষ্টি কর্তার গড়ে তোলা এই অসম্পূর্ণ (আধাআধি) নারী, বার অন্তরে বাইরে এক হয়নি, বার ব্যথায় বুদ্ধিতে, ইচ্ছায় বা শক্তিতে মিল হয়নি, যিনি শান্ত হয়ে ঘরে কাজ করেন এবং সবাই থাকে ভালো বলেন, যিনি কঠিন করে ভালোবাসতে জানেন না শুধু কাঁদতে জানেন, সেই অসম্পূর্ণ নারীই

পৰবৰ্তীকালে 'ঘোমটা খসা নারী' ৰূপে অঙ্কনৰ ঘৰেৰে কোণ খেঁচ খেঁচৰে এসে  
১২১১ খৃষ্টাব্দে শাস্তিনিকেতনৰ কাছে বোগ দিবে সম্পূৰ্ণ হলেন।

প্ৰথম যৌবনৰ লেখা য়ুৰোপ ৰাজ্যীয় ডায়ারী, চিঠিপত্ৰ ৫ম খণ্ড ও মাননী  
কাব্যগ্ৰন্থে কবি-মনেৰ গতি প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা যায় (২৭, ৮, '৩০ আগষ্ট,  
২২ ও ২৩ অক্টোবৰ য়ুৰোপ ৰাজ্যীয় ডায়ারী)। আশাৰ শেষ যৌবনৰ লেখা  
চিঠিপত্ৰ ৮ম খণ্ড (১০ আগষ্ট ১২০০) ও কনিকা কাব্যগ্ৰন্থে কবিৰ পৰিবৰ্তিত  
মনোভাৱেৰ (উস্তান পতনেৰ) পৰিচয় পাওঁ যা যায়।

কনিকা (১৩০৭, শিলাইদহ) কল্যাণী নারী।

হে বয়সী কণকাল আসি মোৰ পাশে

চিন্ত ভৱি দিলে সেই বহন্ত আভাসে

(স্মৰণ ২২ সংখ্যক)

যে স্মৰণ বসেছিল মোৰ পাশে এসে

কণিকেৰ ক্ষীণ ছন্দ্যবশে

যে চিব মধুৰ

জ্ঞত পদে চলে গেল নিমেবেৰ বাজ্জায়ে নুপুৰ,

প্ৰলয়েৰ অন্তৰালে গাহ তাৰা অনন্তেৰ স্বৰ।

(বৈভৱণী—পূৰ্ববী)

কবে সে যে এসেছিল আমাৰ হৃদয়ে যুগান্তেৰে,

গোহূলি বেলার পাছ জলশূণ্য এ মোৰ প্ৰান্তবে,

লয়ে তাৰ ভৌক দীপশিখা।

দিগন্তেৰ কোন্ পাবে চলে গেল আমাৰ কনিকা ॥

(কনিকা—পূৰ্ববী)

যে স্মৰণী, যে কণিকা

নিঃশব্দ চৰণে আসি, কম্পিত পৰশে

চম্পক-অজুলি পাতে তন্ত্ৰা ৰবনিকা

সহাস্তে সৱায়ে দিল—

(শেষ অৰ্থা—পূৰ্ববী)

দীপ—প্রদীপ ।

দীপ—প্রিয়া—‘তুমি এবে আগে আগে দীপ লয়ে কবে/তব পাছে পাছে  
বিশ পশিল অন্তরে’ (টোতালি) । -

ভীক দীপ শিখা—প্রিয়া, কণিকা—‘লয়ে তার ভীক দীপ শিখা’ (পূর্ববী) ।

সন্ধ্যা দীপ শিখা—প্রিয়া, ‘এখন ঘরের দিকে মন টানিতেছে’...সেখানকার  
সন্ধ্যাদীপ শিখা কেবলই চোখে পড়িতেছে’ । (চিঠিপত্র চমৎকার, ১০ই আগষ্ট  
১৯০০) ।

কুটির তলে দিবস হলে গত/জলে প্রদীপ ধুবতারার মতো’ (ভৎসর্না,  
কণিকা) ।

‘কুশিয়া দিয়াছ তব বাতায়ন,/বিছানো রয়েছে শীতল শয়ন,/তোমার  
সন্ধ্যাপ্রদীপ—আলোকে তুমি আর আমি এত’ (সমাপ্তি—কণিকা)

রূপনারানের কূলে শেষ লেখা ১১ সংখ্যক—পদ্মার কূলে । পদ্মার কূলেই  
ঋণগ্রস্ত কবি স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে নেমে আসলেন (সোনার তরী—১৮২১,  
চিত্রা ১৮২৬) ।

‘রক্তের অক্ষরে দেখিলাম/আপনার রূপ’

কবি যত্নের ভিতর দিয়েই নিজেই চিনতে পারলেন, দেখলেন তাঁর  
ভালবাসাকে (সত্য-প্রেম) । এই ভালোবাসাই সব চেয়ে কঠিন, সেই কঠিনকেই  
তিনি ভালোবেসে আত্মীকরন দুঃখের তপস্বী হয়ে কবি প্রেমের ‘ঋণশোধ’  
করলেন অথবা প্রতিদান দিলেন ‘নিষ্ঠুরকে মেনে লহো হৃদুঃখের উৎসাহে,/প্রেমের গৌরব জেনো তাহে’ (ভীক—বিচিজিত) ।

ভাষা যার জানা ছিল নাকো,/আঁখি যার করেছিল কথা (শেষ লেখা  
৫ সংখ্যক) । স্বল্পভাবী নারী । যার প্রথম বিশ্লেষণ পাওয়া যায় মানসীর ‘মৌন  
ভাষা’ কবিতায়—আঁখি দিয়ে বাহ্য বল শাস্ত্র আদিয়া কাছে/সেই ভালো থাক  
তাই, তার বেশি কাজ নাই,/কথা দিয়ে কল যদি মোহ ভেঙে যায় পাছে ।/এত যত্ন,  
এত আশো, অশ্রুজলে বাধো-করকো/শব্দে সত্যের স্নান এমন কি ভাষা আছে ?  
কথায় বলো না তাহা আঁখি বাহ্য বলিয়াছে ।’

ভাবাবিহীন মুখ—‘স্বাগতবাণী ছিল সে মেলি ভাবাবিহীন মুখে,/বহুজনের  
বাণীয়ে ঠেলি/বাজে কি তব বৃকে’ (অন্তর্হিতা-পরিশেষ) । কুজিতা ও স্বল্পভাবী  
নারী ।

রূপকার—রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন দিয়েই কাব্য রচনা করেছেন—‘জীবন দিয়ে গড়িছে গুণী/স্বপন দিয়ে নয়’ (বীথিকা)।

অপ্রকাশের পর্দা (শেষ সপ্তক নয় সংখ্যক)—যে জীবন প্রকাশিত হয় নি। কবির বিস্মরণ্যময়ী জীবন অথবা অজানার ঘের সেখানে শিল্পকর্মের সৃষ্টি।

‘আর এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা/বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে/মবীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি’—কবি জীবন কাহিনী দিয়ে কাব্যে যে ছবি আঁকছেন তা অপরিষ্কৃটতাব (ভাষার অঞ্জলি) জন্ত বার্থ হয়ে গেল (শেষ সপ্তক নয় সংখ্যক)।

ভাষার অঞ্জলিতে/কে ধরিতে পারে তাকে ? (শেষ সপ্তক নয় সংখ্যক) অথবা ‘সংকীর্ণ জীবনে আমার স্বর তাই বিজড়িত,/সত্য পৌছয় না অনুজ্জল বাণীতে’ (শেষ সপ্তক ২৬ সংখ্যক)। অর্থাৎ অনুজ্জল বাণীতে যে কথা কবি বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাই তিনি জীবনের শেষ বাণীতে লিখে রেখে গেলেন ‘ভালোবাসি।’

আজ দিনান্তের অন্ধকারে  
এ জন্মের যত ভাবনা যত বেদনা  
নিবিড় চেতনায় সন্মিলিত হয়ে  
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো  
জীবনের শেষ বাণীতে হোক উদ্ভাবিত—  
‘ভালোবাসি’।



## শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হবে
নিবেদন ক	৫	বিশ্বরণ ধর্মী	বিশ্বরণধর্মী
গ	২৪.	গীতিকার	গীতিকার
ঙ	২৩	নিজের প্রতিবাদ	নিজের জীবনের প্রতিবাদ
ঝ	১০	নৈবেদ্য	নৈবেদ্য
১ পৃষ্ঠা	৯	নিয়ে, নিজেরাই	দিয়ে নিজেরই
২	১৭	অসামান্য	অসামান্য
২	১২	সে সময়ে	বে সময়ে
২	২৬	মধ্যে কাব্যলক্ষীর	মধ্যে যে চারজন কাব্যলক্ষীর
২	২২	বিত্তর করেছেন, কবি	বিত্তর করেছেন (কবি কাহিনী
		কাহিনী থেকে স্মরণ।	থেকে স্মরণ)।
৩	১	জীবন কাব্যকে	জীবন-কাব্যকে
৩	১৬	গঙ্গারতীর	গঙ্গার তীর
১০	৪	সন্ধি: কালে	সন্ধি: কাল
১০	২৮	তার	তোর
১৫	১০	জীবনস্মৃতি	জীবনস্মৃতি
১৬	২৫	তর্ক বলিয়া	বলিয়া তর্ক
১৭	২৮	।পলা	পালা
২০	১৮	সন্ন্যাসী	সন্ন্যাসীকে
২০	২৭	ভূমিকা, ইহাই	ইহাই ভূমিকা,
২১	৯	প্রেম, সত্তা	প্রেম-সত্তা,
২১	১৬	এই প্রত্যক্ষকে প্রজ্ঞা করিয়া	এই প্রত্যক্ষকে প্রজ্ঞা করিয়া
		এই প্রত্যক্ষকে প্রজ্ঞা করিয়া	
৪২	১৬	গেছে।	গেছে (ধ্বনি—আকাশ প্রদীপ)।
৪৩	২৯	প্রথম দুটো যৌবনের	প্রথম যৌবনের
৪৬	২২	৮৯০	১৮৯০
৫২	১০	তিনি	তিনি,

৫৬	৯	জন্মের তুফান	জন্মের তুফান (সংশয়িত প্রেমের দৃন্দ)
৫৬	২০	(ঋণগ্রস্ত কবি) কল্পনা	(ঋণগ্রস্ত কবি), কল্পনা]
৭১	১৭	সঙ্গিনী	সঙ্গিনী
৮০	১৭	পরিচিত্	পরিচিত
৯৫	১৭	'তোমরা যাহার নাম	'তোমরা যাহার নাম জান না' ২০
		জান না' ২১	
৯৫	১৮	অগৌরবার	অগৌরবার ২১
৯৫	২৭	প্রচ্ছন্ন ২০	প্রচ্ছন্ন ২৫
৯৭	২৫	ভালো ২১	ভালো ২৬
১০৩	৩	স	সে
১০৭	১৪	ধাবায় রয়েছে	ধাবায় রয়েছে
১১৮	৩০	অদূহের	আছে দূর
১২২	৮	দোপদী	দ্রোপদী
১২৫	২২	মাতীয়	আত্মীয়
১২৬	৩০	যবনিকা	কণিকা
১৩৩	২২	জীবনস্বতি	জীবনস্বতি

